শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি।

চিরকুমার পরিব্রাজক

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-

মহোদয় প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীসেবানন্দ স্বামী

কাশী-যোগাশ্রম।

(তৃতীয় সংস্করণ)

পুস্তক পাইবার ঠিকানা

ম্যানেজার—কাশী-যোগাশ্রম

বেনারস সিটি।

১৩২১ সন

[মূল্য—এক টাকা চারি আনা মাত্র

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা

শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি।

চিরকুমার পরিব্রাজক

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-

মহোদয় প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীসেবানন্দ স্বামী

কাশী-যোগাশ্রম।

(তৃতীয় সংস্করণ)

পুস্তক পাইবার ঠিকানা

ম্যানেজার—কাশী-যোগাশ্রম

বেনারস সিটি।

১৩২১ সাল

[মূল্য—এক টাকা চারি আনা মাত্র

কলিকাতা,

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারত মিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র

শ্রীকাশী-যোগেশ্বরী-যোগেশ্বর নাথৌ বিজয়েতে।



অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।

ত্বচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীন-দয়াময়ি॥

মা!

শ্রীকৃষ্ণ ঐ পদ বিনা কিছু নাহি চায়।
পুষ্পাঞ্জলি রাঙ্গা পায় বড় শোভা পায়॥

তাই মা! দীনাতিদীন সেবক তোমার।
"পুষ্পাঞ্জলি" দিয়া পূজা করিল এবার॥



শ্রীশ্রীহংসানন্দ

ওঁ

নমো নারায়ণায়।

অবতরণিকা।

মহারোষে উত্তাল তরঙ্গ রাশি চিরদিনই মহাসমুদ্রের মহিমা ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। তরঙ্গ তুফানে পোতারোহিবর্গ বিষম বিপত্তিতে পড়িলেও—দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর হইলেও উহা কিন্তু সাগরের স্বাভাবিক শোভা ও মহিমা। ধর্ম্মের আধার ভূমি—সদ্ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিকাশ ক্ষেত্র—জ্ঞানের আকর মহাসাগর সদৃশ সনাতন ধর্ম্মের লীলায়তন ভারতবর্ষে বিপ্লবের উপর বিপ্লব আসিয়া সদাচারী সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণকে অনেকবার বিত্রস্ত ও বিপদ্গ্রস্ত করিয়াছে। বৌদ্ধ বর্গের বিপুল বিতাড়নে, মুসলমানগণের নিতান্ত নির্য্যাতনে, খৃষ্টীয়গণের কুহকময় কৌশলজাল প্রসারণে, ব্রাহ্মমণ্ডলীর অদুরদর্শিতা দূষিত সমাজ সংস্কার কারণে ও নব্য উন্মার্গিবর্গের বিবিধ বিরুদ্ধাচরণে সনাতন ধর্ম্মাচার-চালিত সমাজ ক্রমান্বয়ে উপদ্রুত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ভগবদ্বচনামৃত পানে অমর ধর্ম্মসমাজ কখনও সমূলে নষ্ট হয় নাই, হইবেও না। ঘন ঘোর মেঘে আকাশ ঘেরিয়া লইলেও কাল সহকারে আবার নীলাকাশ নির্ম্মল দেখা যায়। বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিপ্লবকালে মাদৃশ দীনহীন অযোগ্য জনের ক্ষুদ্র সেবা ভারত গ্রহণ করিলেন, ভগবৎ কৃপায় এ ক্ষুদ্র জীবনও কৃতার্থ হইল। গত অষ্টাদশ বর্ষের সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিপুল আন্দোলনে চারিদিকেই একটু বাতাস ফিরিয়াছে। স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম গৌরব বুদ্ধি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেকের হৃদয়েই উদয় হইয়াছে। সভা সমিতিও প্রায় ৪০০ চারিশত প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের সকল প্রান্তে ধর্ম্মের বিজয় ডঙ্কা বাজাইতেছে। পণ্ডিতগণ—আচার্য্যগণ চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সর্ব্ব-

সাধারণকে অধিকার ভেদে ধর্ম্মতত্ত্বকথা বুঝাইতেছেন, শুশ্রূষুগণও আগ্রহ ও অনুরাগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছেন—বহুল সংবাদ পত্রে সনাতন ধর্ম্মের জয় জয় ধ্বনি বিঘোষিত হইতেছে। এমন কি নাট্যশালা সমূহেও ধর্ম্ম-ভাবের অভিনয় হইতেছে। এই সুসময়ে "ধর্ম্মপ্রচারক" আদিতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধরাশি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য বহুল ব্যক্তি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হওয়ায় এই "শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি" প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় কথার গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এইগুলি চিন্তাশীল সুজন মাত্রেরই সেবায় লাগিলে কৃতার্থ হইব।

কাশী—যোগাশ্রম।
২রা মাঘ, শঃ ১৮১৩।

দীনাতিদীন-
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পরিব্রাজক মহাশয়ের লেখনী-প্রসূত সুমধুর প্রবন্ধাবলীর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বহু দিন হইতে এগুলি ধর্ম্ম-পিপাসু জনগণের চিত্ত বিনোদন করিয়া আসিতেছে। সাহিত্যের হিসাবেও ইহাদের স্থান অতি উচ্চে। এবার ইহাতে পরিব্রাজক মহাশয়ের একাদশটী (৩৬—৪৬) নূতন প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং মুদ্রণের পরিপাট্যের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। আশা করি, এই অভিনব সংস্করণ পাঠক পাঠিকা-বর্গের অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইবে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইহার মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

এই গ্রন্থের উপস্বত্ব কাশী যোগাশ্রমে অধিষ্ঠিতা মা যোগেশ্বরীর সেবায় নিয়োজিত। ইতি

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

—o—



শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি।

বিধাতার শিল্পচাতুরী!

এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ক্ষণজন্ত প্রণিধান করিয়া দেখিলে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্যকৌশল-দর্শনে মন চমৎকৃত ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। তিনি অসীম ক্ষমতাশালী শিল্পচতুর পুরুষ। তাঁহার একটী সামান্য কার্য্যেও এত অপূর্ব্বতা এবং আশ্চর্য্য গুণের পরিচয় পাওয়া যায় যে বোধ করি আমরা চিরদিন চিন্তা করিলেও তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলের কিঞ্চিন্মাত্রও বিদিত হইতে পারি না। তিনি অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও অতি বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর সর্ব্বাবয়বেই সমান শিল্পচাতুরী ও মাধুরীর পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এক দিকে শত সহস্র যোজন পরিধি-বিশিষ্ট অঙ্গুরীয়ক নির্ম্মাণ করিয়া শনৈশ্চর-সদৃশ একটী মহাগ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করাইতেছেন, অকূল মহাসাগরপ্লাবনে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছেন, অনন্ত আকাশে অনন্ত সৃষ্টির সজ্জা করিতেছেন, অপরদিকে একটী মক্ষিকার পক্ষচিক্কণ ও একটী ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের অবয়ব গঠন করিতেছেন, একটী পিপীলিকার হস্ত পদাদির বল দিতেছেন, একটী অণুবীক্ষণদৃশ্য কীটাণুকীটের অঙ্গুলির নখ প্রস্তুতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। তিনি যাহা অতি সূক্ষ্ম কার্য্যও করেন, তাহাও অত্যন্ত

চাক্‌চিক্যশালী, মার্জ্জিত, ও সম্পূর্ণ ভাবে গঠিত হয়। কিন্তু মানবহস্ত-বিনির্ম্মিত একটী সূচীও যদি অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায় তবে তাহাতেও বন্ধুরতা, অপরিপাটীতাদি দোষ লক্ষিত হয়। যে দীপ্তিশালী গ্রহনক্ষত্রাদি আমাদের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণচ্ছলে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে হৃদয়ভেদী উপদেশ দ্বারা তাহারা আমাদিগকে তাহাদের নিত্য নিয়মিত গতি ব্যবস্থাপকের পরিচয় দিবে। ঐ যে পর্ব্বত সকল উচ্চশিরে অভ্রভেদ করিয়া তুষার মাখিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে। ঐ যে তরঙ্গ-রাশির আঘাত প্রতিঘাত জনিত কল্লোল ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া মহাসাগর বিশাল কলেবরে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, উহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার শিল্প কার্য্যের পরিচয় পাইবে। ঐ শৈলসুতা স্রোতস্বতীকে জিজ্ঞাসা কর, ও প্রবাহ বেগে প্রতি তরঙ্গে তাঁহারই শিল্প-চাতুরী ও আশ্চর্য্য নিয়ন্তৃত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে অনিবার্য্য বেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। বায়ুকে হউক, অগ্নিকে হউক অথবা যাহাকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না, সে নিজস্বরে সেই শিল্পীর মহিমা কীর্ত্তন করিবেই করিবে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানব, দানব, দেব যাহাকে হউক জিজ্ঞাসা কর, সে তাঁহারই আশ্চর্য্য শিল্প কার্য্যের প্রমাণ না দিয়া নিজ সত্তা মাত্রের পরিচয় দিতে পারিবে না। তাঁহার শিল্পযন্ত্রে কত কত জীব, কত কত বৃক্ষ, কত কত মনুষ্য ও কত কত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁহার কার্য্যে একটীর সহিত অপরটী ঠিক মিলিবে না, কোন না কোন অবয়বে তাহার বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা হইয়াছে। মনুষ্য-সমাজে কত কত মানব জন্মিয়াছিল ও জন্মিতেছে, কিন্তু কোনটির আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক অপর কোনটির সদৃশ নহে। ধন্য তাঁহার মহিমা! কি তাঁহার অপার ভাব ও আশ্চর্য্য তাঁহার শিল্প-চাতুরী! হে মনুষ্য! তুমি কি সামান্য দেহাভিমানে

উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছ! তুমি তো তাঁহার শিল্পশালার একটী অতি ক্ষুদ্র বস্তু মাত্র। অর্থকরী বিদ্যাদি শিক্ষা করিয়াই নিবৃত্ত হইও না, তাঁহার শিল্প-শাস্ত্র পাঠ কর। সে শিল্প-শাস্ত্রের ভাব, রস, লালিত্য, মাধুর্য্য অবগত হইলে বিমোহিত হইয়া যাইবে। তাঁহার অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড-শাস্ত্রের সর্ব্বত্র সুন্দর ছন্দোরাশি বিরচিত। একবার সেই শিল্পসুনিপুণ বিশ্বরচয়িতার শিল্পশাস্ত্র অধ্যয়ন কর এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় শিল্পচাতুরী দর্শন করিয়া তাঁহাকে বার বার নমস্কার কর!

---o---

মানব-গ্রন্থ।

তুমি বিদ্যাবান্ হইবার জন্য কত পুস্তক পাঠ করিলে, এবং তুমি বিদ্যাবান্, ইহা লোক সমাজে জানাইবার জন্য তুমি কত পুস্তক রচনা করিলে, কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করিলে তুমি প্রকৃত পণ্ডিত হইতে পারিতে, সে পুস্তক পড়িলে না, এবং যে পুস্তক রচনা করিলে প্রকৃত বিদ্যাবানের সদ্গতি লাভ করিতে পারিতে, সে পুস্তকের এক পংক্তিও লিখিলে না। তুমি লোকের ভাষা, লোকের প্রকৃতি, লোকের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে ও লিখিলে, কিন্তু নিজের এই সকল বিষয় দেখিলেও না, পড়িলেও না ও রচনাও করিলে না। মনুষ্যমাত্রেই নিজে নিজে এক এক খানি গ্রন্থ বিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করিলে জীবনের সকল বিষয় জানিবার সামর্থ্য জন্মে। আপনার শরীরের চর্ম্ম, অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, স্বেদ, ক্লেদ, স্নায়ু, শিরা, রস, রক্ত আদির গঠন পরিণাম, গতিবিধি যদি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পার, তবে দেখিতে পাইবে আদি কবি ব্রহ্মা তোমার শরীরকে কেমন ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াছেন, কেমন সুরে তালে সম্মিলিত হইয়া শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়াগুলি স্পন্দিত হইতেছে, কেমন পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চতন্মাত্রা গা ঢাকিয়া নৃত্য করিতেছে, কেমন ইন্দ্রিয়গুলি যথানিয়মে ক্রীড়া করিতেছে, কেমন একটী বৃত্তির স্পন্দনের একবার পদস্খলন হইয়া গেলে শরীরে কি প্রলয় ব্যাপারই হইয়া যায়। আজ একটী ক্ষুদ্র স্নায়ু কোথায় একটু বিকল হইল, অমনি তুমি নানা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলে। শরীরস্পন্দনের কেমন ঘাত প্রতিঘাতে কত সুখ স্বচ্ছন্দতা ও দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির তরঙ্গ-লীলা হইতেছে, এতাবৎ তুমি একবারও ভাল করিয়া পাঠ করিলে না। মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম জগতের মধ্যে তো তোমার প্রবেশ করিবার ইচ্ছাই দেখিতেছি না। যদি এই অলৌকিক ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় সন্ধান লইতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার

পলকে প্রলয় করিবার সামর্থ্য হইত, ও তুমি প্রকৃতির অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে। যদি মা অনাদ্যা শক্তি মহামায়ার সুস্মাঞ্চল ধারণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে তাঁহারই নিয়মে চলিতে শিখিতে, তাহা হইলে মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের অনন্ত শক্তি সামর্থ্য লাভ করিতে পারিতে। প্রথমে পুস্তক অধ্যয়ন করিলে না, তবে পুস্তক রচনা করিবে কিরূপে? তবে আচার্য্যের সাহায্যে যদি জীবন-গ্রন্থ ভাল করিয়া রচনা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ও লোকের পরম উপকার হইবে।

এক একটী মনুষ্য এক এক খানি পুস্তক বিশেষ। গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট, জন্ম জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ইহার সূচীপত্র, দীক্ষাগ্রহণ ইহার উৎসর্গ পত্র, শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি ইহার এক একটী পরিচ্ছেদ, জীবনের ভাল মন্দ কার্য্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহারা দরিদ্র, সামান্য বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে, তাহারা যেন সাদা মলাট মোড়া সামান্য পুস্তক; যাহারা ধনাঢ্য রাজা বা মহারাজা, তাহারা যেন ভাল বাঁধাই করা সোণার জলের কাজ করা মলাটে মোড়া এক এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ। যাহারা অল্প দিন জীবিত থাকিয়া বিশেষ কোন কার্য্য না করিয়াই তনুত্যাগ করে, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক। যাঁহারা অল্প দিন জীবিত থাকিয়াও লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াও সারগর্ভ ও মূল্যবান্। যাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া সুমহৎ কার্য্যরাশি অনুষ্ঠান করিয়া যান, তাঁহারাই সুবৃহৎ গ্রন্থ, এবং জগতের সকলেরই পাঠ্য। যাঁহারা অন্যের জীবন গঠন করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন অথচ নিজ জীবনে কোন বিশেষ কার্য্য করেন না, তাঁহারা "ব্যাকরণ"! যাঁহারা রাজা মহারাজা আদি বড় বড় লোকের গল্প করিয়া সভা ও সমাজ গরম করিয়া রাখেন, তাঁহারা "ইতিহাস"। যাঁহারা জগতের লৌকিক হানি লাভ বিচার করিতে করিতে দিন কাটাইয়া থাকেন, তাঁহারা "গণিত-গ্রন্থ"। যাঁহারা জড় জগতের চেষ্টা চরিত্র চিন্তা করাই

পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহারা "ভূগোল"। যাঁহারা কেবল রঙ্গ, রস, আমোদ, প্রমোদ বিলাসই জীবনের সার করিয়াছেন, তাঁহারা "নাটক"। যাঁহারা পরোপকার, সত্য, দয়া, নিষ্ঠা আদির দ্বারা অলঙ্কৃত, তাঁহারা "ধর্ম্মশাস্ত্র"। যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ভক্তি সহ ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা "যোগ-শাস্ত্র"। এইরূপ মনুষ্য মাত্রেই প্রত্যেকেই এক একখানি গ্রন্থ বিশেষ। যাহাতে আপনার জীবন-গ্রন্থ পরিপাটীরূপে লিখিত হয়, যাহাতে তুমি বিদ্যাবান্ গণের পাঠ্য হও, যাহাতে তোমার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে সারগর্ভ বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে, যাহাতে তোমার মূল্য অধিক হয়, তোমার মৃত্যু হইলেও তোমার জীবনচরিত অন্য জীবনে পুনর্মুদ্রিত হইতে পারে, যাহাতে তোমার মূল গ্রন্থের সহস্র সহস্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তুমি সেইরূপে আপনার জীবন গ্রন্থ রচনা কর। লিপি-দোষ বা ভাব-দোষ, সাধু সজ্জন বা শাস্ত্রীয় আজ্ঞার দ্বারা সংশোধন করিয়া লও। মনুষ্যজীবনে যে পাপাদি দেখিতে পাও তাহা মুদ্রাঙ্কনের দোষ জানিবে, উহা পশ্চাত্তাপ বা প্রায়শ্চিত্তরূপ সংস্কার পত্রে সংশোধিত করিয়া লইবে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেমন পুস্তকই রচিত হউক না কেন, সকল পুস্তকের শেষেই "সমাপ্তোঽয়ং" (মৃত্যু) লিখিত আছে, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া চলিও। যেন আলস্য, ঔদাস্য বা উপেক্ষা করিয়া পুস্তক অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া যাইও না। মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া যতটুকু পবিত্র শক্তি সামর্থ্য লাভ করিয়াছ, যত্ন সহকারে তাহার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া যাও। বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

—o—

ভারত ! তুমি স্বাধীনতা চাও ?

তুমি কি বিজাতীয় রাজ্য-শাসন-ভার সহ্য করিতে পারিতেছ না ? তুমি কি বিশাল সাম্রাজ্য দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে স্বয়ং শাসন করিতে পারিবে এরূপ বিশ্বাস কর ? তোমার বাহুবল, পরাক্রম, তেজ ও মনোবৃত্তি কি এত উত্তেজিত হইয়াছে যে তুমি অপরের করে নিজ রাজদণ্ড দর্শন ক্লেশকর ও নিতান্ত দৃষ্টিশূল মনে করিতেছ ? ধন্য তোমার দুঃসাহস ! তোমার শরীরের বল, মনের বল, স্বদেশীয় প্রকৃতির বল কি আর্য্য-রাজ্যশাসনকালের ন্যায় তেজস্বী ও বিদ্যমান আছে ? তোমার সে শুভ দিন প্রাকৃতিক নিয়মে তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আস্ফালন প্রেতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বলিতে হইবে। তুমি কি স্থির করিয়াছ, যে অনেক সৈন্য সামন্ত সমবেত হইয়া বিপ্লব করিলেই রাজ্য তোমার অধিকারায়ত্ত হইবে ? তুমি রাজ্যাধিকার কেবল বাহুবলের আয়ত্ত মনে কর, তাহা নহে। শরীরের বল অপেক্ষা উহাতে মনের অধিক বল আবশ্যক। তোমার যেরূপ দুর্ব্বল মন, তোমার মন যেরূপ কলুষরাশি পরিপুর্ণ, তোমার ধীরতা, ধারণা, প্রশস্ততা, উচ্চচিন্তাশীলতা, বিজ্ঞানবুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শিতা, মৈত্রী আদি এত অল্প, যে তুমি আপাততঃ যে মনুষ্য-শ্রেণীতে স্থান পাইতেছ, ইহাই আশ্চর্য্য ! বোধ করি তোমার কুল-মর্য্যাদা (আর্য্য কুলোদ্ভব) জন্য অন্য দেশীয় বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ তোমার সহিত সদালাপ করেন, নতুবা তুমি হয়ত এত দিন এ সুখেও বঞ্চিত হইতে।

ভারত ! তুমি স্বাধীনতা চাও বলিয়া কি আমি তোমাকে তিরস্কার করিলাম ? না, তজ্জন্য নহে। তুমি স্বাধীনতা চাও, কিন্তু স্বাধীনতা কি তাহা জান না, কি রূপে স্বাধীনতা লাভ করিতে হয় তাহা বুঝনা, এই

জন্য ভৎর্সনা করিলাম। তোমার কল্যাণের জন্য ভারত! আজ একটি কথা বলি, ধীর মস্তিষ্কে ধারণা কর।

বিজাতীয় জাতির হস্ত হইতে স্বদেশকে মুক্ত করাই যথার্থ স্বাধীনতা নহে; তাহাতে তোমার বীরত্ব কি? কেবল প্রচুর সৈন্য সামন্তের, ঐশ্বর্য্যের, বুদ্ধির ও একতার বল প্রকাশ পায় মাত্র। যদি যুদ্ধ করিয়া ও নরশোণিতে সমরাঙ্গন কর্দ্দমিত করিয়া স্বদেশ সমুদ্ধার ও বিদেশীয় রাজগণের অধিকারাপহরণ করিলেই বস্তুতঃ স্বাধীনতা হইত, তাহা হইলে আলেক্জাণ্ডার, নেপোলিয়ান বোনাপার্টি, সীজর, সিপিও এফ্রিকেনস্, হ্যানিবল আদি প্রধান প্রধান সামরিকগণকেও আমরা স্বাধীন বলিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা কদাচ পারি না ও পারিবও না, বরং তাঁহাদিগকে প্রধান শ্রেণীর দাস বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। যিনি পিতা মাতার ভক্তির অধীন, স্ত্রী পুত্রের প্রেমের অধীন, আত্মীয় কুটুম্বের অধীন, নিজ উত্তমর্ণের অধীন, বিষয়-বৃত্তির অধীন, এবং কোননা কোন প্রকারে সমাজের অধীন, তিনি স্বাধীন কিরূপে? যিনি জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির অবস্থা ও গতিবিধির অধীন থাকিয়া আপনার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তিনি স্বাধীন কিরূপে? যিনি বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি কালের অধীন, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অধীন, শুভাশুভ কর্ম্মের অধীন, তিনি আবার স্বাধীন কিরূপে? যিনি ভাবের অধীন, যিনি জাতি, কুল, অবস্থা, সংস্কার ও সম্প্রদায়ের অধীন, যিনি কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের অধীন, যিনি জন্ম জরা ও মৃত্যুর অধীন, তিনি আবার স্বাধীন কিরূপে? বাস্তবিক সেই ব্যক্তিই যথার্থ বলবান্, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, সেই ব্যক্তিই পুরুষ প্রধান, সেই মহাত্মাই প্রভু ও ধন্য, এবং তিনিই অবিসম্বাদিতরূপে স্বাধীন, যিনি তপস্তেজোবলে মহাবলশালী দুর্জ্জয় ষড়্ বৈরী পরাভব পূর্ব্বক পঞ্চ কোষ রূপ দুর্গভেদে সমর্থ ও যিনি অষ্ট পাশ পারিষদ পরিবেষ্টিত প্রবল বিক্রম মন মহারাজাকে নিজ শাসনা-

ধীন করিয়া তাঁহার উপর স্বয়ং আধিপত্য করিতে পারেন। আমরা সেই মহাত্মা বীরশ্রেষ্ঠকে স্বাধীন জানিয়া বার বার নমস্কার করি।

যিনি নিয়ত দাসের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাকে কোনমতেই স্বাধীন বলা যাইতে পারে না। যিনি এক কি ছয় প্রভুর সেবায় অনবরত নিরত থাকিয়া তাঁহাদের আদেশ অনুসারে কার্য্য করেন ও প্রভুবর্গের আনন্দ বর্দ্ধনে সর্ব্বদা আত্মদেহ ও মন অর্পণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মপরাঙ্‌মুখ হয়েন, তাঁহাকে পুরুষাধম ও দাসানুদাস ভিন্ন আর কি বলিব ? যিনি পরসেবাপরাঙ্‌মুখ, নির্ভীক এবং যিনি স্বেচ্ছানুসারে লোক-কল্যাণকর কার্য্য পারদর্শী, সেই মহাত্মাকেই আমরা স্বাধীন, বীর ও সাধু বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য। যদি পূর্ব্বোক্ত যোদ্ধৃবর্গ যথার্থই "স্বাধীন" পদবী পাইবার যোগ্য হইতেন, যদি উক্ত বীরবর্গ সত্য সত্যই "বীর" পদবাচ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই কালের করাল কবলে বিষম নিষ্পীড়ন সহ্য করিতেন না। তখন তাঁহারা বীর প্রতাপে কেন না অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শমনকে শাসন করিলেন ? রাবণ, দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ প্রভৃতি প্রাচীন বলবীর্য্যশালী রাজগণ এক্ষণে কোথায় ? রাবণ তো যমরাজকে সমরে পরাভব করিয়া তাঁহার অশ্বসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; তবে তিনি কালের কবলস্থ হইলেন কেন ? পরমেশ্বর তো তাঁহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রভূত বলবীর্য্য দান করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের হস্ত হইতে তৎসমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে কালের বিষম দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন কেন ? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল মহীপাল ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া স্বাধীন রাজবৎ ব্যবহার না করিয়া নিকৃষ্ট বিষয়ের দাস্যবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে মঙ্গলময় জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে রাজ্যশাসনের অযোগ্যপাত্র বিবেচনায় রাজ্য ও জীবন হইতে বঞ্চিত করিলেন।

ভারত ! যখন তুমি প্রকৃত স্বাধীনতা ও বীরত্ব লাভ করিবে, তখনই

তোমার সুচারু চরণ চুম্বন করিব। এইরূপ স্বাধীনতাই মনুষ্যকে ভাববন্ধন-জাল ছেদন করিতে সমর্থ করে। ইন্দ্রিয় দমনে পারগ হইলে বিশ্ববিজয়-পতাকা তাহার সম্মুখে স্বতঃই উড়িতে থাকে। ভগবান্ সহায় হইলে তিনি স্বহস্তে স্বাধীনতার মণিময় মুকুট ভক্তের মস্তকে দান করেন। ভারত! যদি স্বাধীন হইতে চাও, তবে অষ্ট পাশ বেষ্টিত জীবাত্মাকে যোগবলে ও জ্ঞানবলে স্বাধীন কর; ক্ষুধা পিপাসাদি হইতে প্রাণকে স্বাধীন কর; রোগ, জরা, জন্ম মরণাদি হইতে দেহকে স্বাধীন কর; অতঃপর প্রতিবাসী ও সমস্ত দেশকে স্বাধীন করিবার আশা করিও। নতুবা ভাগ্যবলে ও দৈবচক্রে যদিও অকস্মাৎ তোমার রাজকীয় স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহা কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না। এই জন্য বলি, ভারত! পরিণাম বিবেচনা করিয়া শান্ত ও সুধীর হও। উষ্ণমস্তিষ্কে কেবল "স্বাধীনতা!" "স্বাধীনতা!" করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক জগৎকে বিরক্ত করিও না। ভূতভাবন ভগবানের শরণাপন্ন হও। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বলবুদ্ধি আদি দান করিয়া তিনি তোমাকে প্রকৃত স্বাধীন করিয়া দিবেন। আলেক্‌জাণ্ডার প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীন হইয়া ফল কি? ভগবান্ শুকদেব, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীন হও।

ভারত! তুমি বিদেশাচার, কদাচার ও ধর্ম্মবিপ্লব রূপ ভয়ানক তরঙ্গে ভাসিয়া চলিলে, একটু সাবধান হও, নতুবা পরিত্রাণ নাই। শূন্যগর্ভ রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী কমলানুকম্পিত মহাশয়গণকে বিনয়-বিনম্র বচনে জিজ্ঞাসা করি, যে বৃথা উপাধি লাভার্থ বৃটিশ রাজকোষ পূর্ণ করিয়া কি হইবে? যাহাতে ভারতে পুনর্ব্বার স্বাধীনভাব উদ্দীপন দ্বারা অজ্ঞান-তিমির-জাল দূরীভূত হয়, ও সমস্ত ভারত সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-প্রচাররূপ রবিকিরণ-জালে তপস্তেজস্তপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা ও সহায়তা করুন। গ্রন্থকারগণ! ভারতের জাতীয় ও প্রাকৃতিক উন্নতিসাধক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়া দিন। সদ্বক্তাগণ

নিজ নিজ সাধু জীবন প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব-রাজ্য হইতে বাগ্বিস্তার করিয়া সমুৎসুক শ্রোতৃগণের হৃদয়ে ধর্ম্মোৎসাহ, ভাবোদ্দীপনা, সদ্বৃত্তের্জ্জনা ও সৎকার্য্যনিষ্ঠা বদ্ধমূল করিয়া দিন। ভারত-বন্ধুগণ! সকলে প্রশস্তহৃদয়ে ভারতের হিত কার্য্যে যত্ন করুন। শিশুগণ! তোমরা এই সময় হইতেই আর্য্যশাস্ত্রীয় সুনীতি শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সরলপথে অগ্রসর হও। অবলাবর্গ! তোমরা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদির পদানুসরণে বদ্ধপরিকর হও। ভারত! তোমাকে পুনর্ব্বার বলি, তুমি পদে পদে ভগবৎপদের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি ধর্ম্মাত্মা আর্য্যগণকে ক্রোড়ে লইয়াছিলে, আবার বর্ত্তমান সন্তানগণকে আর্য্য আচারে, আর্য্য ধর্ম্মে ও আর্য্যভাবে দীক্ষিত কর, স্বাধীন হইবে। আর্য্য-ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতিসাধন ও পুনরুদ্দীপনা করিতে কায়িক, মানসিক, বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা কর, নির্ম্মল আর্য্যধর্ম্ম-পালন-পরায়ণ হও, সদাচারে সর্ব্বদা দিনপাত কর, স্বাধীন ভাব লাভ করিবে। মুক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতা। ভারত! যদি তুমি স্বাধীনতা চাও তবে এই বেলা স্ব স্বরূপ ভগবানের অধীনতা (স্ব-অধীনতা) স্বীকার কর। আপনাকে (অহং ভাবকে) তাঁহার সেবায় নিযুক্ত কর। বল, বীর্য্য, তেজ, ঐশ্বর্য্য আদি তোমাকে আশ্রয় করিবে।

———o———

ভারতের ধর্ম্ম-বিপ্লব।

ধর্ম্মজীবনে—প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে—ভারতের সনাতন ধর্ম্ম-জীবনে অধুনা ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত, এ কথা হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখের সহিত স্বীকার করিবেন। বিপ্লব-ঝটিকা ভারতের রমণীয় ধর্ম্মকুসুম-কানন ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, সুগন্ধি প্রফুল্ল ফুল গুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া পথের ধূলিরাশিতে বিলুণ্ঠিত করিয়াছে, তরুগুলিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া দিগ্দিগন্তে ফেলিয়া দিয়াছে। সময় পাইয়া কণ্টকী বৃক্ষ ও আবর্জ্জনা মনোহর কাননকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। পবিত্র ও উজ্জ্বল ভারত এখন অতি জঘন্য ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

যখন বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, ও মহাভারতাদি পাঠ করি, তখন যেন বোধ হয়, আর এ জগতে থাকি না। তখন বোধ হয় যেন এমন এক প্রদেশে আসিয়াছি, যেখানকার সূর্য্য আরও উজ্জ্বল ও পূতকিরণবর্ষী, যেখানকার চন্দ্রমা আরও স্নিগ্ধ ও পবিত্র, যেখানকার আকাশ আরও গভীর ও সুনির্ম্মল, যেখানকার নদী আরও স্বচ্ছ ও মধুর নিনাদে নৃত্য করিতে করিতে প্রবাহিত, যেখানকার প্রকৃতি যেন স্বর্গীয় পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা মণ্ডিত। তখন যেন এক পবিত্র প্রশান্ত জ্যোতির্জ্জগতে বিচরণ করিতেছি। সেখানকার সকলই নবীন, নির্ম্মল, নিরুপদ্রব। কিন্তু যখনই পাঠ শেষ করি, অমনি বোধ হয়, যেন কে আমাকে সবলে ধাক্কা দিয়া আর এক জগতে ফেলিয়া দিল। পড়িতে পড়িতে দেখিতে লাগিলাম, যেন সে চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, নদী, আকাশ একে একে আমার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, আর আমি দূরে—বহুদূরে আর এক জগতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি—সেখানকার সকলই নিষ্প্রভ, সকলই শোভাহীন, সকলই যেন কি এক অব্যক্ত কালিমায় বিলেপিত। তখন আমার মন কাঁদিয়া উঠে। ভগবন্! কেন আমার এদশা ঘটিল। কেন

অন্তঃকরণের সজীবতা ও সুন্দরতা বিনষ্ট হইল! যাহা দেখিলাম, আর কি তাহা দেখিতে পাইব না!

কোন কাব্যের অভিনয় হইতে হইতে যদি সুনিপুণ গায়ক, বাদ্যকর ও অভিনেতৃগণ অকস্মাৎ রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করে ও তৎপরিবর্ত্তে কতক অশিক্ষিত ও হীনমতি বালক ও যুবক তাহা অধিকার করে, কেহ বীণার সুর চড়াইতে গিয়া তাহার তার ছিঁড়িয়া ফেলে, কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, সকলে মিলিয়া ঘোর রোল উপস্থিত করে, দর্শকগণ বিরক্ত ও ত্রস্ত হইয়া পলায়ন-পর হয়েন—তাহা হইলে রঙ্গশালার যেরূপ অবস্থা হয়, ভারত-ভূমিরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তেজঃ-পুঞ্জ ঋষি ও মহামান্য পিতামহগণ ভারত-রঙ্গশালা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের বেদ, পুরাণ, স্মৃতি আদি পড়িয়া আছে। সামান্য বিদ্যা ও ধনদুর্ম্মদান্ধ হইয়া, আমাদিগের ন্যায় কাপুরুষগণ তাঁহাদিগের পবিত্র ও উজ্জ্বল অভিনয়-ক্ষেত্রে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া, তাহার সদ্ব্যবহারে অসমর্থ হইয়া, তাহার নিগূঢ় লক্ষ্য সকল উপেক্ষা করিয়া দিন দিন অধঃপাতিত হইতেছি, আর্য্যদিগের পবিত্র কার্য্যভূমি নিতান্ত নিন্দিত করিয়া ফেলিতেছি, সুখ, স্বাধীনতা ধর্ম্ম আদি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতেছি। এতদ্দর্শনে সাধুগণ গম্ভীর বিজন বনে পলায়ন করিলেন, সূক্ষ্মদর্শিগণ নীরব হইলেন, প্রবীণগণ একে একে অবসর লইলেন। শাস্ত্র-মহিমা, মন্ত্র-মহিমা, তপো-মহিমা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অসদর্থে, অসদ্ব্যবহারে, কপটাচারে সমস্তই নিন্দিত হইয়া উঠিল। ভারতভূমি শূন্য ও মলিন হইতে লাগিল—রঙ্গশালার দীপমালা নির্ব্বাণ হইল—অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল—গীত, সুর, তান, লয় লোপ পাইল। সকলই অন্ধকার!! ঘোর অন্ধকারে ভারত আচ্ছন্ন হইল।

হা! দুঃখের উপর আবার দুঃখ আসিয়াই উপস্থিত হয়। এই সময়ে

কতকগুলি খদ্যোতের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, "আর্য্য আর্য্য করিয়া মর কেন! আর্য্যেরা-জানিত কি? তাহাদের ছিল কি? এখন রেলওয়ে হইয়াছে। টেলিগ্রাফ হইয়াছে। (সৌদামিনী স্বয়ং দূতী হইয়াছেন!) ভূরি ভূরি বিলাসদ্রব্য পাইতেছ। মোটা মাহিনার চাকুরী পাইতেছ। সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। (Civilization far improved.) ধর্ম্মও এক রকম চলিতেছে, আবার চাও কি?" আমরা ধুমধাম গোলমাল চাহি না; আর্য্যেরা কি জানিতেন, তাহা যদি আমরা জানিতাম, তবে ভাবনা কি ছিল! তাঁহারা যাহা জানিতেন, তাহাই জানিতে চাই, তাঁহারা যাহা দেখিতেন তাহাই দেখিতে চাই, তাঁহারা যাহা ভাবিতেন তাহাই ভাবিতে চাই, তাঁহারা যাহা করিতেন, তাহাই করিতে চাই। যে সভ্যতা পিতা, মাতা, ভ্রাতাকে উপেক্ষা করিয়া, শ্বশ্রু, স্ত্রী ও শ্যালকের বশীভূত হইতে পরামর্শ দিতেছে, যে সভ্যতা সমাজে অনিবার্য্য ব্যভিচার, স্বার্থপরতা, স্বতন্ত্রতা, বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য আদি পুঞ্জায়মান আবর্জ্জনা রাশি আনিয়া ফেলিয়াছে, যে মায়াবিনী সভ্যতা সন্তরণে সাগর পার হইয়া, লোকসকলকে শিশ্নোদর-পরায়ণতার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছে; আমরা তাহাকে সভ্যতা বলিতে চাহি না। যে সভ্যতা কেবল বিষয়-স্পৃহাকেই বলবতী করিতেছে, যে সভ্যতা ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে টানিয়া রসনার বিলাসবস্তু করিয়া দিয়াছে, যে সভ্যতা বিকট হাস্য-বিকাশে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকেও উড়াইতে চায়, আমরা তাদৃশী সভ্যতার পক্ষপাতী নহি। আমরা বিরাটের উত্তর গোগৃহে অর্জ্জুনকে শূন্যমার্গে রথ চালাইতে দেখিয়াছি, আমরা মহারাজ নলকে ষ্টীম এঞ্জিন অপেক্ষাও দ্রুতবেগে রথ-সঞ্চালনে সমর্থ দেখিয়াছি। আমরা সেইরূপ তড়িদ্বার্ত্তাবহ দেখিতে চাই, যাহা দুর্ব্বাসার আগমনে বনবাসিনী দ্রুপদনন্দিনীর ব্যাকুল চিন্তাস্বর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণকুহরে কহিয়া ছিল। এরূপ বিলাসদ্রব্যে আমাদের প্রয়োজন কি, যাহাতে হৃদয়ের পবিত্রতা বিনষ্ট করে; এমন ধনে

প্রয়োজন কি, যাহাতে আমাদিগকে মদান্ধ করিয়া দেয়। আমরা পর্ণ-কুটিরে বাস করিতেও প্রস্তুত, যদি আর্য্যগণের ন্যায় সুখ পাই। আমাদের বিক্রম গেল, বীরত্ব গেল, সুখ গেল, স্বাধীনতা গেল, শান্তি গেল, তবে থাকিল কি!

হায়! এ মনের দুঃখ কাহাকে জানাইব! যাঁহাদিগকে জানাইলে বেদনার উপশম হইত, তাঁহারাও নাই। সে অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে। হা! ভারতে যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ সমাজ ও ধর্ম্মপথের নেতা ছিলেন, এক্ষণে এই ঘোর বিপৎসময়ে তাঁহারা কোথায় লুক্কায়িত হইলেন! তাঁহাদের বংশধরগণ সেই পবিত্র পদবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক্ষণে কোন্ দিকে প্রস্থান করিতেছেন! হাঃ! সিংহের শিশু হইয়া শৃগালের বেশ কেন হইল। অভ্যন্তর হইতে জীবন্ত ফণী চলিয়া গিয়াছে, কেবল ফণীর অনুকৃতি জীর্ণত্বক্ পড়িয়া আছে। গলদেশে পবিত্র যজ্ঞোপবীত থাকিতে থাকিতেই কি ব্রহ্ম-তেজ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল! আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিলাম, কুলনারীগণের কলহ ভিন্ন আর বেদধ্বনি শ্রুত হইল না। ভারতীয় গগণ আর যজ্ঞধূমে পবিত্র হয় না। গৃহাদি আর দেবপূজা ও হোমের সৌগন্ধে আমোদিত হয় না। অর্থের লালসা, বিষয়ে মত্ততা ও ধর্ম্মে ঔদাসীন্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে সমুচিত দক্ষিণা দিতে পারিলে, স্মৃতির নূতন ব্যবস্থা ক্রয় করিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য আলোকের একটী কিরণ যদি কাহাকেও স্পর্শ করিতে পায়, অমনি তাহাকে ইন্দ্রজাল বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। অধ্যাপক আর পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইতে চান না, সন্তান আর সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে ইচ্ছুক নহে। যাঁহারা পবিত্রতার জলন্ত মূর্ত্তি ও ভূদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হা! ম্লেচ্ছাচার তাঁহা-দিগকেও অন্ধ করিয়া দিল। ব্রহ্মচর্য্য গিয়াছে, ব্রাহ্মণ্য যাইতে বসিয়াছে, ব্রহ্মসূত্র-গাছটীও যায় যায় হইয়াছে। কি ঘোর বিপদ্! আর্য্য জাতির পবিত্রালোক ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। ভীষণ নারকী অন্ধকার মুখ

ব্যাদান করিয়া আসিতেছে, আর কিছু পরে যেন সকলই অন্ধকার হইবে। আশা ভরসা সমস্তু ফুরাইবে, আর্য্যদিগের পবিত্র নাম বুঝি বিলুপ্ত হইবে। মহত্ত্ব যে ভারতভূমির সুচারু চরণের চিরসেবক ছিল, সেই চির গৌরব বুঝি পৃথিবী হইতে ধৌত হইয়া যাইবে।

সত্য বটে, প্রধানতঃ অর্জ্জন-স্পৃহা রোমকে মহৎ করিয়াছিল ও ইংলণ্ডকে মহৎ করিয়াছে। মাতৃভূমির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ গ্রীসকে মহৎ করিয়াছিল, কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে, আমাদের ভারতবর্ষ এক সময়ে গ্রীস, রোম ও ইলণ্ড অপেক্ষা উন্নতির অধিকতর উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। সত্য বটে, দুই এক জন খ্রীষ্টিয়ান মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বলেন যে "ভারতের আর কি উন্নতি হইয়াছিল, কেবল জন কতক লোক একটু ফিলজফি শিখিয়াছিল।" কিন্তু প্রকৃত চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ভারতের যে উন্নতি হইয়াছিল,তাহা আর কোন দেশে এপর্য্যন্ত হয় নাই। কেবল পরমাত্ম-পরিচিন্তনাই ভারতকে উন্নতির উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়াছিল। ভাষা, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন আদি তাবদ্বিষয়িণী উন্নতিই তাঁহাদের চরণ সেবা করিয়াছিল।

ভারতীয় সমাজ ধর্ম্মে গঠিত। ধর্ম্ম-সূত্রকে অবলম্বন না করিয়া অত্রস্থ দৈনন্দিন কার্য্যের একটীও সংরচিত হয় নাই। আজ সেই পুণ্যভূমি আর্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্ম অনাদৃত পদবিদলিত ও তিরস্কৃত হইতেছে। স্বেচ্ছাচারই আজকাল ধর্ম্মের পবিত্র আসন অধিকার করিয়াছে। কেহ কৃষ্ণভ্রমে খ্রীষ্টের শরণ লইলেন, কেহ স্বয়ংসিদ্ধ সহজজ্ঞানশীল হইয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, কেহ নিজ বিধানকে নব বিধানের পরিচ্ছদ পরাইয়া সখিসম্বাদ গাইতেছেন, এবং অবশিষ্টের মধ্যে কত লোক যে মুখে হিন্দু স্বীকার করিয়া না হিন্দু না মুসলমান হইয়া উঠিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

ধর্ম্ম-জীবনে কেন এত বিপ্লব ঘটিল, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম ভ্রাতারা বলিবেন, ঋষিগণ মনুষ্য ছিলেন, সুতরাং অভ্রান্ত ছিলেন না, অতএব তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম যে ভ্রান্তিসঙ্কুল হইবে তাহার বিচিত্রতা কি! তাঁহাদের ভ্রান্তি-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান আদি কত ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্মের মণিময় মন্দিরের সুচারু চূড়া চূর্ণ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন, তাহা বলা যায় না; কিন্তু যাই একটী ধর্ম্ম প্রবল হইয়া, আর্য্য ধর্ম্মের মর্ম্মদেশে আঘাত করিতে যায় অমনি আর্য্য ধর্ম্মের বজ্রবিজয়ী সিংহনাদে সকলে ত্রস্ত, কম্পিত ও হতচেতন হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ ভারত আর্য্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহারও নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত রাজার শাসনাধীনতা, আর্য্য শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাব, বালক কাল হইতে আর্য্য ধর্ম্মানুকূল রীতিনীতি শিক্ষাদানে ত্রুটী, সময়ে সময়ে আর্য্যধর্ম্মের প্রচুর প্রচারাভাব, গুরু পুরোহিতবর্গের অকৃতবিদ্যতা, চিত্তের অপ্রশস্ততা, স্বার্থপরতা ও ধর্ম্মজ্ঞান-বিহীনতা, সংস্কৃতভাষার প্রতি অযথা বিরাগ আদি বিবিধ কারণে ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে ঘোর বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদি ভারতের সাধু সন্তানগণ আবার সাধু চেষ্টা করেন, তবে আবার ভারত সেই অবহেলিত ও পদবিমর্দ্দিত ধর্ম্মকে মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিবে, আবার সুখের দিনে ভারত সুখের পরম জ্যোতিঃ বহুধা বিকীর্ণ করিয়া, সমস্ত জগৎকে সুখ সাগরে ভাসাইবে।

আঘাতের পর যেমন প্রতিঘাত, ক্রিয়ার পর যেমন প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, উন্নতির পর অবনতিও তদ্রূপ অনিবার্য্য। বিজাতীয় ভাষা-শিক্ষা এই অবনতি-স্রোতে ভয়ঙ্কর বিপ্লব-তরঙ্গের সাহায্য করিয়াছে। মুসলমানশাসনে পার্সি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিলাস-প্রিয় ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়াছিল, কিন্তু তখনও আর্য্য আচার ব্যবহারের অবশিষ্ট ছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা সেটুকুও ভাসাইয়া দিতেছে। ইংরাজি পড়িতে দোষ দিই না, কিন্তু ভাষার অনুরাগ সহ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যে সেই বিজাতীয় প্রকৃতি অলক্ষিত ভাবে পাঠকের হৃদয়াধিকার করে ইহাই আক্ষেপের বিষয়। ইংরাজি শিখিতে শিখিতে যে ইংরাজ হইতে ইচ্ছা হয় ইহাই পরম দোষাবহ। এই ভাব পরিহার করা বড়ই কঠিন। অনুরাগ সহ আর্য্য শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে মোক্ষমূলরের আর্য্য হইতে স্পৃহা জন্মিয়াছে। জল-মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে গেলে যেমন জল পরিহার করা যায় না, তদ্রূপ ইংরাজি ভাষা পড়িবার সময় ইংরাজি প্রকৃতি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। হংসপাঠক কয় জন পাওয়া যায়? এই ভাবে চিত্ত বিকৃত হইল। আবার মিশনারিগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া আর্য্য-ধর্ম্মের বৃথা নিন্দাবাদ করিয়া অশিক্ষিত লোকের মন আরও কলুষিত করিলেন, শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত বালকের কপালে আগুন লাগিল। তৎপরে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ বক্তৃতার বেগে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিলেন। বক্তৃতার আশু মনোমোহিনীশক্তি হৃদয় অধিকার করিল। কিছু দিন পরে যখন দেখিল যে সমাজে কেবল মাত্র বচন-সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি হইবার আশা নাই, উহাও রূপান্তরিত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম; তখন যুবা ভাবিল ধর্ম্ম কর্ম্ম মিথ্যা। নাস্তিকতা তাহার স্কন্ধে আশ্রয় করিল। কুকর্ম্মকণ্টকমালা তাহার কণ্ঠমালা হইল, মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল ভোগেচ্ছায় পরিসমাপ্ত হইল। যুবা দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইল। বারুণী, বারাঙ্গনার সেবাই তাহার প্রধান কার্য্য হইল। রাক্ষসাচার, পশ্বাচার, ব্যভিচার, যথেচ্ছাচার আর তাহার চক্ষে দূষণীয় নহে। সহধর্ম্মিণীও তাহার সহগামিনী হইল। ভারত পাপস্রোতে ভাসিতে লাগিল। ভয়ানক বিপ্লব আসিয়া পবিত্র ভারতকে কলঙ্কিত করিল।

আর্য্যসন্তান! যদি কেহ জাগ্রৎ থাকেন, সচেতন থাকেন, তবে উত্থান করুন। জননী ভারতভূমির দুঃখাপনোদনে যথাবিধি যত্ন করুন।

ত্রাহি! ত্রাহি!! ত্রাহি!!!

জাতীয় প্রকৃতি।

বিধাতার বিচিত্র রচনাপ্রণালী পর্য্যালোচনা কর, দেখিতে পাইবে তাঁহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত দ্রব্য, অনন্ত কৌশল, অনন্ত ব্যবস্থা ও অনন্ত ব্যাপার নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে, অনন্ত ভাবে তাঁহার অনন্ত মহিমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। "অনন্ত" শব্দ আমাদিগের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, কিন্তু চিরদিন তাঁহার ভাবের, গুণের ও স্বরূপের সেবা করিয়া থাকে। এই অনন্ত ব্যাপারের মধ্যে আবার সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলার সীমা নাই। সমস্ত জগৎ তাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া কেমন শৃঙ্খলা পূর্ব্বক তাঁহার বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছে! কীট পতঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত; তরুলতা গুল্মাদির দিকে অভিনিবেশ কর, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। তির্য্যগ্‌জাতির দিকে নেত্রপাত কর, তাহারাও স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত; চতুষ্পদের দিকে তাকাও, তাহারাও পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত। এইরূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৃষ্টি অনন্ত হইয়াও আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমে সকলে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া বিধাতার বিচিত্র শিল্প চাতুরীর পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রকৃতির বৈচিত্র্যই জাতি বা শ্রেণীভেদের মূল। বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতি বিরচিত হইয়া থাকে। অশ্বত্থ, আম্র, বিল্ব, বট, বকুল, শাল, তাল, তমাল, নিম্ব, নারিকেল প্রভৃতি ভূরুহবর্গ সকলেই উদ্ভিদ্ হইয়াও প্রকৃতিভেদে বিশেষ বিশেষ নাম, রূপ, গুণ, অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে। মক্ষিকা, মশক, দংশক, আদি ক্ষুদ্র জীবগণ প্রকৃতিভেদে ভিন্নজাতিত্ব লাভ করিয়াছে। সর্প, বৃশ্চিকাদি সরীসৃপগণ প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়াছে। শুক, পিক, কাক, শকুন্ত, গৃধ্র আদি খেচরগণ প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছে। গো, মেষ, মহিষ,

মার্জ্জার, সিংহ, শার্দ্দূল আদি চতুষ্পদগণও প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভুক্ত। বাহ্য আকৃতি, স্বরূপ মনঃপ্রকৃতি জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা আদি দেখিয়াই, আমরা বিশেষ বিশেষ প্রাণীর শ্রেণী নিরূপণ করিয়া থাকি। আবার স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যেও দেশ দেশান্তর, জল বায়ু ও জ্যোতিশ্চক্রের গতিবিধি অনুসারে প্রকৃতির বিভিন্নতা প্রযুক্ত অগণ্য বিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহার সীমা করা মানবের সামান্য বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে। অনন্ত স্বরূপের অনন্ত লীলার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, প্রথমে অনন্ত সত্তার অমৃত সাগরে অবগাহন করিতে হয়। নতুবা কেবল বুদ্ধি চিন্তা, বা কল্পনা তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে না। তাঁহার অনন্ত আকাশে তারকাস্তবক দেখিয়া কে না অবাক্ হইয়া যায়!

দ্বিপদ জীবের মধ্যে মানব একটী বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। মানবের শরীর ও মনঃপ্রকৃতি সকল প্রাণী হইতে অতীব উন্নত ও পরিণত। দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত প্রাণীর উন্নতির আদর্শস্থল হইয়া মনুষ্য বিরচিত হইয়াছে। দেশ দেশান্তরীয় প্রকৃতি মনুষ্য সমাজের দৈহিক বর্ণ, গঠন, বল, বীর্য্য, ভাষা, পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম আদি তাবদ্বিষয়েরই বিভিন্নতা সম্পাদন করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় জন্য পাশ্চাত্য দেশের সহিত পূর্ব্ব ভূভাগের সর্ব্বসাধারণ বিষয়ে ঐকাবয়বিকত্ব বা একরূপত্ব দৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি সকল জাতিকে একজাতীয় উপাদানে নির্ম্মাণ করেন নাই, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে সকল দেশের মনুষ্য কখনই এক অবস্থাপন্ন হইবে না ও হইবার নহে। প্রকৃতির রীতি এই যে যেখানেই প্রকৃতির উপাদান তীব্র, তেজস্বী ও প্রবলতর, সেই খানেই দুর্ব্বল প্রকৃতি তাহার পদানত হইয়া থাকে। যদি তীব্রতর প্রকৃতি অধিক দিন উক্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির সহানুভূতি করে, তবে দুর্ব্বলাও বলীয়সী হইয়া উঠে। আর যদি প্রবলতর প্রকৃতি দুর্ব্বলের উপরি আধিপত্য করে, তবে দুর্ব্বল এক কালে বিনষ্ট হইয়া যায় ও বলবতী প্রকৃতি সেই স্থানে

অধিকার বিস্তার করে। যদি একজন বিদ্যাবান্ ব্যক্তি জনৈক মূঢ়ের সহিত বার্ত্তালাপ-কালে তাহার মূঢ়তা জন্য অস্ফুট ভাব ও তর্কের অযৌক্তিকতা দর্শনে দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক নিজ বুদ্ধি দ্বারা তাহার ভাবের বিকাশ ও তর্কের সরল পথ দেখাইয়া দেন, তবে উক্ত মূঢ় ব্যক্তি বিদ্যাবান্ পুরুষকে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজ উন্নতি সাধন করিতে পারে। আর যদি বিদ্যাবানের তীব্র তর্কজাল মূঢ়ের বুদ্ধি ভেদ করিয়া কেবল নিজ তেজস্বিতা বিস্তার করিতে থাকে, তবে মূঢ়ের বুদ্ধি নিতান্ত অভিভূত ও বিনষ্ট হইয়া যায় ও উক্ত পণ্ডিতের যুক্তি ও তর্কই তাহার হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমটীতে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে প্রবল-তরের সহানুভূতিতে দুর্ব্বল প্রবল হইয়া উঠে; দ্বিতীয়টীতে ইহাই উপপন্ন হইল, প্রবলতরের আধিপত্যে দুর্ব্বল বিনষ্ট হইয়া যায় ও তৎপরিবর্ত্তে একমাত্র প্রবল প্রকৃতিরই সর্ব্বত্র অভ্যুদয় হয়।

কালক্রমে স্বাভাবিক রীতিতেও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে যে দেশের যে জাতির, যে দ্রব্যের যে প্রকৃতি ছিল, বর্ত্তমান শতাব্দীতে সর্ব্বত্র তাহার অল্পাধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সে সময় লোকের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি যেরূপ ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। সে সময় যত প্রকার জীব ও তরু লতাদি দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহার অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক নূতন জাতীয় দ্রব্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে দেশীয় লোকের মনঃ প্রকৃতি যে দিকে ছিল, এক্ষণে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই রূপে বহুল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে কালক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কোথাও শুভ এবং কোথাও বা অশুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে।

কালের স্রোতের উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতিই উন্নতি লাভ করে

নাই, করিতেও চাহে না। প্রযত্ন ও উদ্যমই উন্নতির মূল। যে জাতি আপনাকে অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরূঢ় করাইতে চায়, সে একটী ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের উচ্চতর প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে থাকে এবং সেই উচ্চতর প্রকৃতির সাহচর্য্যে ও সহানুভাবকতায় সমগ্র জাতি উন্নত হইয়া উঠে। স্বতন্ত্র হইয়া কোন ব্যক্তি একাকী জগতে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। এক ব্যক্তি কোন একটী নূতন শক্তির আবিষ্কার করিলেন, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত সেইটী বহুতর লোকে সমাদর না করিবে অর্থাৎ যত দিন সাধারণের প্রকৃতি তাঁহার প্রশংসনীয় প্রকৃতিতে পরিণত ও তৎসহানুভূতিতে প্রবৃত্ত না হইবে, ততদিন তিনি একাকী কখনই নিজ আধিপত্য সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ইহাও বর্ত্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান-বিশারদদিগের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যে গ্রামে একটী মাত্র তাল বৃক্ষ আছে অর্থাৎ যদি সেই বৃক্ষ তাহার অলক্ষ্য শক্তির দ্বারা জানিতে পারে যে তথায় তাহার সজাতীয় বৃক্ষ আদৌ নাই, তবে সেখানে সে উত্তম রূপে বর্দ্ধিত বা ফলপ্রসূ হইবে না। ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যদি একটী উদ্যানে কেবল মাত্র এক জাতীয় বৃক্ষ অর্থাৎ কেবল আম্র বা কেবল নারিকেল রোপিত হয়, তবে সে উদ্যানে এক একটী বৃক্ষে এত ফল ফলিবে যে, অন্য উদ্যানে যদি এক এক জাতীয় এক একটী মাত্র বৃক্ষ থাকে, তাহাতে কখনই তত ফল দান করিতে পারিবে না। আম্রাতক, নারিকেল, নিম্ব একত্রে দণ্ডায়মান, প্রকৃতিগত কেহই কাহারও সহিত মিত্রতা করিতে পারিতেছে না—হৃদয়ে কাহারও স্ফূর্ত্তি নাই, পরস্পর সকলেই নিস্তেজ—অগত্যা উদ্যানাধিকারীর আশানুরূপ ফলদানে অসমর্থ। যেখানেই অধিক ফলের আশা, সেই খানেই এক প্রকৃতির বৃক্ষ অধিক থাকা আবশ্যক।

মনুষ্য যখন নিজ গুণের বা পরাক্রমের ফল জগতে অধিক দেখাইতে

চায়, তখন এক প্রকৃতির লোকসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। একটী প্রধান প্রকৃতি যত অধিক পরিমাণে লোক-রাশিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিবে, ততই প্রত্যেকের প্রকৃতি অধিক পরিমাণে কার্য্যানুকূল হইবে। যে জাতির মধ্যে যে সময়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিশিষ্ট মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করেন ও যাঁহাদের মহতী প্রকৃতি ধীরে ধীরে বা দ্রুতবেগে প্রত্যেকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে, সেই জাতিই জগতে প্রবলতর হয় ও তাহারাই জাতীয় প্রকৃতির ফল ও রসাস্বাদে চরিতার্থ হয়।

আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, ভাষা, ধর্ম্ম আদি কতিপয় সামগ্রীই জাতীয় প্রকৃতি সংগঠনের প্রধান উপাদান। যদি কোন দেশে কোন মহাত্মা বা কোন সম্প্রদায় এই কএকটীর নির্ব্বিশেষ অথবা অবিরুদ্ধ বা অবিসম্বাদী ভাব প্রচলন করিতে পারেন, তবে সেই দেশেই জাতীয় প্রকৃতির প্রতিভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে দেশে আহার-সামগ্রী একরূপ, যেখানে জাতক্রিয়া, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি ব্যবহার প্রণালী এক শাস্ত্রানুমোদিত, যে দেশে পরিচ্ছদ বা বস্ত্রাদি পরিধান করিবার রীতি নীতি একরূপ, যে দেশে সকলে এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে অথবা স্থানীয় নানা ভাষা সত্ত্বেও যে দেশে একটী সর্ব্ব সাধারণের বোধ-সুগম ভাষা প্রচলিত আছে এবং যে দেশের অধিবাসিবর্গ এক শাস্ত্রোপদেশানুসারে স্ব স্ব ধর্ম্মসাধন করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আদি এক প্রকার উপাসনা পদ্ধতিরই অনুগত এবং আনু-ষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপও এক বিধিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই দেশেই জাতীয় প্রকৃতির উজ্জ্বলতর সুন্দর মূর্ত্তি অতীব দেদীপ্যমান্—সেই দেশই জগতে উচ্চ পদবী লাভ করিতে সমর্থ।

দুঃখী ভারত! তোমার গতি কি? তোমার এ আশা কোথায়? যদি তুমি আজ স্বতন্ত্র অসভ্যজাতির বাসভূমি থাকিতে তাহা হইলেও

তোমার প্রকৃতি গঠনের উপায় ছিল, অথবা যে বিদেশীয় রাজা তোমার উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তিনি যদি তোমার দুর্ব্বলতায় সহানুভূতি করিয়া নিজ প্রবল প্রকৃতির সহযোগে তোমার পুষ্টিসাধন করিতেন, তাহা হইলেও আশা ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া বরং প্রবলের আধিপত্যে তোমার নিজ প্রকৃতি বিলুপ্ত হইতে চলিল। বিজাতীয় ও বিদেশীয় প্রকৃতির প্রতাপে তুমি বিপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছ, এ প্রকৃতি পরিত্যাগ না করিলে, তোমার কল্যাণ নাই। বিজাতীয় প্রতাপে তোমার বুদ্ধি বিকল, ভাব কলুষিত, মতি ছিন্ন ভিন্ন ও চিত্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তোমার প্রকৃতি অতি মলিন হইয়া উঠিয়াছে। তুমি যথেচ্ছ আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বৈধ আহার ব্যবহারের অনুকরণ কর। কথন বিলাতী, কথন মুসলমানী পরিচ্ছদ না পরিয়া ভারতের স্ব স্ব প্রদেশানুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ কর। ভাষা কতক ইংরাজী, কতক পার্শী, কতক স্বদেশী না বলিয়া কেবল স্বদেশী ভাষার অনুশীলন বা ব্যবহার করিতে থাক। কতক খ্রীষ্টানী, কতক মুসলমানী, কতক বৌদ্ধ, ঈদৃশ বিরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সত্য সনাতন স্বদেশীয় (বৈদিক) ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, ভারতে জাতীয় প্রকৃতির যথোচিত উন্নতি হইবে। ভারত! তবে আবার আত্ম-শাসনে সক্ষম হইবে, ভারতবাসিগণ তখন একটী বিশেষ জাতি বলিয়া সভ্যজগতে পরিচয় দিতে পারিবেন। জাতীয় প্রকৃতি সংগঠিত না হইলে ভারতের কিছুমাত্র আশা ভরসা নাই। ভারত! সচেতন হও, নিজ অধিকার বুঝিয়া লও। নিজ আসনে স্বয়ং উপবিষ্ট হও, আপনার পরিচয়ে আপনি সুখী হও। আপনার ধনে ধনী হইয়া, সভ্যতা ও জ্ঞানের উচ্চ সিংহাসনে অধিরোহণ কর।

—o—

আর্য্য ধর্ম্মের বিষম বিপদ্।

ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি স্বর্গীয় সৌগন্ধযুক্ত উপাদেয় উপাদানে আর্য্যগণই প্রথম সংস্থাপন করেন। প্রকৃতির নিভৃত কোষ হইতে অমূল্য রত্ন রাজি নিষ্কাশন করিয়া তাহা স্তরে স্তরে আর্য্যগণই সাজাইয়া দেন। সেই উজ্জ্বল কিরণমালা হইতেই দিগ্‌দিগন্তে ধর্ম্ম-প্রভা ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাঁহারা তপস্যা, স্বাধ্যায়, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উপাসনা, ব্রত, নিয়ম, সংযম আদি দ্বারা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে তুলাদণ্ডের ন্যায় সমতুল করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্ম জীবের কার্য্য দ্বারাই উন্নত ও মলিন দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম অনন্ত স্বরূপের অনন্ত ভাণ্ডারের সূক্ষ্ম ভাবে নিত্য বিদ্যমান বস্তু। জীব নির্ম্মল প্রকৃতির নিয়মানুসারী হইলেই ধর্ম্ম ধরাধামে আসিয়া জীবগণের ইহপারলৌকিক সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। যে সময়ে জাতীয় প্রকৃতি সমবেত বল দ্বারা ঐশী শক্তির অক্ষয় কোষ হইতে অনুরাগ ও ভক্তির সহিত ব্রহ্মতেজকে প্রবল রূপে আকর্ষণ করিতে থাকে, সে সময়ে বাহ্য জগতেও সুখের শুভ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তৎকালে জীব মাত্রেই পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারে। দুঃখ দুর্ভিক্ষ, পীড়া, অকাল মরণ প্রভৃতি যাতনা কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। পৃথিবী কোন কালেই একবারে ধর্ম্ম শূন্য হয় নাই, হইবেও না। কোন সময়ে ধর্ম্ম ক্ষীণবল, কখনও বা প্রবল বলিয়া লক্ষিত হয়। বিরল লোকে ধর্ম্ম সাধন করিলে ধর্ম্মকে ক্ষীণবল, এবং অধিকাংশ লোকে ধর্ম্মপরায়ণ থাকিলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রবল বলিয়া প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ স্বয়ং ধর্ম্ম কখনও ক্ষীণবল বা প্রবল হয়েন না। মনুষ্যগণ অধিক পরিমাণে বিষয়-সুখ-ভোগী ও বিলাসী হইলেই ধর্ম্মের যে কিরণমালা পূর্ব্বে প্রবল বেগে ইহ জগতে বর্ষিত হইতেছিল তাহা ধীরে ধীরে নিজ স্থানে সংহৃত হইয়া যায়। মনুষ্যগণই সুখ হইতে

বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মের কখনই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। মনুষ্যের কর্ম্ম-দোষে যখন ধর্ম্ম ধরাধাম হইতে অপসৃত হইতে থাকেন, তখন যে অল্প-সংখ্যক ধর্ম্মাত্মা পবিত্র স্থান বিশেষে থাকিয়া যথাবিহিত তপস্যাদি করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ব্বেদ-যুক্ত হয়। তাঁহাদের হৃদয় উৎসবান্তে পুরীর ন্যায় বিষন্ন হইয়া পড়ে। এই মাত্র তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকের প্রকৃতি পবিত্র কণ্ঠে যে মধুর গান গাহিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ স্তব্ধ হওয়ায় তাঁহারা চমকিয়া উঠেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে যেন মরু-মরীচিকা দর্শনে ভীত হয়েন, প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই তাঁহারা জগৎকে পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থাপিত করিবার জন্য যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন না। যখন পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্ব্বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন কেবল মাত্র তাঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টা রূপ বায়ু দ্বারা পৃথিবীর কদর্য্য কলুষ রূপ ধূলি রাশিকে অপসারিত করিতে না পারেন, যখন পৃথিবীর অভাব আসিয়া তাঁহাদিগের পূর্ণ-হৃদয়কে বিশুষ্ক করিতে থাকে, তখন তাঁহাদিগের প্রাণ মন কাঁদিয়া উঠে। তখন গলদশ্রুনয়নে নির্জ্জনে বসিয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন। ভগবান্ সাধুদিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য এবং দুষ্কৃতি রাশি অপসারিত করিয়া ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনার্থে কখনও আংশিক শক্তির বিকাশে, কখনও বা অপরিসীম শক্তি সহ অবতীর্ণ হইয়া উপাসকদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করেন। ধর্ম্ম-জগতের এইরূপ বিপ্লব ভারতবর্ষ বহু বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আদি কল্পে বেদ যখন অন্তর্হিত হয়, বৈদিক ধর্ম্ম যখন বিপ্লুত হইয়া যায়, ভগবান স্বয়ং তখন অবতীর্ণ হইয়া বেদোদ্ধার করিয়াছিলেন। যখন অসুর-দল বিষয়-বিলাসে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মকে পদাঘাত, ভক্তগণকে নিপীড়িত ও বেদপথ রুদ্ধ করিয়াছিল, তখনও ভগবান্ সময়ে সময়ে নৃসিংহ, রাম কৃষ্ণাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

যখন স্বেচ্ছাচারী বেণ রাজা কদাচারে ভারতের মুখ মলিন করিয়া তুলিল, ভগবান্ তখনও ভারতের শান্তি বিধান করিলেন। যখন পুনর্ব্বার বেদাচার ও বৈদিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তখন সরস্বতীতীরে বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণগণ সরস্বতীর আরাধনা ও উৎকট তপস্যা দ্বারা বেদ পুনর্লাভ করিলেন ও বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল। শাক্যসিংহের সময়ে যে ভয়ানক বৈদিক ধর্ম্মে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাও ভগবৎ-কৃপায় সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে যে ধর্ম্মের বিপ্লব হয় তাহার পরেই প্রায় শুভ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। জলপ্লাবনে দেশ ডুবিয়া যায় সত্য কিন্তু সকল স্থানের পূতিগন্ধকর জলরাশি তাহার প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া যায়। যখনই যেরূপ বিপ্লব হউক না কেন, পরিশেষে ভারতবর্ষে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মই মনুষ্যের মনে আধিপত্য করিতে পারে নাই। আর্য্য ধর্ম্ম যদি অসার অমূলক ও সাধারণ লৌকিক বুদ্ধি-প্রসূত হইত, তাহা হইলে ইহা দৃঢ়মূল ও কল্প-কল্পান্ত স্থায়ী হইয়া মনুষ্যের কামনা পূর্ণ করিতে পারিত না। আর্য্যধর্ম্মের মূল কিছুতেই উৎপাটিত হইবার নহে। উহা সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া রসস্বরূপের পূর্ণ সত্তা হইতে রসাকর্ষণ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান শতাব্দীও বিষম ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময় বলিতে হইবে। এই অবকাশে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে সকল দেশের ভাষা, ভাব, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম নিজ নিজ রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, এবং বালকের ন্যায় সেই কল্পান্তস্থায়ী বীরেন্দ্রকেশরী স্থবির সৌম্যমূর্ত্তি আর্য্য ধর্ম্মকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উপহাস করিতেছে। অনন্ত শক্তিমান্ আর্য্যধর্ম্ম তাঁহাদিগের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না। যৌবন-মদমত্ত পাশ্চাত্য ভাষা ও ভাব-প্রিয় কতিপয় স্বেচ্ছাচারীকে নিজ নিজ শিষ্য করিয়া বিজাতীয় উপধর্ম্ম রাশি ভাবিতেছে, বুঝি ভারত তাহাদিগের

পদানত হইল। কিন্তু যখনই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণের প্রবৃত্তি প্রবল হইবে, যখনই ভারতীয় হৃদয় ভগবৎপদ লাভে ব্যাকুল হইবে, তখনই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের ক্রোড়ে তাঁহারা স্বতএব আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। পক্ষিগণ পৃথিবী ছাড়িয়া যতই কেন আকাশে উড্ডীয়মান হউক না, যত দূর কেন ভ্রমণ করুক না, কিন্তু ক্ষুধা বা পিপাসায় কাতর হইলে পরিশেষে তাহাদিগকে পৃথিবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে ভারতে যেরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান বিপ্লবের প্রকৃতি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। এক্ষণে সমস্ত উপধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্মকে পরাভব করিবার জন্য সমর-ভূমিতে উপস্থিত। আর্য্যধর্ম্ম অগণিত আয়ুধ সত্ত্বেও কাহারও প্রতি আঘাত করা আবশ্যক মনে করিতেছেন না। যাহার যত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র আছে, ভূরি পরিমাণে নিক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের অক্ষয় কবচে লাগিয়া সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে প্রায় সকল ধর্ম্মেরই অস্ত্র শেষ হইয়া আসিয়াছে। কেবল বাহ্বাস্ফোটন, লম্ফ প্রলম্ফ, দন্ত দ্বারা অধর পীড়ন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সকলেই দেখিতেছে, "আর্য্য" এই নামে একটি অপূর্ব্ব উপাদেয় জাতীয় প্রকৃতি নিহিত রহিয়াছে। তাই সংগ্রামস্থলে সকলেই কপট আর্য্য বেশধারী হইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে যিনি সর্ব্বদা অনার্য্য আচারে প্রবৃত্ত অর্থাৎ মদ্যপান, বেশ্যাসেবন, উৎকোচ গ্রহণ আদি যাঁহার নিত্য ব্র ৽, তিনিও বলেন, "আমি আর্য্য-ধর্ম্মী।" যিনি অভক্ষ্য ভোজন, ম্লেচ্ছান্ন—যবনান্ন ভোজনে আসক্ত, যজ্ঞোপবীত-পরিত্যাগী, সগুণ উপাসনার দ্বেষ্টা, তিনিও বলেন, "আমি আর্য্য-ধর্ম্মী।" কুক্কুট-মাংস যাঁহার বড় প্রিয়, সাহেবী চাল যাঁহার একান্ত অনুকরণীয়, যিনি পূজা পাঠ ব্রত নিয়মাদি বর্জ্জিত, তিনিও বলেন, "আমি আর্য্য-ধর্ম্মী।" যিনি বলেন ঈশ্বর নাই, উপাসনা করা যাঁহার মতে বাতুলতা, ভক্তির

সহিত উপাসনা করিলে ঈশ্বর দয়া করেন না, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তিনিও বলেন, "আমি আর্য্য-ধর্ম্মী।" এইরূপে আর্য্য-ধর্ম্মের পতাকা হস্তে লইয়া কত লোকে বক্তৃতা দ্বারা, ব্যাখ্যান দ্বারা, সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া আর্য্য-ধর্ম্মের ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহারা বাস্তবিক কখনও আর্য্য ধর্ম্মের সেবা করেন না, আর্য্য শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ব্রত সংযম-শীল সদ্‌গুরুর নিকটে উপদেশ পান নাই, তাঁহাদের দ্বারা আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় বস্তুতঃ আর্য্যধর্ম্ম মর্ম্মাহত হইতেছেন। আজ কাল লোকে বক্তৃতাশ্রবণ, সংবাদ পত্র ও নবীন লেখকগণের লেখনীপ্রসূত পুস্তক পাঠ দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে চান। দুর্গম শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া রত্নোদ্ধার করিতে কেহই অগ্রসর হন না। সুতরাং আজ কাল লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা-পত্রধারী অথবা রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিজ লেখনীর দ্বারা ধর্ম্মকে যেরূপ চিত্রিত করিতেছেন, "শিব গড়িতে বানর হইলেও" তাহাই প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মের মর্ম্ম ইহাই অনেকে বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। অমুক ব্যক্তি "এম এ বি এল্", উনি যাহা বুঝিয়াছেন, অবশ্য তাহা সত্য হইবে। অমুক ব্যক্তি "সি আই ই", উনি অমুক অমুক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, উনি শিক্ষা বিভাগে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ, উনি যখন বলিতেছেন, ঈশ্বর উপাসনার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই, কেবল পরোপকার সাধনই মনুষ্যের পরম ব্রত, অতএব ইহাঁর কথাই সত্য। অমুক ব্যক্তি একজন রাজকীয় বিচারকর্ত্তা, উহাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীপাঠে বঙ্গভাষা নূতন জীবন লাভ করিয়াছে, উহাঁর গ্রন্থ ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে, উনি যখন বলিতেছেন, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অবতার ও মৎস্য কূর্ম্মাদি ব্রাহ্মণ দিগের স্বকপোল কল্পিত রচনা মাত্র", তবে এই কথাই মানিবার যোগ্য। অমুক ব্যক্তি বঙ্গ-ভাষার একজন

সুপরিচিত লেখক, তিনি যখন একটি প্রকাণ্ড প্রবন্ধে লিখিলেন, যে শরৎকালে, কচু, কলা, ধান্য আদি কেমন নশ্বর প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তৎই দুর্গোৎসবে প্রকৃতির উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়, বস্তুতঃ দশভুজা মূর্ত্তি বুদ্ধির কল্পনা মাত্র; তখন এ কথা অবহেলা করি কিরূপে? অমুক ব্যক্তি একজন ডেপুটি কলেক্টর, তিনি একটি সুদীর্ঘ ইংরাজি প্রবন্ধে লিখিলেন যে মহাভারতে যে পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার ঐতিহাসিক ঘটনা বস্তুতঃ সর্ব্বৈব মিথ্যা। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ ভূতই পঞ্চ পাণ্ডব। দ্রৌপদী ক্রিয়া শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ আত্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন মাত্র। অতএব এ কথা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব! এই রূপে সাধারণ হিন্দুসমাজ পরমুখাপেক্ষী হইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম-জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইতেছেন। আর্য্যধর্ম্ম এই রূপে প্রচারিত হওয়ায় ইহার সত্যতা, সারবত্তা ও গৌরবের পরিবর্ত্তে গ্লানি বিঘোষিত হইতেছে। মহর্ষিগণের উচ্চ উদার ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা করা হইতেছে। আর্য্য শাস্ত্র পিতৃমাতৃহীন অনাথের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইতেছে। এই দুঃসময়ে বাস্তবিক যদি সকলে কৃপা করিয়া নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্য্যশাস্ত্র-সাগর-মন্থনে প্রবৃত্ত হয়েন ও তাহা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া জগতে প্রচার করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

আর্য্য-ধর্ম্ম কেবল বাক্যে বুঝিবার ধর্ম্ম নহে। আর্য্য-ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব কিছু জানিতে হইলেই তদনুকূল সাধন না করিলে কিছুই জানিতে পারা যায় না। শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে বিশেষ বিশেষ ব্রত ও সংযম করা বিধি আছে। তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে সে শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা যায় না। তর্ক শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে মস্তিষ্কের যে যে অংশ স্ফুরণ করিবার জন্য যে যে রত্নের আহরণ ও যে যে বৃত্তির সংযমন করা আবশ্যক, যোগশাস্ত্র

অধ্যয়ন কালে তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার করিতে হয়। এই সকল নিয়ম নিষেধ আজ কাল লক্ষ্য করা হয় না বলিয়াই ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপক ন্যায় শাস্ত্র পড়িয়াও লোকে ঘোর কদাচারী হইয়া পড়ে। আজ কালকার রাজকীয় বিদ্যালয়ের ইংরাজী শিক্ষা-প্রণালীর ন্যায় শাস্ত্রশিক্ষা-প্রণালী বিধিবদ্ধ হয় নাই। যথোচিত ধারণা শক্তি ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যভিচার ফল ভিন্ন কখনও সুফল প্রসব করে না। যাঁহারা ভারতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিতে চাহেন, যাঁহারা আর্য্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ নিজ কল্পনাপ্রসূত লিপি-চাতুরীতে যেন ভারতকে আর অন্ধতামিস্রকূপে নিক্ষেপ না করেন, ইহাই বার বার প্রার্থনা। তাঁহারা সকলে কৃতবিদ্য, একটু অভিমান ত্যাগ এবং একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলে তাঁহারা ভারতের নিতান্ত উপকারী বন্ধু বলিয়া পূজিত হইবেন। আর্য্যসমাজ অনেক কষ্টে অনেক বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া অগাধ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কম্পিত কলেবরে সিক্তপদে কূলের পিচ্ছিল ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যেন কেহ আর ধাক্কা দিয়া আবার প্রবল স্রোতে ফেলিয়া না দেন!

এক্ষণে বন্ধু বেশধারী শত্রু ভারতে অনেক বিদ্যমান। আজ কাল সংবাদপত্রের কৃপায় যেমন অনেক পেটেণ্ট ঔষধের নকল বিক্রীত হয়, অথচ পীড়ার কোন উপশম হয় না বলিয়া ঔষধ-আবিষ্কর্ত্তাগণও নিন্দা-ভাজন হইয়া থাকেন ও পরে তাঁহারা জানিতে পারিলে যেমন বিজ্ঞাপন দ্বারা সকল লোককে সাবধান করিয়া দেন, আমরাও তাঁহাদেরই ন্যায় পবিত্র আর্য্যশাস্ত্রের ও ঋষিগণের মর্য্যাদা রক্ষানুরোধে উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্মা আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা
মা আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং মা আগন্।

আমাদের সেই মন (যাহা অন্তরাত্মার মননে ও বৈদিক তত্ত্বাবধারণে পটু ছিল), আমাদের সেই আয়ু, সেই বুদ্ধি (যাহা কেবল আত্মাতেই স্থির থাকিত), আমাদের সেই চক্ষু, সেই কর্ণ আবার ফিরিয়া আসুক। যাহা আমরা হারাইয়াছি, যাহা আমাদের বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার ফিরিয়া আসুক।

—o—

নিজস্ব।

ভারত! তুমি সমস্তই ভুলিলে! তোমার নিজ কর্ম্মদোষে তুমি সমস্তই হারাইলে! স্বপ্নের ন্যায় কাল্পনিক উন্নতি স্রোতে ভাসমান হইয়া প্রকৃত উন্নতি লাভে বঞ্চিত হইলে। বিদেশীয় ভাষা, ভাব, ইঙ্গিত, বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীয় রীতি নীতি, বিদেশীয় প্রথা প্রণালীর মায়ায় মোহিত হইয়া তোমার নিজ প্রকৃতি-সুলভ উন্নতির উজ্জ্বল সোপান দর্শনে বঞ্চিত হইলে। তুমি আপনাকে উনবিংশ শতাব্দীর উন্নত জীব মনে করিয়া বৃথা গৌরবে গর্ব্বিত হইয়াছ। আমরা তোমার এই উন্নতিকে বৈদেশিক অপরিস্ফুট জ্ঞান-সমুৎপন্ন অধোগতি বলিয়া স্বীকার করি। "উনবিংশ শতাব্দী" তোমার নহে। উহা উন্নতিকামী আধুনিক সভ্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী-দিগের। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে বৎসর গণনা করিলেও বর্ত্তমান কাল তোমার বিংশ শতাব্দী। বিংশ শতাব্দীর অধোগতির অতীব গভীর গর্ভে তুমি দিন দিন ডুবিতেছ। যুরোপ অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থার দিকে বেগে দৌড়িতেছে। তাহার দেখাদেখি তুমি বেগে দৌড়িলে চলিবে না। তোমার অবস্থা যুরোপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তুমি অতি উচ্চ পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া এক্ষণে মলিন দশাগ্রস্ত হইয়াছ। তোমার সংস্কার মাত্র আবশ্যক। যুরোপ নূতন পদ গঠন করিতেছে, নবীন উদ্যম ও প্রভূত প্রযত্নসত্ত্বেও যদি উহার পদস্খলন হয়, তবে তাহাও মার্জ্জনীয়। কিন্তু তুমি আর্য্য মহাত্মাগণের নির্ম্মল পদচিহ্নিত পথ সত্ত্বেও যথেচ্ছার পন্থা অবলম্বন করিতেছ কেন? পথ দেখাইয়া দিলেও যে সে পথে না চলে ও পথে বিপন্ন হয়, তাহার দোষ মার্জ্জনীয় নহে এবং সে লোকের করুণা লাভে বঞ্চিত হয়। তুমি আপনার শরীর, আপনার প্রকৃতি, আপনার অবস্থার দিকে না তাকাইয়া পরের পশ্চাতে ধাবিত ও ক্রমশঃ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছ। তুমি একে একে আপনার

অঙ্গ হইতে বহুমূল্য হীরক-কাঞ্চন-জড়িত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ফেলিতেছ। বোধ হয় কিছু দিন মধ্যে তোমার নিজ শরীরটি পর্য্যন্ত বিদেশীয় ধাতুতে গঠিত করিয়া লইবে, তোমার স্বতন্ত্রতা ও পবিত্রতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। অতএব ভারত! ঊর্দ্ধমুখে ধাবমান হইও না! পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া দেখ, বিধাতার প্রদত্ত কত মহারত্ন-রাশি ফেলিয়া আসিলে। তোমার দোষে তোমার অলঙ্কার মলিন হইয়াছে! মলিনতার উপর ঘৃণা করিয়া সম্মুখের রবিকিরণদীপ্ত দিব্যকান্তি কাচ কঙ্কণের জন্য বহুমূল্য কাঞ্চন পরিত্যাগ করিও না। ধীর ভাবে সমস্ত মালিন্যের অপনয়ন কর, কণককান্তিভাতি দর্শনে তোমার মন পুনঃ প্রফুল্ল হইবে।

য়ুরোপীয় উপাদানে আপনার অঙ্গ পরিষ্কার করিও না। একটি মালিন্য দূর করিতে গিয়া আর একটি কদর্য্য দুর্গন্ধ লাগিয়া যাইবে। আপনার গৃহ অন্বেষণ করিয়া দেখ, একাকী না পার, বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া দেখ, তোমার পুরাতন কোষে স্তরে স্তরে কত উপাদেয় সামগ্রীরাশি সজ্জিত রহিয়াছে। সেই শাস্ত্রপুঞ্জ উন্মোচন করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে তুমি যাহা চাও তাহা কেমন পরিপাটীরূপে রক্ষিত রহিয়াছে। যদি তাহাতেও তত্ত্বাবতের পরিচয় বুঝিতে না পার, তবে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ঈশ্বরের শরণাগত হও। সেই বেদবিধাতা তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। তোমার নিগূঢ়তর শক্তিসাধনে সহায়তা করিবেন, স্বহস্তে তোমার অভাব মোচন করিয়া দিবেন। তুমি আপনাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিও না। তুমি চেষ্টাপরায়ণ হইলে ভগবৎ-কৃপায় আপনাকে অসামান্য অদ্বিতীয় করিয়া তুলিতে পার। নিজ নিজ সাধন-শক্তি ও তপঃ-প্রভাবে ধ্যানস্তিমিত-নেত্র দেবপ্রতিম আর্য্যঋষিগণ মনুষ্য-মঞ্চের শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন! তুমি ধীর জিজ্ঞাসু তত্ত্ব-জ্ঞান-নিপুণ হও, তোমার মলিন দশা ঘুচিয়া যাইবে। তোমার বৃথা

সভ্যতার গর্ব্ব পরিহার করিয়া আর্য্যশাস্ত্রীয় শাসনের অনুগত হও, তোমার দুঃখ বিদূরিত হইবে। তুমি আপনার সামগ্রীকে আপনার বলিতে শিক্ষা কর, তোমার সুখ-সূর্য্যের শীঘ্র উদয় হইবে। তুমি আপনার ভাবে আপনি নিমগ্ন হও, তোমার হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইবে। ভারত! তুমি আপনাকে বিস্মৃত হইও না। তুমি নিজ দোষে আপনার গৃহদ্বার আপনি অবরুদ্ধ করিয়া ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি চিনিতে পারিতেছ না। যত্ন ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ হও, সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। আত্ম-দৃষ্টি রহিত হইয়া তুমি অন্যের রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়াছ, তাই আজ আর্য্য-রীতি নীতি বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্য সমাজকে অনার্য্যসমাজ প্রস্তুত করিতে এত চেষ্টা করিতেছ। ভাগ্যদোষে তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধি না ঘটিলে কি আজ গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি আর্য্য সংস্কার গুলি মানসিক ও শারীরিক বিশেষ কল্যাণের উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে? এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারগুলি ত দূরের কথা, এসকল গুলির প্রতি বিশেষ কটাক্ষ না করিয়া বিবাহ-সংস্কারের প্রতি আমরা কিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ করিব। কেননা এই গুরুতর সংস্কারটি সংসারপ্রবাহের মূল ভিত্তি, গার্হস্থ্য-আশ্রম ধর্ম্মের প্রশস্ত পথ, বহুল ধর্ম্ম-সাধনের অনুকূল উপায়, ও সামাজিক শৃঙ্খলার প্রধান উপাদান।

যে সমাজে ধর্ম্মের অল্প বা অধিক যেমনই আদর থাকুক না কেন, ধর্ম্মভাবেই হউক বা সামাজিক বন্ধন বা শৃঙ্খলার দিকে তাকাইয়াই হউক, বিবাহ যে একটী প্রধান সংস্কার, তাহা সকলেই সর্ব্বত্র সমান আদরে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আর্য্যগণ এই সংস্কারবিধির যেরূপ গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছিলেন, ইহার আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছিলেন, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কোন

জাতিই তাদৃশ চিন্তা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। পুরুষ ও স্ত্রী বিভিন্ন গুণ-ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে যে উত্তম বিবাহ হয়, গোত্রের স্বীকারে তাহা অনেক জাতি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আর্য্য জাতি কেবল মাত্র গোত্র-বিচারের আবশ্যকতা দেখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহাদের উন্নত চিত্তের গম্ভীর গবেষণা এই খানেই পরিশ্রান্ত হইয়াছে, এমন নহে, তাঁহারা মানবের মনস্তত্ত্ব ও শারীর প্রকৃতি মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়াই তৃপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা মনুষ্যের আত্মগত প্রকৃতি পর্য্যন্ত দৃষ্টি করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে পুমাত্মার প্রকৃতি ও স্ত্রী আত্মার প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ-বিধি নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। পিতৃ-মাতৃ-সহযোগে সন্তান উৎপন্ন হয়, প্রজাপতির এই বিশাল রাজ্যের শ্রীসৌন্দর্য্য এই সন্তানগণেরই উত্তমাধমতার উপর নির্ভর করে, এই জন্য জগদীশ্বরের রাজ্যে পিতা মাতার স্কন্ধে অতীব গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত রহিয়াছে বলিতে হইবে। আবার স্নেহভাজন সন্তানগণের সুখ স্বচ্ছন্দতারও মূল সূত্র প্রচুর পরিমাণে পিতামাতার হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। দুর্ব্বলতা বা সবলতা, সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতা, সাধু ও অসাধু প্রবৃত্তি আদি মনুষ্যত্বের অনেকগুলি উপাদান পিতা মাতার আত্মগত প্রকৃতিতে নিহিত আছে। পিতা মাতা বলিলে আমাদিগের যাহা উপলব্ধি হয়, সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিবার জন্য আমরা স্থানে স্থানে তাহাই পুমাত্মা ও স্ত্রী-আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিব।

পুমাত্মা ও স্ত্রী-আত্মার সহযোগে একটী তৃতীয় পুরুষ-আত্মা কিম্বা স্ত্রী-আত্মার উদ্ভূতি হয়। ঈদৃশোদ্ভূতির কারণ দ্বিবিধ। আমাদের শরীরের মধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন আমাদের ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে অগণ্য আত্মা বিরাজ করিয়া থাকেন। আমাদের চর্ম্মচক্ষু কেবল স্থূল শরীরে ভিন্ন সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরে আত্মাকে লক্ষ্য করিতে পারে না। আমরা দেখিতে অথবা অনুভব করিতে

পারি বা না পারি, অনন্ত আকাশ মণ্ডলে লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম শরীরধারী আত্মা যে বিচরণ করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ঈদৃশ বিচরণশীল আত্মা নিজ কর্ম্ম বা প্রকৃতি অনুসারে যে পুরুষে নিজ সাজাত্য দর্শন করে, নিজ ভোগোপযোগী দেহ ধারণার্থ তাহাতেই প্রবিষ্ট হয় এবং পরে স্ত্রী-সংযোগ দ্বারা ভূমিষ্ঠ হইলে উহার উৎপত্তি হয়। পুরুষের আত্মা স্বতঃও স্ত্রী-সংযোগে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ উৎপত্তি প্রকরণের মধ্যে প্রথম প্রকার উৎপত্তি-ক্রম হৃদয়ঙ্গম হইলেই দ্বিতীয়টী সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই জন্য প্রথমটীর আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইব। পুমাত্মা ও স্ত্রী-আত্মার গুণ বা শক্তি সমূহ হইতে সমুদ্ভূত তেজোদ্বয়ের (পুরুষের বীর্য্য ও স্ত্রীর রজঃ) রাসায়নিক সংযোগে তৃতীয় পুরুষ-আত্মা বা স্ত্রী-আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্মার প্রধানতঃ চারিটী শক্তি বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়—যথা আকর্ষণ, অপকর্ষণ, সংযমন ও তনুপ (তনুপ এই শক্তির সহিত ইংরাজী Magenetic force নাম্নী শক্তির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে)। সংযমন, আকর্ষণ ও অপকর্ষণ, এই তিন শক্তি দার্শনিক ভাষায় সত্ব, রজঃ ও তমঃ বলিয়া কথিত হয়। আকর্ষণ ও অপকর্ষণ-শক্তি আবার ভাবিকা ও ব্যঞ্জিকা—প্রাণন ও অপানন শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মাকে যে মন, চিত্ত, অভিমান, মহত্তত্ত্ব আদি ঊনবিংশতি অথবা মতভেদে সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, সে সমস্ত আত্মার প্রথমোক্ত চারিটী শক্তির ক্রিয়া মাত্র। আত্মার (স্থূলভাবে বলিতে গেলে এমন কি যদি একটী বিভিন্ন শক্তি না বলা যায় তবে মনের) কার্য্য ক্রমে আমাদের শরীর গঠিত হয়। আত্মার শক্তির ক্রিয়া-ক্রম জানিতে হইলে স্থিরচিত্তে একটু গম্ভীর চিন্তা আবশ্যক। ক্রিয়ার একটী ক্ষুদ্রতম অংশের নাম "একটী সম্বেগ" বলিয়া কল্পনা করুন। একটী ক্রিয়ার যত সম্বেগ হইবে, ধারাবাহিক রূপে তত্তাবতের অনুমান করিতে

পারিলে উক্ত ক্রিয়ার দীর্ঘতা অনুমান হইবে। আমাদের প্রবৃত্তির প্রাবল্য এইরূপে ক্রিয়া-সূত্রের দৈর্ঘ্য দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে। এক্ষণে সন্তানোৎপাদনের হেতু পুমাত্মা ও স্ত্রী আত্মার শক্তি সমূহের কিরূপে রাসায়নিক সংযোগ হয়, তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইয়া আসিল। আমারি শরীরে যদি কেহ ধূলিনিক্ষেপ করে, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে ধূলি গুলি শরীরে সংলগ্ন থাকিল না, অল্পে অল্পে পতিত হইল, যে কতকগুলি তাহাতে সংলগ্ন রহিল বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাও ধীরে ধীরে দেহচ্যুত হইবে। ঈদৃশ সংযোগভাবকে রাসায়নিক সংযোগ বলা যায় না। দুইটী বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ পরস্পর বিরোধে যখন একটী অপরটীকে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলে যে সেটী অপরটীকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হয় এবং উভয়েরই নিজ নিজ পার্থক্য বা স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয় না, তখনই পদার্থদ্বয়ের রাসায়নিক সংযোগ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ দুটী বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর মধ্যে একটী অধিকতর বলবান্ না হইলে রাসায়নিক সংযোগ হওয়া অসম্ভব। বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত নয় বলিয়াই হউক অথবা বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও শরীর হইতে অল্লাধিক বলাক্রান্ত নয় বলিয়াই হউক, নিক্ষিপ্ত ধূলি রাশি আমার শরীরের রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হইল না। পুমাত্মার শক্তি রাশি প্রোক্ত রাসায়নিক ক্রম অনুসারে স্ত্রী-আত্মার শক্তি রাশির সহিত সম্মিলিত হইয়া তৃতীয় পুরুষ-আত্মা বা স্ত্রী-আত্মা উৎপাদন করিয়া থাকে।

পুমাত্মার সহিত স্ত্রী-আত্মার কি রূপে ক্রিয়াসংযোগ হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে চিন্তনীয়। তড়িৎ শক্তি যেমন যৌজক ও বিয়োজক (Positive and Negative) এই দুই অংশে বিভক্ত, আত্মস্থ তন্মূপ শক্তিও তাদৃশ। তন্মূপের শক্তিদ্বয় পরস্পর-বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। রতিক্রিয়া কালে পুরুষের আত্মস্থিত তন্মূপ শক্তির বিয়োজক অংশটুকু

স্ত্রী-আত্মস্থিত তনুপ শক্তির যোজক অংশের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। আকাশীয় তড়িৎ ও পার্থিব তড়িতের সংযোগ কালে যেমন উভয় তড়িৎ যথাসামর্থ্য বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্ট হয়, তদ্রূপ পুংতনুপ ও স্ত্রীতনুপও চরম সীমায় বর্দ্ধিত হইয়া ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে সম্মিলিত হয়। স্ত্রীর গর্ভে রেণুবৎ এক প্রকার পদার্থ আছে। পুরুষ হইতে নিঃসৃত তেজঃ সেই রেণুরাশির সহিত মিশ্রিত হয়। এই তেজঃ কেবল তনুপ নহে এবং উহা যে কেবল রেণুর সহিত মিশ্রিত হয় তাহাও নহে। বিবিধ পুংশক্তি সম্মিলিত তনুপই এই তেজঃ এবং উহা বিবিধ স্ত্রীশক্তি-সম্মিলিত তনুপের সহিত গিয়া মিশ্রিত হয়। এরূপ সম্মিলন যদিও এক প্রকার রাসায়নিক সংযোগ বটে, কিন্তু ইহা সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সাধারণ রাসায়নিক সংযোগ-কালে মূল পদার্থ কয়টির আদৌ স্বাতন্ত্র্য থাকে না। কিন্তু স্ত্রী ও পুমাত্মার শক্তি সম্বন্ধীয় রাসায়নিক সংযোগ কালে বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ হইলেও মূল পদার্থ গুলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয় না। আকর্ষণ ও অপকর্ষণ, অথবা ভাবিকা ও ব্যঞ্জিকার সহযোগে স্ত্রী-তনুপ ও পুং-তনুপের সংযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, উহা একটি পৃথক্ পদার্থ বটে কিন্তু তাহাতে ভাবিকা ও ব্যঞ্জিকা স্ত্রী-তনুপ ও পুং-তনুপের স্বাতন্ত্র্য থাকিয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রাসায়নিক সংযোগে যে দুইটি পদার্থের সংঘাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি অপরটিকে পরাজিত বা অভিভূত করিবেই করিবে। তাহা না করিতে পারিলে উহা রাসায়নিক সংযোগ বলিয়া উক্ত হয় না। মনুষ্যের সন্তান উৎপন্ন হইলে কোন সন্তানে পুরুষের বীর্য্য ও কোন সন্তানে স্ত্রীর রজঃ অধিক বলবান্ বলিয়া দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ পুত্র সন্তান উৎপাদনে পুরুষের তেজঃ এবং কন্যা সন্তান উৎপাদনে স্ত্রীর রজঃ অধিক বলবান্ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ ও স্ত্রী যদি উভয়েই সত্ত্বগুণাক্রান্ত হয়েন ও উভয়েই যদি একজাতি

হয়েন, তবে তাঁহাদের পরস্পর-সহযোগে উৎপন্ন পুত্র সামান্যতঃ পিতার ও কন্যা মাতার সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় এবং পুত্র কন্যা উভয়েই সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ একজাতীয় হইলে সন্তান গুণবান্ হইবে বটে, কিন্তু দম্পতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলে তদ্রূপ হইবার আশা নাই। এই জন্য পিতার উপরিস্থ সপ্ত পুরুষ সম্পর্কীয় কন্যাকে এবং মাতার উপরিস্থ পঞ্চ পুরুষ সম্পর্কীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই। পিতার উপরিস্থ অষ্টম পুরুষ এবং মাতার উপরিস্থ ষষ্ঠ পুরুষ সম্পর্কীয়া কন্যাতে যে সম্বন্ধ আছে তাহা অতি সামান্য এবং সে সম্বন্ধ সত্ত্বে বিবাহ করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রকারেরা এই রূপ স্থলে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রকৃতি যদি সমান ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর আসক্তিতে সুন্দর রূপ রাসায়নিক সংযোগ হয় না। এই জন্য সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। পরস্পরের প্রকৃতি যদি একটু ভিন্ন হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ জাত পুত্র যথাবৎ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইবে। এইরূপ স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রকৃতির ভেদ থাকা প্রযুক্ত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী শক্তি পরস্পরের প্রকৃতি হইতে বল সঞ্চয় করিবে এবং পরিপুষ্ট তৃতীয় প্রকৃতি (সন্তান) সমুৎপন্ন হইবে!

প্রথমতঃ সবর্ণ-বিবাহের বহুল প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত স্ত্রী পুরুষ সমাগমে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহা সমধর্ম্মাক্রান্ত দম্পতির সন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, এরূপ কথিত হওয়ায় সহসা এই সংশয় উঠিতে পারে যে এতদনুসারে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীতে বিবাহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াতে বিবাহ অর্থাৎ অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ পরম প্রশংসনীয়। বুদ্ধিমান্ গণ নিরর্থক সংশয়ারূঢ় হইয়া বিচলিত হইবেন না। কেননা ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণাধিক্য ও ক্ষত্রিয়ের রজোগুণাতিশয্য— ইহা চিরপ্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী-গর্ভে সন্তান উৎপন্ন

হইলে সন্তান বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইবে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে সন্তান উৎপন্ন হইলে সন্তান রজোগুণ-মিশ্রিত সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইবে। এই জন্য সবর্ণ বিবাহ অনুলোম অসবর্ণ বিবাহাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ। ইত্যবসরে এরূপ সংশয় হওয়াও আশ্চর্য্য নহে যে ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে ক্ষত্রিয়ার রজোগুণকে নিজ বলে অভিভূত করিয়া সন্তানকে সত্ত্বগুণাক্রান্ত করিতে পারিবে না কেন? বিচারবান্ পুরুষ এই ব্যর্থ বিতর্কজাল ভেদ করিতেও সঙ্কুচিত নহেন। গুণ সকল মনুষ্যের প্রকৃতিনিহিত। যত দিন পর্য্যন্ত ক্রিয়া, আচার, ব্যবহার, ব্রত বিশেষাদির দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হয়, তত দিন সত্ত্ব, রজঃ, বা তমোগুণ পরস্পর নিতান্ত নিকটে থাকিলেও পরস্পরকে অভিভূত করিতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মণের বীর্য্যস্থ সত্ত্বগুণ রজোগুণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ার শোণিত-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ। একটী গুণের দ্বারা আর একটি গুণ বিনষ্ট হয় না, কিন্তু একটী গুণজনিত ক্রিয়াচরণ দ্বারা অপর একটী গুণ ক্ষীণ ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একটী গুণের আশ্রয় পদার্থ যদি অপর গুণের আশ্রয়-ভূমিকে বিঘাতন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান সবর্ণ বিবাহজাত সন্তান অপেক্ষা নিন্দনীয় হইত না। অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে বিবাহ করিতেন। শূদ্রকন্যাকে কামতঃ বিবাহ করিলে দ্বিজগণ পতিত হইতেন। দ্বিজগণের মধ্যে সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা উৎপন্ন ছয় প্রকার সন্তান (ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মূর্দ্ধাভি-ষিক্ত, বৈশ্য, পারশব) যথাযথ মর্য্যাদাক্রমে দ্বিজ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিন্দিত নহে কিন্তু সবর্ণ-বিবাহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিতে হইবে। এই জন্য বর্ত্তমান যুগে দ্বিজাতিগণের তেজোহানির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছে। বিলোম অসবর্ণ

বিবাহ (অর্থাৎ যে অসবর্ণ বিবাহে পুরুষ নিম্ন শ্রেণীস্থ এবং স্ত্রী উচ্চ শ্রেণীস্থ) শাস্ত্রে নিতান্তই নিষিদ্ধ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, বিলোম অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তান চণ্ডালাদি হইয়া থাকে। অত্যন্ত কুপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করাই চণ্ডাল শব্দের উদ্দেশ্য। নিম্ন শ্রেণীর প্রবল পুং-শক্তি উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া অতি কদর্য্য সন্তান উৎপাদন করে। যে কারণ বশতঃ অনুলোম বিবাহে সবর্ণ বিবাহ হইতে উৎপন্ন সন্তান অপেক্ষা নিকৃষ্ট সন্তানের উৎপত্তি হয়, বিলোম বিবাহেও তাদৃশ কারণ বশতঃ অতি নীচপ্রকৃতি চণ্ডালের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুং-প্রকৃতি স্ত্রী প্রকৃতির উপর প্রবল আধিপত্য করিয়া থাকে ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অগত্যা বিলোম বিবাহে নীচ প্রকৃতিরই প্রাধান্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই কারণ বশতঃ বিলোম অসবর্ণ বিবাহ হইতে উৎপন্ন সন্তানও নীচ প্রকৃতির হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যে সবর্ণ-বিবাহই ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির মূল ভিত্তি। অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ যথোচিত প্রশংসনীয় নহে। বিলোম অসবর্ণ-বিবাহ নিতান্ত নীচ, নিন্দিত ও ঘৃণিত আবর্জ্জনা রাশি সমাজে আনয়ন করিয়া সমাজকে নিতান্ত কলুষিত করিয়া দেয়।

শিক্ষিত ভারতবাসিগণ! চিন্তাশীল দেশহিতৈষিগণ! বিচারশীল কুশলাকাঙ্ক্ষিগণ! একবার বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত আর্য্য-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববীজ-ভূমিতে কিঞ্চিৎ প্রণিধান করুন। তপঃ-সাধন-শীল নির্ম্মলচেতা ব্রাহ্মণগণ স্বার্থসিদ্ধির কুৎসিত অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া জাতিভেদের প্রথা প্রচলন করেন নাই, অনর্থক অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করেন নাই। যাহাতে সমাজের পরম মঙ্গল হয়, যাহাতে সমাজ কুৎসিত ও কুচরিত্র লোকে পরিপূর্ণ না হয়, সেই জন্যই তাঁহারা সবর্ণ-বিবাহের প্রশংসা ও অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাধর্ম্ম-গুণে, আচার ব্যবহার-গুণে, জ্ঞানী ও মুক্তিকাম ছিলেন।

শাস্ত্রের কোন বিধি প্রণয়ন কালেই তাঁহাদিগের বুদ্ধি কদর্য্য অভিপ্রায়ের দ্বারা প্রণোদিত হইত না। যাঁহারা আপনার সুখ, সংসারের ভোগ-সুখ তুচ্ছ করিতেন, যাঁহারা বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে জলাঞ্জলি দিতেন, তাঁহারা কি নিজ নিজ পুত্র পৌত্রাদির সুখের জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাকালে পক্ষপাতিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন? ইহা স্বপ্নেও স্মরণ করিলে পাপ হয়। আজ কাল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের মধ্যে ভূরি ভূরি অসচ্চরিত্র ও নিন্দিত প্রকৃতির লোক দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য মনু আদি শাস্ত্রকর্ত্তা মহাত্মাদিগের মতকে ভ্রান্তিপূর্ণ ও অসঙ্গত বলিও না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ যে পবিত্র রীতিতে জীবন যাপন করিতেন, এক্ষণে আর তাহা দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল, আচারের প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল, গুরুবাক্যের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রতি যেরূপ আস্থা ও আগ্রহ ছিল, আজ কাল আর সেরূপ কিছুই নাই। সুতরাং বর্ত্তমান উচ্চ বর্ণ গণের ঈদৃশ হীন চরিত্র হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যে বর্ণের যেরূপ আচার ব্যবহার, তদনুরূপ অনুষ্ঠিত না হইলে সে বর্ণ নিশ্চয়ই অপকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। তজ্জন্য সদ্বিধিবক্তা শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ ভ্রান্ত বা স্বার্থপর বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারেন না। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে এবং নিজ নিজ কার্য্যফলে আর্য্য-জাতি-সুলভ ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, বিষয়-বিশেষের সম্যক চিন্তা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি, সেই জন্য অপরিণাম-দর্শীর ন্যায় আশু-সুখকর যাহা কিছু দেখি, তাহারই পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারি না। এক্ষণে আমরা বিবাহের আদান প্রদান কালে কন্যা ও বরের কুল, শীল, আচার, বিনয়াদির প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। কন্যার রূপ ও বরের অর্থবল দেখিয়াই সন্তুষ্ট হই। লক্ষণ দ্বারা তাহাদের শরীরগত, মনোগত, এবং প্রকৃতিনিহিত শক্তির বৈষম্য আছে কিনা তাহা বিচার করিতে পারি না। এই অবিবেকতাই অনেক বিবাহের বিষময় ফল উৎপাদন করে। অনেক

স্থলে আমরা মূঢ়ের ন্যায় নীচপ্রকৃতির আদর ও উচ্চপ্রকৃতির অনাদর করিয়া প্রলয়-পাপ-ভোগী হইয়া থাকি। এই মহাপাপের ফলেই আমাদের পবিত্র আর্য্যসমাজ এক্ষণে বিষম বিশৃঙ্খল। এই বিশৃঙ্খলতা বিদূরিত না হইলে, উহা পরিহার করিবার উপায় সকল শিক্ষা করিতে না পারিলে, আমাদের সমাজের কল্যাণ নাই। যাহাতে পবিত্র প্রকৃতির সমাদর ভারতে বৃদ্ধি হয়, তাহারই যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। অসবর্ণ বিবাহ পবিত্র প্রকৃতি রূপ কল্পতরুর বিষম কাল কীট স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ আর্য্যসমাজের পবিত্র প্রকৃতি রক্ষা করুন।

——o——

ধর্ম্মকর্ম্মে বিষম বিভ্রাট।

স্বেচ্ছাচার যাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদিগের ধর্ম্মহানি হইবার আশঙ্কাও অতি অল্প। যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে বিষয়াসক্ত চিত্তের স্বাধীন চিন্তার ফল ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম-নিষ্ঠ পুরুষ ব্যতীত কেহই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে বা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন না। বহু গবেষণা, সুগভীর চিন্তা ও ভগবদারাধনার সাহায্যে আর্য্য ঋষিগণ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধ মহাত্মাগণের নিরূপিত নিয়ম নিষেধ রাশির মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলে আর্য্যজাতির ধর্ম্ম সাধন হয় না। তত্ত্ববেত্তাদিগের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা ধর্ম্মার্থীদিগের পক্ষে মহাপাপ। আর্য্য জাতির অস্থি মজ্জাতে এই সুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

ভঃ গীতা ১৬শ অঃ।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারধর্ম্মের সাধন করে, সে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ইহলোকে সুখ বা পরলোকে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয় না। অতএব শাস্ত্র প্রমাণানুরূপ কার্য্যাকার্য্য বিদিত হইয়া শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। শাস্ত্রবিহিত বিধানে সুচারুরূপে কর্ম্ম রাশি অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্য প্রকৃত

উপাসনার অধিকারী হয়। উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও আত্মানাত্ম-বিচার বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানই মুক্তিফল-প্রদাতা ও পরমানন্দের বিধাতা। যেমন ত্রিতল গৃহের নিম্নতম প্রথমতল ভগ্ন হইয়া গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত তিন কাণ্ডের প্রথম কাণ্ডটী (কর্ম্ম) বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে শত চেষ্টা ও যত্ন করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাণ্ডের সাধনাধিকার কাহারও জন্মিতে পারে না। আমরা যে কাণ্ডেরই অনুষ্ঠান করি না কেন শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া তত্তৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ নহি। উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ড সবলাধিকারীর জন্য, তাহা লইয়া অদ্য আলোচনা করিব না। দুর্ব্বলাধিকারীর নিতান্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকাণ্ডের কথাই এ প্রস্তাবের আলোচ্য। কর্ম্মকাণ্ডের প্রকারভেদ, প্রকরণ, ক্রম প্রভৃতি লইয়া আন্দোলন করা আজ আমাদের মন্তব্য নহে। এই কর্ম্মানুষ্ঠানের পথে আপাততঃ যে বিঘ্ন ও উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়াই আমরা প্রস্তাবনা শেষ করিব।

স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানের বিচারক ও ব্যবস্থাপক। মন্বাদি-বিরচিত স্মৃতি সমূহ বেদ-মূলক এই জন্য স্মৃতি-বিহিত ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান বেদ-বিহিত ও ঈশ্বর-প্রণোদিত বলিয়া আর্য্যধর্ম্মীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আর্য্যশাস্ত্রকারগণ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, এবং লৌকিক ও অলৌকিক যুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন হইলেও স্মৃতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাঁহারা কোন কথাই যুক্তি বা দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ঈশ্বরনিষ্ঠ শিষ্য ও লোক সমাজের সরল শ্রদ্ধা ও সাধুভাবের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া লোকহিতার্থ অনুষ্ঠান রাশির নিয়ম ও নিষেধ, প্রকরণ, ক্রম ও ফলাফলাদি বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সরল সাধকগণ যুক্তির বিদ্যুন্ময়ী প্রতিভা অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের আজ্ঞা অধিক প্রতিভা ও প্রভাযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এই জন্য লোক-

কল্যাণকারী আচার্য্যগণ যুক্তির ক্ষুদ্র সাহায্য লইয়া লোকসমাজের নিকট আপনাদিগেরও স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থের গৌরবহানি করেন নাই। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আজ্ঞা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণ ঈশ্বরাজ্ঞার ন্যায় চিরকাল প্রতিপালন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এতদিন মনের অনুরাগে ধর্ম্ম কর্ম্ম যে ভাবে ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, কালের প্রভাবে—আমাদের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে শাস্ত্রে কিছু কিছু লোকের অনাস্থা জন্মিবার হেতু লক্ষিত হইতেছে। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষ নহে, জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ্বর্গের।

যেমন চিকিৎসকের সঙ্গে ঔষধ বিক্রেতার সম্বন্ধ, সেইরূপ ধর্ম্ম শাস্ত্রের সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ। চিকিৎসক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেন; কিন্তু সেই ঔষধ গুলি আনিতে হয় ঔষধবিক্রেতার নিকট হইতে। ঔষধ বিক্রেতা যদি ব্যবস্থালিখিত ঔষধের পরিবর্ত্তে, জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক, অপর একটী ঔষধ দেয়, তবে চিকিৎসকের ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট হইলেও রোগীর রোগ-নিবারণের আশা নাই; হয়তো অযথা ঔষধ-সেবনে রোগ বাড়িতেও পারে। বর্ত্তমান আর্য্যসমাজ যাহা কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত। ধর্ম্মশাস্ত্র যে তিথিতে, যে লগ্নে, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সাধু গৃহস্থ তদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু তিথি ও লগ্নের তত্ত্ব জানিবেন কোথা হইতে? স্মৃতিশাস্ত্রে তাহা জানিবার কোন সুবিধা নাই। তাহা জানিতে হইবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিকট। কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে স্মৃতির কাছে ব্যবস্থা লইয়া আবার জ্যোতিষের সাহায্য লইতে গমন করিতে হইল! জ্যোতির্ব্বিৎ যদি গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি যথাযথ গণনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবেইত কর্ম্মানুষ্ঠাতার মঙ্গল, নতুবা অতিথিতে অলগ্নে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। জ্যোতিষ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদান্ত শাস্ত্রীয় অন্ধ ও পঙ্গুর ন্যায় সম্বন্ধ। অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু আরোহণ করিলে অন্ধের গতিশক্তি ও পঙ্গুর

দৃষ্টিশক্তি এতদুভয়ের সাহায্যে উভয়েই যেমন লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে পারে, সেইরূপ জ্যোতির্ষ ও স্মৃতি উভয়ের সমবেত সাহায্যে ধর্ম্মফল লাভ হইয়া থাকে। স্মৃতির সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু পঙ্গুর ন্যায় চলিতে পারেন না। জ্যোতিষের গতিশক্তি আছে, কিন্তু অন্ধের ন্যায় দেখিতে পান না। জ্যোতিষের স্কন্ধে স্মৃতি আরূঢ় হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ ক্রিয়াটী সুসম্পন্ন ও অনুষ্ঠাতার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইয়া থাকে। জ্যোতিষ বা স্মৃতি যাহারই হউক, কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই কর্ম্মানুষ্ঠানের শুভ ফলের আশা করা যায় না।

বার, তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগের পঞ্জিকাই একমাত্র সম্বল ও সহায়। আজ এই পঞ্জিকার গণনা বিভ্রাটে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ নিতান্ত চিন্তিত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিলেন,—

"একাদশ্যান্ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি"।

এক্ষণে পঞ্জিকাকার গ্রহ নক্ষত্র গণনার দোষে যদি দশমীতে বা দ্বাদশীতে একাদশী লিখিয়া থাকেন এবং তদনুসারে তুমি একাদশীর উপবাস কর, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তুমি প্রত্যবায়ভাগী হইবে। পঞ্জিকার স্কন্ধে দোষ দিলে তোমার পাপক্ষয় হইবে না, কেননা স্মৃতিতে লিখিত আছে—

"ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাৎ
একাদশ্যাং স পাপকৃৎ।"

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ (না বুঝিয়া, না জানিয়া, ভুলিয়া বা অন্য কোন ভ্রম বশতঃ) একাদশীতে ভোজন করে, সে পাপভাগী হয়। তিথি লইয়া অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকায় মতভেদ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতের গণনার গণ্ডগোলে অনেক নিরীহ বিধবাকে দুই দিন উপবাস করিয়া ক্লেশ

পাইতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,যে অলগ্নে অ-তিথিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠাতার তাহাতে কোনও পাপ নাই, সে পাপ পঞ্জিকা-সংকলন কর্ত্তা পণ্ডিতের। এ বড় আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত! ইহাতে আমাদিগের মন যথোচিত প্রবোধ পাইল না। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"পিতরঃ পর্ব্বকালেষু তিথিকালেষু দেবতাঃ।"

পর্ব্বকালে * পিতৃগণ ও নির্দ্ধারিত তিথি বিশেষে দেবতাগণ পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"অমাবস্যা-দিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ।
বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণান্নৃণাম্।"

বায়ু পুরাণ।

অমাবস্যা দিনে পিতৃগণ পুত্র, পৌত্রাদির নিকট শ্রাদ্ধের প্রত্যাশা করিয়া বায়বীয় দেহ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। পিতৃগণ দেবতা, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি তাঁহাদের অগোচর নহে। তাঁহারা "যথার্থ অমাবস্যার" দিন শ্রাদ্ধপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন—অবিহিত দিনে তাঁহাদের আগমন আশা করা যায় না। এদিকে ধর্ম্মশাস্ত্রও অমাবস্যার দিনে শ্রাদ্ধের বিধি দিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্ট দোষে—পঞ্জিকার ব্যবস্থা দোষে হয়ত আমরা চতুর্দ্দশী বা প্রতিপদে অমাবস্যা জানিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলাম। সেদিন কিন্তু গ্রহনক্ষত্রাদির বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি প্রভাবে পিতৃগণের আমাদিগের সমীপবর্ত্তী হওয়া অসম্ভব হইল। শ্রাদ্ধজন্য পিতৃগণ প্রকৃতভঃ তৃপ্তিলাভের অবকাশ পাইলেন না, কিন্তু আমরা জানিলাম শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিলাম। বস্তুতঃ কর্ম্ম পণ্ড হইল। যেজন্য এত উদ্যোগ, এত ব্যয়,

* চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা,পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, এই পাঁচটী পর্ব্বদিন।

এত ক্লেশ করিলাম্ তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইল। পণ্ডিত মহাশয় হয়তো বলিবেন, শ্রাদ্ধকারিন্! ইহাতে তোমার পাপ নাই, পঞ্জিকাকার পণ্ডিত ইহার পাপভাগী। এ সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র ফল নাই। কেননা, শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকারীর পুণ্য হয়, পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, শ্রাদ্ধ নিয়মিত কালে না করিলে অথবা অনিয়মিত সময়ে করিলে শ্রাদ্ধকারীর পাপ হয় ও পিতৃগণ অতৃপ্ত থাকেন। এক্ষণে দেখিলাম, পঞ্জিকার দোষে নিয়মিত সময়ে শ্রাদ্ধ না করায় শ্রাদ্ধকারীর যে পাপ হইবে, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে সে পাপ কাটিয়া যায়, যাউক—পঞ্জিকাকার নরকে পড়েন, পড়ুন। কিন্তু নিয়মিত সময়ে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকারীর যে পুণ্য হইত, তাহা হইল কৈ! পিতৃগণ যে তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাহা হইল কৈ? তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকারীর প্রতি শুভ দৃষ্টি করিলে তাহার যে কল্যাণ হইত, তাহা হইল কৈ? তাঁহাদের অতৃপ্তি বশতঃ শ্রাদ্ধকারীর প্রতি তাঁহাদের অশুভ বা কোপ দৃষ্টি জন্য যে অনর্থপাত হইবে, সে অনর্থ নিবারণের উপায় কি? দেখা যাইতেছে পঞ্জিকার দোষে শ্রাদ্ধকারী বহু সম্পদে বঞ্চিত হইলেন, এবং তাঁহার অর্থব্যয়, উদ্যোগ ও উপবাসাদি ক্লেশ তিনি যেজন্য করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইল। মনে কর, হরিদাসের ওলাউঠা হইয়াছে, তাহার ভৃত্য রামলাল অন্ধকার রাত্রিতে বাজারে ঔষধ লইতে আসিয়াছে, ফিরিয়া যাইবার সময় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভুর পীড়া শক্ত, ঔষধ লইয়া যাইতেছি, শীঘ্র যাওয়া যায় এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিতে পার? পথে গর্ত্ত আছে, তুমি ইহা জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক, আরও অন্ধকারময় একটী বাগানের ভিতর দিয়া যাইবার পথ দেখাইয়া দিলে। ভৃত্য যাইতে যাইতে এক বিষম গর্ত্তে পড়িয়া গেল। এই আকস্মিক পতনে বিষমাঘাতে তাহার এক খানি পা ভাঙ্গিয়া গেল। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার

ভাবে—ঔষধাভাবে প্রভুও লীলা সম্বরণ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় হয়তো বলিবেন, ভৃত্যের ইহাতে পাপ নাই, এ পাপ তোমার, কেননা তুমিই এ কুপথ দেখাইয়া দিয়াছ। পাপ তো নাই বুঝিলাম, গর্ত্তে পড়িয়া তাহার যে পাখানি ভাঙ্গিয়া গেল ও সে বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, প্রভুর যে অকাল মৃত্যু হইল, এতাবতের ক্ষতি পূরণ করিবে কে? তাই বলিতেছি, লোকে কেবল পাপের ভয়েই ধর্ম্ম করে না; ধর্ম্মের দ্বারা পুণ্য ও সুকৃতি লাভ হয়। তবে পাপের ভয় এড়াইলেই যে ধর্ম্মের ফল লাভ হইল তাহা কে বলিল? বস্তুতঃ অকালে বা অলগ্নে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, এবং যে পিতৃগণ বা দেবতার উদ্দেশে কার্য্যের অনুষ্ঠান, তাঁহাদেরও প্রসন্নতা সাধিত হয় না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অপূর্ণ শিক্ষার দোষে আমাদিগের দেশে আমাদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বিকট ক্রন্দনে, নাস্তিকগণের আস্ফালনে, মহম্মদীয় নির্যাতনে, খ্রীষ্টীয়দলের কুন্দনে, বিলাতপ্রত্যাগতগণের সংঘর্ষণে আর্য্য গৃহস্থগণের আশ্রম-ধর্ম্মের যে ক্ষতি করিতে পারে নাই, আজ বুঝি আমাদের ঘরের পণ্ডিত মহাত্মারাই সে টুকু করিয়া বসেন। জ্যোতিষিগণ সে কালের বাঁধা নিয়ম ধরিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি গণনা করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু এই গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি যে সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হয় এবং এই জন্য মধ্যে মধ্যে জ্যোতির্গণনার ক্রমও যে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি থাকিলে এই ঘোর দুর্ব্বিপত্তি ঘটে না! গ্রহ নক্ষত্রগণের গতি অনুসারে তাহাদের স্থানও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পঞ্জিকার গণনা-পদ্ধতি শুদ্ধ হইলেও গ্রহগণের স্থানবিপর্য্যয়-সংঘটন হেতু যুগভেদে ফলভেদ দৃষ্ট হয়। আর্য্য মহাত্মাগণ যে সময়ে নক্ষত্রাদির স্থিতি-স্থান স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে বহু দিনের কথা; এখন নক্ষত্রাদির অনেক স্থান-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পুনর্ব্বার যন্ত্রাদির সাহায্যে নভোবক্ষ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক

তাহাদের স্থান স্থির করিয়া গণনা না করিলে বহুল ভ্রম হইবে। সময়ে সময়ে এইরূপ ভ্রম সংশোধন না করিলে যে চলে না, এবং কয়েকবার এরূপ ভ্রম সংশোধনও যে হইয়াছে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। একবার জ্যোতিষ শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কার না হইলে আমাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম যে যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার আশা অতি অল্প। আবার এই সংশোধনেই যে চিরদিন চলিবে, তাহা নহে—এইরূপ সময়ে সময়ে চিরদিনই করিতে হইবে। এই জন্য পণ্ডিত ধর্ম্মাত্মা ও ধনাঢ্যগণ এ বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগ করেন, ইহাই আমাদিগের অনুরোধ, নতুবা ধর্ম্মরক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না।

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতো বধীৎ॥"

ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন; ধর্ম্মকে যিনি নাশ করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে নাশ করেন। অতএব ধর্ম্ম যেন বিনষ্ট না হন, তাহা হইলে আমাদিগকেও বিনষ্ট হইতে হইবে না।

—o—

এক্ষণে উপায় কি!

আর্য্য ঋষি-তপস্বি-শোভিত বীর-প্রসূতি ভারত-ভূমি অকূল কাল-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কলিকলুষ-গভীরনীরে ডুবিয়া গেল; যোগী, যতি, সিদ্ধ, সমাহিতগণ দৃষ্টির অগোচর হইলেন; দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী সমর-চতুর রণধীর বীরবর্গ অস্ত্র শস্ত্র সহ অদৃশ্য হইলেন, আসমুদ্রকরগ্রাহী ভারত-ভূপতিগণ নিস্তেজ, সাহসহীন ও হতচেতন হইয়া একে একে ভূতকালের নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত হইলেন; ভারত শবরাশিপূর্ণ শ্মশানের ন্যায়, উৎসবান্তে পুরীর ন্যায়, দাবদাহ-দগ্ধ বনের ন্যায় শূন্য ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; কোমল-হৃদয় সাধুগণ ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন এক্ষণে উপায় কি? বেদবিধি বিলুপ্ত প্রায় হইল, সাধু সংস্কৃত-বিদ্যার অনুশীলন হতাদর হইয়া পড়িল, ব্রহ্মচর্য্য কেবল নামমাত্র রহিয়া গেল, সদাচার শঠগণ দ্বারা কপটাচারে পরিণত হইতে চলিল, মানবগণ ব্রহ্ম-বিচারণাকে হৃদয়ের কোমল কমলাসন হইতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বাগ্‌দ্বারের রসনা-সনে নৃত্য করাইতে লাগিল, ঘোর পাষণ্ডাচারে ভারত পরিপূর্ণ হইয়া কাতর স্বরে বলিল, অহো! এক্ষণে উপায় কি! যজ্ঞধূম উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে সংশোধিত ও আকাশমণ্ডলকে আর মেঘাচ্ছন্ন করে না, যে রব বনের পশু পর্য্যন্ত একমনে শ্রবণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিত সে সামগান-ধ্বনি আর শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করে না, ভারতের বিজয়-ভেরীর গম্ভীর নিনাদে আর দিগ্দিগন্ত পরিপূর্ণ হয় না, লক্ষ্মী ভারত-প্রকৃতির কোমল ক্রোড়ে বসিয়া আর ক্রীড়া করিতে চাহেন না, ভারতের গৌরব-চিহ্নচয় দিন দিন অদৃশ্য হইতে লাগিল, ভারতবাসিগণ ক্রমে সহায়-সম্পত্তিহীন হইয়া পড়িল, এক্ষণে উপায় কি? কলিকলুষপ্রভাবে লোক সকল অস্মৎোচিত লুব্ধ, দুরাচার, নির্দ্দয়, বৃথাবিবাদ-প্রিয়, দুর্ভাগ্য,

ভূরিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছে; সদাচার, সদনুষ্ঠান, সৎকার্য্য বা সৎকথার প্রসঙ্গে লোকের অভিরুচি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে; অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, মাৎসর্য্যের অধিকার লোক-সমাজে বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে; মমতা, মিথ্যাভাষণ, আলস্য, ঔদাস্য, নিদ্রা, দ্বেষ, বিষাদ, শোক, রোগ, দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ আদিতে ভারত-ভূমি জর্জ্জরিত হইতে লাগিল; এক্ষণে উপায় কি! লোক-সমাজ ক্ষুদ্রদৃষ্টি, সংকীর্ণমনা, বহুভোজী, বহুপুত্র, বহুকাম এবং নারীগণ স্বেচ্ছাচারিণী ও অপ্রিয়বাদিনী হইয়া উঠিল; জনপদসকল দুরাত্মাগণে আকীর্ণ, বেদ সকল পাষণ্ডদূষিত, ভূপতি প্রজাভক্ষক, ব্রাহ্মণগণ শিশ্নোদর-পরায়ণ ও কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ, ব্রহ্মচারিবর্গ বিহিতাচার-বর্জ্জিত ও অশৌচাচারী হইতে চলিল; সত্যানুসন্ধান প্রায় কাহারও নাই, জ্ঞানোপার্জ্জনে বিরাগ, তপস্যাচার কেবল শব্দমাত্র ও দান খ্যাতি-বৃদ্ধির জন্য হইয়া "আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমি" এই নির্ম্মল নামে দোষ স্পর্শ করিল, এক্ষণে উপায় কি! তপস্বিগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেছে; সন্ন্যাসিগণ অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেছে, লোক সকল অদীর্ঘকায়, অসৎ-পুত্রবান্, নির্লজ্জ, কটুভাষী ও দুঃসাহস হইয়া উঠিতেছে, ধূর্ত্ততা কপটতা লোকহৃদয়ের ভূষণ হইতেছে; স্বার্থপরতাশূন্য পরোপকার-কামনা মানবের মন হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল; ন্যায়, ধর্ম্ম, কম্পিতকলেবরে নিভৃত পর্ব্বতগুহায় পলায়ন করিতেছে; ভারত-ভূমি বিভীষিকাময়ী পুরী হইয়া উঠিল, এক্ষণে উপায় কি! আয়ু, বল, স্মৃতি, শৌচ, সত্য দিন দিন ক্ষীণভাবাপন্ন এবং সৌভাগ্য, সুখ ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি তিরোহিত হইতেছে; যাহার ধন অধিক আছে, সেই ব্যক্তিই আচারবান্, গুণবান্, জ্ঞানবান্ ও প্রশস্তকুলে সমুদ্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইতে অবসর পাইল, পূজ্যগণের মর্য্যাদার লাঘব ও গুরুলঘু জ্ঞান সুদূরপরাহত হইতে লাগিল, অভিরুচি হইলেই লোকে পতি-পত্নীভাব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাদের কুল বা গোত্রাদি বিচারিত

হইতেছে না ; ভারতবর্ষ প্রায় ধর্ম্ম-শাসন-শূন্য হইয়া উঠিল, এক্ষণে উপায় কি ! একমাত্র সূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ, ধনহীন হইলেই অসাধু, বহুভাষী হইলেই পণ্ডিত, শ্মশ্রু রাখিলেই লাবণ্যযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে চলিল ; দূরে স্থিত হইলেই জলাশয় মাত্রই তীর্থ বলিয়া পরিসেবিত হইতেছে ; আত্মবিচ্ছেদ, অন্তর্ব্বিবাদ ও গৃহকলহে ভারত উচ্ছিন্ন প্রায় হইল ; চারি বর্ণই শূদ্রধর্ম্মী, ধেনু সকল অল্পদুগ্ধ, আশ্রম সকল গৃহপ্রায়, ঔষধি সকল অল্পগুণ ও লোক সকল পিতা মাতা আদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র স্ত্রীকেই পরিবার বলিয়া পালন করিতে লাগিল, অতএব এক্ষণে উপায় কি ! শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক জনগণ নিজরুচির প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে, সাধুবিগর্হিত পথ সাধারণের জন্য প্রসারিত ও বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণ অপেক্ষা অর্থের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে ; নির্ধন অথচ গুণবান্ প্রভুকে ভৃত্য ও পরম গুণবান্ বিপদ্গ্রস্ত বা স্থবির ভৃত্যকে প্রভু ত্যাগ করিতেছে ; শিক্ষিতাভিমানী লোকসকল পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সুহৃদ, জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিতেছে, স্ত্রীপরায়ণ হইয়া মাতৃ-ভক্তি, পিতৃভক্তি দূরে ত্যাগ করিয়া ননন্দা ও শ্যালকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতেছে ; দরিদ্রতা, দুঃখ, শোক, অসুখ ও ক্লেশের বলবত্তরঙ্গে ভারত অধঃপতন-সাগরে ডুবিতে লাগিল, এক্ষণে উপায় কি ! ব্রাহ্মণগণ বেদ-বর্জ্জিত ও শূদ্রগণ ধর্ম্মোপদেষ্টা হইল ; কপটমতিগণ আচার্য্যের আসন অধিকার করিল ; অপণ্ডিত পণ্ডিত, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক ও যে কিছুই জানে না, সেও জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইল ; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অল্প বৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাতে ভারত শস্যহীন হইল ; উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষদাহে প্রজাগণ প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল ; অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় মনুষ্যে মনুষ্য, মৃত পশুপক্ষী আদি ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইল ; স্বামী স্ত্রীকে ও পুত্র পিতাকে পালন করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিল ; শক্তি ও উপায় সত্ত্বেও কেহ প্রায় আপনাকে ভিন্ন অপরকে রক্ষা ও পালন করিতে চাহে

না; রোগে, অনাহারে ও শোকে লোক সকল নিতান্ত শ্রীহীন ও শোভা-হীন হইয়া পড়িল, আহা! এক্ষণে উপায় কি! মানবগণ হরি-আরাধনায় বিমুখ হইয়া উঠিল; সংসার-ক্লেশে বারম্বার পরিপীড়িত হইয়াও পর-লোকের বিষয় স্মরণ করে না; বারুণি ও বারবনিতাবিলাস ভারতের মর্ম্মচ্ছেদ করিতে উদ্যত, জনগণ ধর্ম্মকথা শুনিয়া উপহাস করিতে থাকে, যে ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ, আর্য্য ঋষিগণের চিরসমাদরের ধন ও যে ধর্ম্ম জীবের সংসারপাশ ছেদের অমোঘ অস্ত্র, সেই ধর্ম্মজ্ঞান মানবের মন হইতে অপসারিত হইতে লাগিল, আহা! ভারতের পবিত্র নাম বুঝি কলু-ষিত হইল! ভারতের এই দুর্দ্দিন-মোচনের এক্ষণে উপায় কি!

ভারত-ভূপতিগণ! আপনারা চিরদিন ভারতকে রক্ষা করিয়া আসিয়া-ছেন, এক্ষণে আর ইহার দুর্ব্বিপত্তি জন্য কাতরস্বরে কর্ণপাত করেন না কেন! আপনারা কি এত কঠিন ও নির্ম্মম হইয়াছেন যে ভারতের আর্ত্তনাদে আপনাদিগের হৃদয় বিগলিত হইতেছে না! একবার আপনাদিগের দুঃখিনী ভারতজননীর দিকে সদয় দৃষ্টি করুন; ভারতভূমি কি রাজমাতা হইয়া কাঙ্গালিনীর ন্যায় অশ্রুপাত করিতে থাকিবে! শূরবীরপ্রসবিনী হইয়াও কি আর্য্যভূমি এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত থাকিবে! যদি আপনারাও ভারতের দুঃখ মোচনের জন্য যত্ন, চেষ্টা ও সাহায্যতা না করেন তবে এক্ষণে উপায় কি!

ভূদেব ব্রাহ্মণগণ! আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতাপে ভারতভূমি বিশ্বপূজিত হইয়াছিল, আপনারাই ভারতীয় গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা, আপনা-রাই ভারতভূষণ। যদি আপনারা আর কিছু দিন কর্ত্তব্যবিমুখ থাকেন, তাহা হইলে আপনাদিগের নামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নামও ডুবিবে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আলোচনা করুন, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম যাজনা করুন। ধর্ম্ম ও জ্ঞানবলে ভারতকে সচেতন করুন, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ যত্ন করুন, ইহা ভিন্ন বলুন, আর এক্ষণে উপায় কি!

ধর্ম্মাত্মা, ধনাঢ্য, সদনুষ্ঠানশীল মহোদয় মাত্রকেই সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে বলিতেছি, সকলেই স্ব স্ব হৃদয়ে ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর করিবার পন্থা অন্বেষণ করিয়া বলুন, এক্ষণে উপায় কি ! চিকিৎসকগণ ! আপনারা তো অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি শান্তি করেন, ভারতবর্ষ বিষম বিকারগ্রস্ত, চিন্তা করিয়া বলুন, এই বিষম ব্যাধি শান্তির এক্ষণে উপায় কি ! আমরা ভারতের এই ঘোর বিপদ্ কালে সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদি কেহ সাধনা বলে, জ্ঞান বলে অথবা আর্য্যবীর্য্য তেজো-বলে বুঝিতে পারিয়া থাকেন তবে বলিয়া দিন, এক্ষণে উপায় কি ! যদি আপনারা ভারতবাসী হইয়া ভারতের হিতসাধন না করিবেন, যদি আপ-নারা সকলেই ভারতের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমোদ উপহাস করিবেন, তবে আর এক্ষণে উপায় কি ? আপনাদিগের সমবেত যত্ন ও সহায়তা ভিন্ন ভারতের উন্নতি সাধনের এক্ষণে উপায় কি !

নারায়ণ ! তোমার চিরশরণাগত ভারত হতচেতন হইয়া পড়িয়াছে, আর তোমাকে আবাহন করে এরূপ সংজ্ঞা নাই। নাথ! রক্ষা কর, প্রত্যেক আর্য্যসন্তানকে মর্ম্মভেদী স্বরে বলিয়া দাও—"শীঘ্র উত্থান কর, আর্য্যনামের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া আর্য্য কীর্ত্তি রক্ষা কর।" হে দীনবন্ধো ! আমাদিগকে তোমার জ্ঞান দাও, তেজ দাও, আর্য্যদিগের ন্যায় বল, বীর্য্য, বুদ্ধি, বিচার দাও, ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস দাও, এবং জ্বলন্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া বজ্রনিনাদে বলিয়া দাও, ভারত উদ্ধারের এক্ষণে উপায় কি ! তোমার প্রেরণা ভিন্ন ভারত তো কখনও কোন কার্য্য করে নাই, সুতরাং তুমি ভিন্ন ভারতের আর এক্ষণে উপায় কি ! !

—০—

দল ভাঙ্গিয়া দল বাঁধা।

যে ধর্ম্মসমাজকেই জিজ্ঞাসা কর, সকলেই বলিবে যে "সাম্প্রদায়িকতা" বড়ই সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। অথচ দেখ, সকলেই এই জীর্ণ সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। অভিমান স্বার্থবুদ্ধির সূচনা করে। যখন কার্য্য-কৌশলচতুর ব্যক্তির এই স্বার্থবুদ্ধির উদয় হয়, তখন তিনি বুদ্ধি-কৌশলে নিজের স্বার্থকে অন্য অনেকের স্বার্থ বলিয়া বুঝাইয়া দেন, অমনি তাঁহার স্বার্থ নিমেষ মধ্যে সাধারণের সামগ্রী হইয়া পড়ে। স্বার্থসিদ্ধি দেখিতে দেখিতে বারবিলাসিনীর ন্যায় একস্থলেই অনেক লোক একত্র করিল। অমনি একটি দল বাঁধিয়া গেল। যেখানে অভিমান নাই—স্বার্থ নাই, সেখানে দলও নাই। যাহারা বিষয়ের দাস, তাহারা এরূপ দল বাঁধিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু যে ধর্ম্মবুদ্ধি ঈশ্বরের সহিত জীবের যুগল মিলন দেখিতে চায়, তোমায় আমায় এক করিতে চায়, বৈষম্য-বুদ্ধির বিনাশ করিতে চায়, স্বর্গ মর্ত্ত একই নিয়মে চালাইতে চায়, সেই ধর্ম্মবুদ্ধিও যে দলাদলির হাত এড়াইতে পারে নাই ইহাই আশ্চর্য্য। যাঁহারা স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে ধর্ম্মের মূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁহাদের এরূপ দুর্দ্দশা হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই; কিন্তু মলিন হৃদয়ে সেই সুন্দর ছবি আবার কদাকার বোধ হয়। যাঁহারা সরলতা, নিরভিমান, বিনয়, ভক্তি, বিশ্বাস আদি ফুলে হৃদয়ের সাজি সাজাইয়া ধরা ধামে ভগবানের পূজা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার কুটিল গর্ভে পতিত হয়েন না, কিন্তু তাঁহাদের অনুগামিবর্গের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের পসারা মাথায় করিয়া জগতের কাছে আত্মমর্য্যাদা ভিক্ষা করিতে যান, তাঁহারা অগত্যা সম্প্রদায়-বদ্ধ না হইলে কার্য্য-সাধন করিতে পারেন না। দলবদ্ধ হইলেও ভগবানের পূজা সকলে এক প্রণালীতে করে না বা করিতে পারে

না। ধর্ম্মের পরিচ্ছদ—মালা তিলকাদি চিহ্ন বা আসনাদি একরূপ হইতে পারে, কিন্তু পূজার প্রধান উপকরণ—মনের ভাব—সকলের একরূপ হইতে পারে না। সুতরাং এক সম্প্রদায়ের হইলেও সকলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। কথা-প্রসঙ্গে বা তর্ক-বিতর্ক কালে এক মণ্ডলীর ঈশ্বর একই রূপ হইতে পারেন, কিন্তু পূজার সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। লোকতঃ হয়তো একটি প্রবল দল দেখিলাম, কিন্তু পরমার্থতঃ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। সম্প্রদায় গুলির প্রকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন স্তরে স্তরে ইট গুলি সাজান আছে মাত্র, কিন্তু পরস্পরের মশালার যোড় নাই। আবশ্যক হইলে ক্ষণ মধ্যেই ঐ ইষ্টকস্তূপে তিন চারিটি স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত হইতে পারে। সম্প্রদায় বা দল কথাটি শুনিলে যেন একটি প্রচণ্ড শক্তির অভিনয়ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ উহা অন্তঃসারশূন্য, বালুকাস্তূপবিনির্ম্মিত গৃহের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

বুদ্ধিমান্ মহাত্মারা যে সাম্প্রদায়িকতার এই কুহকময়ী বাজির ঠাট বুঝিতে পারেন না, তাহা নহে। ইহা বুঝিতে না পারিলে উহার মূলোচ্ছেদ করিয়া ঐকমত্য স্থাপনের জন্য তাঁহারা এত চেষ্টা করেন কেন? পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে পরমার্থ রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার মলিন ছায়া প্রবেশ করিতে পারে না, তবে কতকগুলি মোটামুটি কথায় অনেক লোকের ঐক্য থাকে বলিয়া লোক-জগতে দলের বড় মর্য্যাদা। এই মর্য্যাদা রাখিবার জন্যই তর্কের দ্বারা অন্যের শাস্ত্রে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্তি হয়। তোমার অভিমানে আঘাত পড়িল, অমনি তুমি দণ্ডাহত বিষধরের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া—মহা আস্ফালন করিয়া বিপক্ষের গ্লানি কুৎসা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে—দম্ভ অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া বিপক্ষের মর্ম্ম-স্থানে দংশন করিলে, অভিমানের তাড়নায় আপনার পক্ষ সমর্থন করিতে

গিয়া—নিজ বুদ্ধিবোধিত সংস্কারের মর্য্যাদা রাখিতে গিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই ভাসাইয়া দিলে। সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকিলে এই সকল বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মহাত্মাগণ সাম্প্রদায়িকতাকে জগৎ হইতে তাড়াইতে চাহেন। তাঁহাদের ইচ্ছা অতি সাধু—সংকল্প অতি পবিত্র। কিন্তু তাঁহারা করিবেন কি! তালপত্রের খাঁড়া দিয়া রাক্ষসীকে নিপাত করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল বাহ্বাস্ফোটনে—কেবল কটি বন্ধনে—কেবল তর্জ্জন গর্জ্জনে এ মায়াযুদ্ধে বিজয়ের আশা করা বৃথা। উদ্দেশ্য মহৎ হইলে কি হইবে, তদুপযুক্ত উপায় কৈ? তুমি ভাবিলে পুরুভুজকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম—পুরুভুজ মরিয়া গেল। মায়ার লীলা বুঝিবে কি! ঐ দেখ পুরুভুজের এক একটি খণ্ড এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুরুভুজ হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে একটি পুরুভুজ ছিল, তোমার অস্ত্রাঘাতের গুণে পুরুভুজের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। তাই বলি তুমিতো দল—সম্প্রদায় উঠাইতে গেলে, কিন্তু কপাল গুণে তুমিই আবার সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়াইয়া ফেলিলে। কত লোক অসাম্প্রদায়িকতার নিশান তুলিয়া সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করিতে গেল; গেল বটে, কিন্তু আর ফিরিল না। কিয়দ্দিন পরে দেখি "গণ্ডোপরি বিষস্ফোটক"। একে লোকে কতক গুলো সম্প্রদায়ের জ্বালায় জ্বালায়তন, তাহাতে ঐ অসাম্প্রদায়িকতার ধ্বজাধারিগণই এক সম্প্রদায় বাঁধিয়া বসিল। তুমি আপনাকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া যতই পরিচয় দাও না কেন, কার্য্যতঃ—বস্তুতঃ তোমার অসাম্প্রদায়িক দলই এক সম্প্রদায়। হাতের পাঁচটী অঙ্গুলীর মধ্যে চারিটি অঙ্গুলীর বৃদ্ধা, কনিষ্ঠাদি চারিটি নাম আছে, একটির নাম নাই, তাই লোকে তাহাকে "অনামিকা" বলে; কিন্তু এক্ষণে "অনামিকাই" তাহার "নাম" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রূপ "অসাম্প্রদায়িক" দলই এক "সম্প্রদায়" বলিয়া উক্ত হয়। কিছু দিন হইল, সম্প্রদায়ের গণ্ডগোল হইতে ভারতকে বাঁচাইবার জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজা

রামমোহন রায়, সাধুহৃদয় শ্রীমন্মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামনা বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মমণ্ডলী এই মহামন্ত্র সাধন করিতেছিলেন। তাহার ফল যাহা চিরকাল হইয়া আসিয়াছে, তাহাই হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া বলিলেন, "যে ভয়ে পলাও তুমি, সেই দেবী আমি"। ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে আমরা নিজ ভাষায় আর কিছু বলিব না। ব্রাহ্মগণ ভাবিবেন, আমরা বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশম্বদ হইয়া তাঁহাদের গৃহকাহিনী গাহিতেছি; এই জন্য "নব্য ভারতে" প্রকাশিত জনৈক বিশেষ পরিচিত "বিধানদল" ভুক্ত মহাত্মার (শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মার) কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই দেখুন না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম কত বিচিত্র প্রণালীর ভিতর দিয়া চলিয়া আসিল এবং কোথায় কি রূপ ধারণ করিল? একটু ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, প্রত্যেকেরই যেন স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই এইরূপ স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হইবে। অবশ্য বাহিরে দুই পাঁচটী বাহ্যকার্য্য সমবেতভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে এবং তাহাকে একটী সাধারণ নামে অভিহিত করিয়া আমি অমুক সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি বাক্য সচরাচর সকলে ব্যবহার করেন, কিন্তু আন্তরিক ভাবের একতা কোথায়? সে একতা যেখানে, সেই ত স্বর্গরাজ্য! তাহা অতি বিরল। প্রাচীন ধর্ম্মের ইতিহাসে মানবের ধর্ম্মচরিত্র যেমন নানা বর্ণে চিত্রিত আছে, বর্ত্তমানেও তাহাই হইতেছে। ব্রাহ্মগণ কেহ হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশবিশেষকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কেহ ভয়সি পার্কার নিউম্যানের বিচার পথ ধরিয়াছেন, কেহ প্রাণায়াম সাধন পূর্ব্বক নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছেন; কেহ বাউল, কেহ কর্ত্তাভজা, কেহ ভবিষ্যদ্বক্তা, কেহ প্রেততত্ত্ববাদী, কেহ ভাবপ্রধান পথে, কেহ বা জ্ঞান-বিচার-পথে, কেহ অধিক বাহ্যাবলম্বনপ্রিয়, কেহ নির্গুণ ব্রহ্মবাদী, কেহ মনুষ্যের

মুখাপেক্ষী, কেহ অধ্যাত্মবাদী নিরবলম্ব ব্রহ্মোপাসক, কেহ সামাজিক, কেহ বাহ্যসংস্কারপ্রিয়; যিনি যে পথটী ধরিতে পারিয়াছেন তাহাই ধরিয়া চলিতেছেন। যে ধর্মের দ্বারা সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইবার কথা, তাহাই আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল! কেহ কেহ সাকারের রাজ্যে গিয়া জড়বাদী হইতেছেন, কেহ নিরাকারের অজ্ঞানিত অকূল সমুদ্রপথে পড়িয়া অন্ধকার দেখিতেছেন। ব্রাহ্মগণ নানাদিকে দৌড়িতেছেন, কোথায় গিয়া তাঁহারা আশ্রয় পাইবেন; কাহার যে কি পরিণাম হইবে, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না।"

এই তো গেল আমাদের ব্রহ্মবাদিগণের চেষ্টা, উদ্যোগ ও প্রযত্নের পরিণাম। এই পরিণাম দেখিয়া আমরা ব্রাহ্মগণকে পরিহাস করিতে চাহি না, অধিকন্তু সাধারণ মনুষ্যগণের দ্বারা এতদপেক্ষা অন্যপ্রকার ফল উৎপন্ন হইবার যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারাই পরিহাসাস্পদ হয়েন। প্রকৃতির গতিরোধ করিতে হইলে অলৌকিক শক্তি সাধন করা আবশ্যক।

উপসংহার কালে আমাদের আর্য্যশাস্ত্রানুরাগী থিয়সফিষ্ট ভ্রাতৃবর্গকে দুই একটি কথা বলিব। তাঁহারাও এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারাও সাম্প্রদায়িকতাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিতে চাহেন। ইঁহাদেরও "উদ্দেশ্য" উচ্চ ও "উদার", কিন্তু "উপায়" ইঁহাদেরও অন্যের যাহা হইয়া থাকে, তাহাই। ইঁহাদের মধ্যে অনেক ধীর, শান্ত, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদের কার্য্যকুশলতা অনেক স্থলেই প্রশংসনীয়। থিয়সফি সম্বন্ধে কিছুদিনের মধ্যে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সে সকল কথা আজ এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য নহে। তবে সার্ব্বভৌম—ভ্রাতৃ-ভাব (Universal Brotherhood) সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা এতৎ-প্রসঙ্গাধীন বলিয়া বোধ হইতেছে। পৃথিবীশুদ্ধ লোককে "ভাই বলিয়া ভাল বাস" এটী পুঁথিসাজন কথা। সামাজিক ব্যবহার কালে ভূতলে

পার্থিব প্রকৃতি সত্ত্বে কেহ যে কখন দেখিবে তাহারও আশা নাই। বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার রূপ বর্ণনা পড়িয়া যদি কেহ সেইরূপ রূপবতী যুবতী সত্যসত্যই চর্ম্মচক্ষে দেখিতে চায়, তবে তাহাকে লোক যেমন পাগল বলে, সেইরূপ জ্ঞানসাধনার চরম ফল "সমদর্শন" যে ব্যক্তি এই পৃথিবীর ময়লা মাটিমাখা মানব সমাজের কার্য্যক্ষেত্রে চালাইতে চাহেন, তাঁহাকে আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও পাগল ভিন্ন আর কি বলিব? রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া, স্বার্থ, মান, যশোলিপ্সা, সাংসারিক সুখ সৌভাগ্য বাসনার বোঝা মাথায় রাখিয়া সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব করা কথার কথা নহে। একটি নিন্দা শুনিলে ক্রোধে কাঁপিয়া উঠি, আমা হইতে অন্যের অধিক প্রশংসা শুনিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, মহাসভায় হরি বাবু নিমন্ত্রণ-লিপি (Invitation Card) পাইলেন আমি পাইলাম না, এই অভিমানে মরমে মরিয়া যাই, আপনি সভাতে যাইবামাত্র সকলে উঠিয়া সৎকার করিল, আমি সভাস্থ হইলে কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না, এই দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এক জন দরিদ্র বা নিম্নপদস্থ ব্যক্তি আমাকে "আপনি মহাশয়" না বলিয়া তুমি বা তুই বলিলে আমি অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠি, আমার কি কর্ম্ম সকলকে ভাই বলিয়া ভালবাসা? পূজার বাজারে যে সকল কাপড় বিক্রীত হয়, তাহার জমি ভাল হউক, বা না হউক, তাহার চটকদার পাড় থাকিলেই তাহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া যায়; সেইরূপ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কার্য্যতঃ কিছু থাকুক্ বা না থাকুক, গোটা কতক্ ঐরূপ চটক্দার কথার মাত্রা থাকায় সংসারে সম্প্রদায়গুলি শোভা পাইয়া থাকে। আমরা এই উচ্চ উদার কথা গুলির বিরোধী নহি, তবে ব্যবহার ক্ষেত্রে কোন ফল দেখিতে পাই না বলিয়াই বড় দুঃখিত হই। আবার কার্য্য করিতে পার না বলিয়া কথা গুলি উঠাইয়াও দিতে বলি না। কেননা, ওকথাগুলি অতি উচ্চ উদার-প্রকৃতি আদর্শ জীবনের কথা। কথাগুলির টানে পড়িয়া মনুষ্যগণ সেই

অবস্থা পাইতে ইচ্ছা করিবে। কথা গুলি মুছিয়া ফেলিলে মানব-হৃদয়ে আশা ভরসা সব ফুরাইয়া যাইবে। আরও একটি কার্য্যের কথা বলিব। তুমি যখন থিয়সফিষ্ট ছিলে না, তখন সাধারণ ভাবে কিছু কিছু সকলের সঙ্গেই তোমার সদ্ভাব ছিল, কিন্তু তুমি হিন্দুর ছেলে থিয়সফিষ্ট হইলে, দুটি হিন্দু, দুটি মুসলমান, দুটি ক্রিশ্চিয়ান, দুটি বৌদ্ধ, একত্র হইয়া ভাবিলে আমরা সাম্প্রদায়িকতা চূর্ণ করিয়া সকল দেশের লোক, সকল ধর্ম্মের লোক, একাসনে একত্রে বসিয়া কেমন ভ্রাতৃভাব করিলাম! কিন্তু ভাই! জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি প্রকৃত হিন্দু হও, তবে কি গোঘাতক, গোভোজী ক্রিশ্চিয়ান, মুষলমানকে একাসনে বসাইয়া ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে পার? তাহার করকম্পন করিবার পর কি হস্ত না ধুইয়া কাপড় না ছাড়িয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিতে পার? যদি বল, পারি, তবে আমরা বলিব—তুমি জ্ঞানী হইতে পার, তুমি বিবেকী হইতে পার, তুমি যোগী হইতে পার, তুমি সিদ্ধ হইতে পার, তুমি মহাত্মা হইতে পার, কিন্তু "হিন্দু" হইতে পার না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ করাই শাস্ত্র সঙ্গত হিন্দুয়ানি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপেক্ষাকারিগণকে হিন্দু সমাজ "হিন্দু" বলিয়া স্বীকার করেন না। আবার দেখ, তোমরা চারি ধর্ম্মের আটটি লোক সভ্য হইয়া ভ্রাতৃভাবে সভা করিলে; তোমার যে ভ্রাতৃভাবশক্তি বিন্দু বিন্দু শিশিরের ন্যায় বিস্তীর্ণ বিশ্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ছিল, আজ সেই বিন্দুরাশি ধীরে ধীরে নৈসর্গিক নিয়মে প্রত্যাহৃত হইয়া কূপ (সভা) মধ্যে একত্রিত হইল। এখন যে ব্যক্তি তোমার সভায় প্রবিষ্ট হইবে, সেই তোমার ভ্রাতৃভাবের সুধাসেবন-ভাগী হইবে। কিন্তু আমি তোমার সভার বাহিরের লোক, যখন তুমি থিয়সফিষ্ট ছিলে না, তখন তোমাকে থিয়সফির বিরুদ্ধে কোন রহস্য করিলে, তুমি হাসিয়া উঠিতে অথবা আমার মতের অনুমোদন করিতে। কিন্তু যে দিন হইতে থিয়সফিষ্ট হইলে, সেই দিনের পর যখন আমি তোমার সভার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিয়াছি,

অমনি তুমি জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় আমার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছ, এখন আমার মুখ দেখিতে বা আমার সহিত কথা কহিতেও তোমার ক্লেশ বা ঘৃণা বোধ হয়। ভাই! তুমি যে ইতিপূর্ব্বে আমাকে একটু ভাই ভাই ভাবিতে, এ কোথাকার "ভাইহুড্" আনিয়া এ গরীব ভাইটীকে ছুট করিয়া দিলে! দল বাঁধিলেই বাহিরের সহানুভূতি হারাইতে হয়, এবং বাহিরের সমাজে সহানুভূতি ও সহযোগিতা করিতেও তত ইচ্ছা হয় না। বস্তুতঃ যাঁহারা ভ্রাতৃভাব ও অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী, তাঁহাদের সভা করিলে, দল বাঁধিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। যদি সকল দল ভাঙ্গিয়া এক করিতে চাও, তবে নিজের দলটী প্রথমেই ভাঙ্গিয়া ফেল। নতুবা পুরাতন দল ভাঙ্গিয়া একটি নূতন দল বাঁধিলে আর কি হইবে। যে দিন তোমার "আমার" বলিবার আর কিছু থাকিবে না, সেই দিন সকলই ও সকলেই তোমার ও তুমিও সকলের হইবে। আমরা (মানব সমাজ) অপূর্ণশক্তি-সম্পন্ন, আমরা দল ভাঙ্গিতে গিয়া দল বাঁধিয়া বসি। এখন আমরা ঘরের ছেলে ঘরে বসিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিলেই ভারতের কল্যাণ! দলের উপর দল বাড়াইয়া বৃথা গৃহবিরোধ বাড়াইতেছি মাত্র। কোন সম্প্রদায়ই যেন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হয়েন। আমরা দলাদলিতে মর্ম্মবেদনা পাইয়াই কথাগুলি লিখিলাম। যাহাতে পরস্পর বিরোধ কমিয়া আসে, তাহারই সদুপায় উদ্ভাবন করেন, ইহাই সর্ব্ব সম্প্রদায়ের কাছে প্রার্থনা।

—o—

নীতি-শিক্ষা।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, হস্ত পদ থাকিতে পঙ্গু ও জীবন থাকিতে মৃত। ভারত দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে না, কার্য্য করিতে পারিলেও করিবে না, বুঝিয়াও বুঝিবে না, জাগিয়াও উঠিবে না। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচন পূর্ব্বক ভবিষ্যদ্ভারতের চিন্তা করিলে চিন্তাশীল মহাত্মা মাত্রেরই চিত্ত চকিত হইয়া উঠে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুই চারিটী উপাধি, কিছু ঐশ্বর্য্য ও রাজকীয় সম্মান সূচক দুই একটী পদবী লব্ধ হইলে বর্ত্তমান ভারত নিজ জন্ম সার্থক ও জীবন সফল মনে করেন। এ গুলি ভিন্ন জীবনের অন্য কিছু বিশেষ কর্ত্তব্য আছে কি না তাহা চিন্তা করিবার অনেকেরই অবকাশ নাই। ভারত বাল্যকালে জীবিতাশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত সঙ্কীর্ণ শিক্ষা-সোপানে আরোহণার্থ কঠোর পরিশ্রম সহ দিবানিশি যত্নবান্, পরীক্ষার ক্রমাগত কঠোর শ্রমে ক্লান্ত হইয়া ভারত যৌবনাবস্থায় প্রবেশ করিয়াই শিক্ষার অপেক্ষাকৃত উন্নত সোপানে অধিরোহণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়েন, আরও অগ্রসর হইলে শিক্ষার যে দিব্য মনোহর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রায় অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠেনা। শীতার্ত্ত ব্যক্তি ইন্ধন আহরণ করিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে যত্ন ও অবধানের অভাবে অগ্নিতাপ সেবন করিতে পাইল না। জীবনের গূঢ় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কিরূপে কিছু ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, কি উপায়ে মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়, নব্য ভারত তজ্জন্য ক্ষিপ্ত প্রায়, বৃদ্ধগণ গত জীবনের সংস্কারের বশীভূত, অগত্যা তাঁহারাও শিক্ষার পরম সুধাস্বাদে বঞ্চিত। বিনা চিকিৎসায় ও অসাবধানতায় ভারতের বিষম ব্যাধি বাড়িতে লাগিল—পরমায়ু সত্ত্বে বুঝি ভারতের আসন্নকাল উপস্থিত।

ভারতনিবাসিগণ পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্যের পরম সমাদর করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস না করিয়া তাঁহারা গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন না। ব্রহ্মচর্য্যকালে তাঁহারা বিদ্যা, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি জীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য গুলি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া গুরুগৃহ হইতে লোকসমাজে প্রবিষ্ট হইতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথা যে দিন হইতে পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহা দুর্ব্বলতা, দুরাগ্রহ, দুর্ব্ব্যবহার, ভ্রষ্টাচার, ভীরুতা, চপলতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা আদি ক্ষীণতা ও মানসিক মলিনতার প্রধান নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগণের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি কালে বর্ণানুসারে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিবিধ সাধারণ নীতি শিক্ষা পাইয়া ভারতবাসিগণ তপোবল, ধর্ম্মবল, বিদ্যাবল, বাহুবল, বিত্তবল আদির গুণে জাতীয় প্রকৃতি লাভ করিয়া এতৎ পবিত্র ভূমিকে সভ্যসমাজের শিরোভূষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর দোষে ও পিতা মাতা আদি গুরুগণের তত্ত্বাবধান ও যত্নের অভাবে সুকুমারমতি বালকবর্গ স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজকে কলঙ্কিত ও বিষম উপদ্রবগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। পিতা মাতা সন্তানের শৈশব হইতেই যদি নীতি-শিক্ষার দিকে মনোযোগী হয়েন, তবে তাঁহারা ও সন্তানগণ চিরসুখী হইতে পারেন ও সমাজও নিরুপদ্রব থাকে। প্রথম হইতেই বালকের হৃদয় যে উপাদানে গঠিত হইয়া যায়, "বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা আপনা আপনিই সংশোধিত হইয়া যাইবে"—পিতা মাতার এই বিষম ভ্রম দূর না হইলে ভারতের কল্যাণ নাই। পিতা মাতার ঔদাস্য ও উপেক্ষা বালক-বর্গের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পিতা মাতা যদি সন্তান হইতে সুখী হইতে ও সন্তানকে সুখী করিতে চাহেন, তবে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া বালকগণের সুনীতি-শিক্ষার উপায় বিধান করুন। নীতি শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে সাধারণ সমাজে প্রচলিত হইলে বৃথা কলহ,

বিবাদ, বিসম্বাদ, অসভ্যতা, মূর্খতা, ধৃষ্টতা, ধূর্ত্ততা, কপটতা, প্রবঞ্চনা, আদি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় ; বিচারালয়ে এত মিথ্যা অভিযোগ ও তজ্জন্য অযথা অর্থব্যয়ও হয় না, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, বেশ্যালয় গমন, মদ্যাদি সেবন জন্য মহাপাপ ও সমাজে দারিদ্র্য দুঃখ বৃদ্ধি হয় না, সামান্য প্রভুত্ব লাভের জন্য নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিতও হয় না, অধিক, কি সমাজ নিতান্ত নিরুপদ্রব হইয়া উঠে। নীতি শিক্ষা দ্বারা শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়। পারিবারিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দতাই সুনীতি-শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে।

নৃত্য-গীত।

সেনাদিগের গতি ও কার্য্য যেমন সেনাপতির আজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের যন্ত্র সকলও মনের ইঙ্গিত ভিন্ন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। মনঃপ্রবৃত্তির অবস্থা ও গতি অনুসারে শারীরিক যন্ত্র সকলেরও কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। মনোমধ্যে একটী ভাব বা তরঙ্গের উচ্ছ্বাস উঠিলে তাহা শরীরের কোন না কোন যন্ত্র দ্বারা বহির্জগতে প্রকাশিত হয়। শরীরের বহির্দৃশ্য মনোবৃত্তিপ্রবাহের স্থূল পরিচয়-চিহ্ন। মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিলে মুখের এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের যেরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশিত হয়, ক্রোধ বা অভিমানের উদয় হইলে শরীরের বাহ্য চিহ্ন আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তত্তদ্বৃত্তির প্রকৃতিভেদে অঙ্গভঙ্গী স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। যদি কোন ব্যক্তির সৎ হউক বা অসৎ হউক মনঃপ্রভাব অন্যের অপেক্ষা ঐকান্তিক ও অধিক প্রবল হয়, তবে তাহার বহিরঙ্গের প্রকাশিত ভাবভঙ্গী নিকটস্থ দ্রষ্টার মনোমধ্যে পূর্ব্ব ব্যক্তির ভাবপ্রবাহ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার দুর্ব্বল মনকে সেইভাবে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। আমরা যদি একজন লোককে পুত্রশোকে কাতর হইয়া বিষণ্ণবদনে বসিয়া থাকিতে দেখি, তবে মানবীয় সহানুভূতির বলে আমরাও সহজে বিষাদগ্রস্ত হইব। একজন লোক যদি অকপট মনে পরম উল্লাসে এক স্থানে বসিয়া উচ্চ হাস্য করিতে থাকে, তবে তাহার দিকে তাকাইলে দ্রষ্টার মনের বিষাদ-ভাব বিদূরিত হইয়া যায় এবং তাহার উল্লাসের তরঙ্গে মনও স্বয়ং আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। মনের ভাব বিশেষের অনুকূল শরীরের যে ভঙ্গী, সঞ্চালন বা কম্পন বিশেষ, তাহাই প্রণালীবদ্ধ হইলে নৃত্য নামে অভিহিত হয়। মনের প্রবল উচ্ছ্বাস ভিন্ন শরীরের নৃত্য করিবার সামর্থ্য হয় না। নৃত্য নীরবে উপদেশ ব্যাখ্যান করিয়া থাকে। ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া গৌরাঙ্গ যখন

ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে অথবা তাহার প্রতিকৃতি দৃশ্য দর্শন করিলে মনোমধ্যে কি সেই উচ্চ প্রেমানন্দ-ভাবের উদয় হয় না? একজন লোক ধন সম্পত্তি পাইয়া নৃত্য করিতেছে, তাহা দেখিলে কি গৌরাঙ্গের ভাব মনোমধ্যে আসিতে পারে? একজন লোক দেবীর সম্মুখে ছাগ বলিদান দিয়া ছাগস্কন্ধে নৃত্য করিতেছে, তদ্দর্শনে কি মনে একটা বীভৎস—বীরভাবের উদয় হয় না? এক জন বারবিলাসিনী কুৎসিত কামনাপূর্ণ চিত্তের তরঙ্গাঘাতে যে ভাবে নৃত্য করে, তাহা দর্শন করিলে কাহার মনে অপবিত্রতার উদয় না হয়? আবার ভাব-বিশেষকে উদয় করিবার জন্য সুর তালের সহযোগিতা লওয়া হইয়া থাকে। বাদ্য-যন্ত্রে যে সুর বা তাল ক্রীড়িত হয়, তাহাও মনের ভাব-প্রবাহ মাত্র, যন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বাহ্য জগতে নিজ শক্তির বিস্তার করে। বাদ্যের গুণ মনুষ্যকে হাসাইতে, কাঁদাইতে, নাচাইতে, মাতাইতে ও লুটাইতে পারে। বাদ্য মনুষ্যকে ভক্ত, বীরমদে মত্ত, জ্ঞানগম্ভীর চিত্ত, প্রেম-সুধাসিক্ত অথবা বৃথামোদযুক্ত করিতে সমর্থ হয়।

গীতও কণ্ঠের নর্ত্তন মাত্র। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরের প্রকার ও প্রয়োগ ভেদে গীত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মনোবৃত্তি-প্রবাহকে বহির্জগতে আনয়ন করে। প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি ইত্যাকার সময় ভেদে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আদি ঋতুভেদে মনোভাবেরও তারতম্য ও ভিন্নতা হইয়া থাকে। তদনুসারে মনঃ প্রকৃতির অনুকূল তত্তৎ সময়োপ-যোগী সুরেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সময়ানুকূল সুরে গীত গাইতে পারিলে বড় মধুর লাগে অর্থাৎ উহা মনোবৃত্তির অনুকূল হয়। সংগীতে ভাব ব্যাখ্যা করিবার সময় ভাবের প্রকৃতির দিকে রচয়িতার দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ বা উদ্দীপনার সময় গম্ভীর বা মধুর সাত্ত্বিকী ভাষার প্রয়োগ সহ তদনুকূল সুরে গান রচনা করা বিধেয়। দাশরথি গান বাঁধি-লেন, "জীব সাজি সমরে রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে।" সাত্ত্বিক ভাবের

উদয় করাই দাশরথির উদ্দেশ্য, কিন্তু রচনারভাবায় রাজস ভাবের স্রোত উদ্গীরিত হইতেছে, সুতরাং শ্রোতার মনে সত্ত্বগুণের উদয় করিয়া দিবার গীতটীর তাদৃশ শক্তি নাই। সুর অনুসারে ভাবেরও উদ্ভাবনা হইয়া থাকে। কীর্ত্তনের সুরে যেমন ভক্তির গান রচিত হয় এবং তাহাতে শ্রোতার অন্তঃকরণে যে ভাবসুধা বর্ষণ করে, মল্লার রাগে সেই গান রচিত হইলে শ্রোতার হৃদয়ে সে ভাব কখনই প্রবেশ করিতে পারে না। স্বর-তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকই আজকাল ঠুংরী সুরে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া মনুষ্যসমাজে কুরুচির পরিচয় দিয়া থাকে। সুর, তাল, গান, মান ও নৃত্য আদি ভাবের স্বশ্রেণীভুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নৃত্য গীতাদিতে যে মোহিনী শক্তি (Mesmeric Power) আছে, তাহার প্রকৃত প্রয়োগ হইলে জগতের বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু আজ কাল অনভিজ্ঞতা মনুষ্যসমাজকে, বিশেষতঃ আমাদের ভারতীয় বর্ত্তমান সমাজকে বিষম বিভ্রাটে ফেলিয়াছে। টপ্পার সুরে যোগের গান বাঁধিয়া তৈল ও জলে মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছে। তৈলমিশ্রিত জলপাত্রে জলপান করা যেমন অসম্ভব অর্থাৎ জল খাইবার আগে তৈল খাইতে হয়, সেইরূপ অপবিত্র ভাবোদ্দীপক ঠুংরী সুরে ভক্তির গান গাইতে গেলে ভক্তির উদয় হউক বা না হউক, কুৎসিত ভাবে হৃদয়তন্ত্রী অগ্রেই নাচিয়া উঠিবে। বর্ত্তমান সমাজের রুচি এত বিকৃত ও বিশৃঙ্খল, যে একজন বুদ্ধিমান্ তদ্দর্শনে সমাজকে বাতুলতারোগ গ্রস্ত মনে করিতে পারেন। গায়কের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যের তাল মান না মিলিলে যেমন শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হয়, বর্ত্তমান সমাজের নৃত্য গীতের ব্যবস্থা দেখিয়া তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া অনুমিত হয়। বাসরঘরে যদি কেহ "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"—এই গীতটী গান করে, সে যেমন তথাকার রমণীমণ্ডলী কর্ত্তৃক উপহসিত হয়, ভগবতীর সৌম্য মূর্ত্তি জগদ্ধাত্রী পূজার দিন দেবীসমক্ষে বাই ও তয়ফা নাচও সাধুসমাজে তাদৃশ নিন্দিত। নৃত্য গীতক আর্য্যধর্ম্মিগণ কখনও

অনাদর করিতে পারিবেন না, কেননা তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতেও অপ্সরীর নাচের অবতারণা দেখিতেছেন। আমোদ সূচক ঘটনা বিশেষে এরূপ নৃত্য শোভা পায় বটে, কিন্তু যে দিন ভক্তি, জ্ঞান ও মুমুক্ষুতার প্রার্থী হইয়া দেবীর আরাধনা করিতেছি, সেদিন কি তাঁহার সমক্ষে অপবিত্র ভাবোদ্দীপক নৃত্য গীতাদির অবতারণা করিলে ভাবরাজ্যে বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হয় না ? সেদিনের ক্রিয়া কাণ্ড সমস্তই বিফল ও পণ্ড হইয়া যায়। পূজার দিনে দেবতার সমক্ষে সাধুভাব-উদ্দীপক নৃত্যগীত হওয়া আবশ্যক। এই জন্য বলি, বর্ত্তমান সমাজ যেন বাতুলের ন্যায় বেসুরে ও বেতালে প্রলাপ গান করিতেছে। ভাবের অনুকূল নৃত্য ও গীত যাহাতে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য বর্ত্তমান চিন্তাশীল সমাজের বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমরা আজ কাল যেরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি, নিরুদ্যম ও মৃদুস্বভাব হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে অপবিত্র নৃত্য গীতের অভিনয় যত না হয় ততই মঙ্গল। এক্ষণে উন্নত ও পবিত্র ভাব ভারতে অভিনীত হইতে থাকুক।

———o———

তীর্থোৎসব।

তীর্থ পর্য্যটন করা কুসংস্কার, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য নিজগৃহ পরিবার পরিত্যাগ করিয়া দূরাদ্দূরতর দেশান্তর্ব্বর্ত্তী তীর্থে গমন করা অজ্ঞানের কার্য্য, এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য অদ্য আমরা অগ্রসর নহি। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে অগণ্য তীর্থ বিরাজমান। ঋষিগণ, সাধুগণ অথবা চতুরাশ্রমের সমস্ত লোকই আর্য্যধর্ম্মের জয়-পতাকা হস্তে করিয়া চিরদিন এতাবত্তীর্থ পর্য্যটন করিতেন এবং গগণ-ভেদী স্বরে তত্তাবতের মহিমা ঘোষণা করিতে ত্রুটি করিতেন না। তীর্থস্থানে দেব দর্শন, স্নান, দান, পূজা আদি নিতান্ত পুণ্যকর, ইহা আর্য্যধর্ম্মী মাত্রেরই চিরসংস্কার। যে স্থানে কোন দেবতা বা কোন ঋষি কোন মহাযজ্ঞ বা কোন লোককল্যাণকর কার্য্য অথবা কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল পুণ্যভূমি মাত্রই—উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গেই হউক বা দুর্গম বনমধ্যেই হউক, জনাকীর্ণ নগরীর মধ্যেই হউক, অথবা ফেণিল নীল নীরতরঙ্গাহত সমুদ্রকূলেই হউক, তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তীর্থস্থান সকল সামান্য ভূমি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না সত্য, কিন্তু তত্রানুষ্ঠিত কার্য্য প্রভাবে ও অনুষ্ঠাতৃগণের তেজঃপ্রভাবে সেই সকল স্থানের প্রকৃতি অতীব পবিত্রতাময়ী হইয়া উঠিয়াছে। সাধু এবং অসাধু ভাবের—কার্য্যের অনুষ্ঠানের এমনই একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যে তাহা দ্বারা স্থানীয় প্রকৃতির পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। সাধুগণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ও ফুৎকারে, নেত্রপাতে ও অঙ্গুলির ইঙ্গিতেও স্থানীয় প্রকৃতি সাধুতার সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যাঁহার আত্মা যে পরিমাণে ব্রহ্মভাবাপন্ন, তাঁহার প্রভাব সেই পরিমাণে নিজ বিরাজভূমিতে বিকীর্ণ হইয়া অবিচলিতভাবে স্থিতি করিতে থাকে। সাংসারিকী কোন সামান্য শক্তি তাহাকে বিতাড়িত বা বিদূরিত করিতে পারে

না। বরং বিষয়বুদ্ধি-বিমূঢ় মনুষ্যগণ নিজ নিজ মলিন ভাব লইয়া সেই সেই স্থানে গমন করিলে তত্তৎস্থান-বিকীর্ণ পবিত্র শক্তি দ্বারা হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। তীর্থ স্থানে গমন করিলে প্রাসঙ্গিক সমস্ত ঘটনাবলী স্মরণ-পথে উদিত হয়; অর্থাৎ যে তীর্থে যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও যে দেবতা বা মহাত্মা সেই কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল অতীতবার্ত্তা হৃদয়ে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে এবং তীর্থাগত ব্যক্তির মনকে নবীন ভাবে জাগরিত করিয়া দেয়। তাঁহার কলুষিত চিত্তকে প্রাচীন পুণ্যকীর্ত্তি-প্রণিধানে উন্মত্ত করিয়া দেয়। তিনি যেন পুণ্যসুধাসিন্ধুনীরে অবগাহন করিয়া থাকেন। তাঁহার মন যেন যাবদ্‌যাতনা ও বিড়ম্বনাপূর্ণ বর্ত্তমান সংসার-কোলাহল হইতে অবসর পাইয়া অতীতের শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তিনি যেন তখন আর এক জন হইয়া উঠেন। তীর্থ নিদ্রিতকে জাগরিত করিতে পারে, দুর্ব্বলকে বলবান্ করিতে পারে, শোকসন্তপ্তকে সুশীতল করিতে পারে ও পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে।

পরমেষ্ঠিব্রহ্মার মহাযজ্ঞানুষ্ঠান-কাহিনী পুরাণের কোন্ পুরাতন জীর্ণ পত্রে লিপিবদ্ধ আছে, গহন কাননের কুটির পরিত্যাগ করিয়া, নিভৃত গিরিকন্দর পরিহার করিয়া কত মহাতেজা তাপসগণ সেই যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী পিতামহের অলঙ্ঘ্য আদেশ পাইয়া প্রয়াগে একত্র হইয়াছিলেন, তাহা আজ লোকের চক্ষে অমূলক উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু ত্রিবেণীতে এখনও সেই মহামহোৎসবের দুন্দুভি-ধ্বনির বিরাম হয় নাই। এখনও ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী রাশি রাশি লোক মাঘমাসে কল্পবাস ও স্নান করিবার জন্য সমাগত হইতেছে। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন নাই, রাজকীয় ডিণ্ডিম নাই, অথচ চারিদিকের লোক আসিয়া প্রয়াগে ত্রিবেণী-তীর ছাইয়া ফেলিল। শীত বাতে শরীর কম্পিত, অথচ বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রাতঃ-

স্নানে দৌড়িয়াছে। যাহাদের অঙ্গে বাহিরের বায়ুও স্পর্শ করিত না, আজ সেই কুলনারীগণও ত্রিবেণীর অভিমুখে ধাবিত। যে সকল লোক গৃহপ্রাচীরকেই পৃথিবীর শেষ জানিত, তাহারাও বিনা আমন্ত্রণে ত্রিবেণী-তীরে পৌঁছিয়াছে। হয় তো অনেকে বলিবেন এই কৃচ্ছ্র সাধ্য তীর্থ-স্নান-বিধি যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই কল্যাণ এবং ধর্ম্ম সুখসেব্য ও আধ্যাত্মিক সাধনের সামগ্রী হওয়া উচিত। আমরা এমতের শেষাংশ টুকুর বিরোধী না হইলেও ধর্ম্মকে সুখ ও দুঃখের উভয় অবস্থারই অনুষ্ঠেয় এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয় বৃত্তিরই গম্য বলিয়া স্বীকার করি।

মন ইন্দ্রিয়গণের সহায়তায় সদাই বহির্জ্জগতে বিচরণ করিতে ভাল বাসে। সর্ব্বদা সংযতভাবে ব্রহ্মানুধ্যানে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং অন্তর্জ্জগতে স্বীয় বৃত্তি নিবিষ্ট রাখা চঞ্চল মনের নিতান্ত অসম্ভব। মন পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হইয়া সংসারের যে সমস্ত ভোগাশয়ে আমোদ অনুভব করে, আর্য্য ঋষিগণের ব্যবস্থা কৌশলে সেই সমস্ত ব্যাপারেই ব্রহ্মভাবের অবতারণা করা হইয়াছে। তুমি বৃক্ষ দেখ, শৃগাল দেখ, পক্ষী দেখ, তাহার মধ্যে ব্রহ্মভাব। তুমি গো দেখ, লোষ্ট্র দেখ, নদী দেখ, তাহার মধ্যে ব্রহ্মভাব। তুমি স্নান কর, ভোজন কর, বা উপবেশন কর, তাহার মধ্যে ব্রহ্মভাব। মন যখন এইরূপ আর্য্য ঋষিদিগের নির্দ্দেশে যথাতথা ও যখন তখন অন্তর্জ্জগৎ নিহিত ব্রহ্মভাবের ন্যায় বহির্জ্জগতেও ব্রহ্মভাব দর্শন করিতে থাকিবে, তখন মনের ভোগ-ভূমি ফুরাইয়া আসিবে। তখন সে আপনা আপনিই নিজ নিকেতনে প্রতিনিবৃত্ত হইবে—শান্তিনিকেতনে সুধারাশি পান করিতে থাকিবে। কৃচ্ছ্র সাধন ব্যতীত আমাদের অশান্ত চিত্ত সহজে ভোগবিলাস হইতে বিমুখ হইতে চাহে না। আবার বিষয় বিলাসে বৈরাগ্য ব্যতীতও বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভবের দ্বিতীয় উপায় নাই। কৃচ্ছ্র ব্রত আদি সাধন সকলকে কুসংস্কার বলিয়া মনে রাখাও একটা কুসংস্কার।

গ্রহ নক্ষত্রের লগ্ন বিশেষে পবিত্র সমাগমকে যোগ বলে। এই

যোগোপলক্ষে গঙ্গা বা নর্ম্মদা, ত্রিবেণী আদিতে স্নানে করিলে শরীর ও মনের সাত্বিক সাধনানুকূল শক্তি সকলের বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মসুধাবিসলিপ্সু আর্য্যগণ অনুকূল উপায় সকলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ যোগ বা পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষ বিশেষ তীর্থ স্থানে মহাসমারোহ ও উৎসব হইয়া থাকে। গৃহকর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক তীর্থস্থানে ত্রিরাত্রি বা একমাস বা চিরকাল বাসের বিধি আছে। উৎসবকালে অন্ততঃ ত্রিরাত্রিও বাস করিবে। বিষয়-সম্পর্কশূন্য পবিত্র তীর্থস্থানে যদি বিষয়ী লোক ত্রিরাত্রিও বাস করে এবং তথায় স্নান, দান, পূজা, পাঠ, দেব-দর্শনাদি করিতে থাকে, তবে তাহার বৈষয়িক বৃত্তি ও ভোগ পিপাসা যে অন্তঃকরণ হইতে অনেক অপসারিত হইয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে তত্তৎ স্থানে অনেক পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। তাঁহাদিগের বিষয়-বৈরাগ্য-বিস্ফারিত আদর্শ দর্শনে তীর্থযাত্রিগণের মনে কি সাংসারিক ঔদাস্য উদয় হয় না? তাঁহাদিগের কষ্টসহিষ্ণু প্রকৃতির কঠোর তপোনুষ্ঠানের বিচিত্র চিত্র দর্শনে কি বিষয়ীর মনে বিলাস ভোগের প্রতি ধিক্কার হয় না? তাঁহাদিগের স্বর্গীয় জ্যোতিঃপরিপূর্ণ মুখারবিন্দ হইতে অমৃতমাখা ভগবদ্‌গুণানুবাদ ও জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিলে কি নিদ্রিত বিষয়ীর হৃদয় জাগরিত হয় না? তাঁহাদিগের প্রেমাশ্রুপূর্ণ ধ্যানস্তিমিত নেত্র দর্শন করিলে কি অন্ধতমসাচ্ছন্ন মানবের মনশ্চক্ষুঃ উন্মীলিত হয় না? বস্তুতঃ সর্ব্বদা বিষয়ভোগ বিলাসী গৃহস্থগণ তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকে। তাহারা গাত্র-মল-মার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মনোমালিন্য ধৌত করিবারও অনেক অবসর পায়। দেশ বিদেশ হইতে সমাগত বহুল লোকের সহিত সাধুভাবে মিলিতে সক্ষম হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভাব, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার অনেক পরিমাণে জানিবার সুযোগ হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশজাত শিল্প-চাতুরীর পরিচয়ও পাওয়া যায়।

তীর্থস্থানই আমাদের আশ্চর্য্য কৌশল-পূর্ণ মিলন ভূমি। যদি উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম সমগ্র ভারতকে একত্র দেখিতে চাও, তবে তীর্থস্থানে গমন কর। যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে চাও, তবে তীর্থস্থান দর্শন কর। যদি দেশ দেশান্তরের পণ্যবীথিকা ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী দেখিতে চাও, তবে তীর্থ দর্শন করিতে যাত্রা কর। যদি দেশোন্নতিকর কোন গুহ্য কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভারতের সর্ব্বদেশে প্রচার করিতে চাও, তবে তীর্থোৎসবে উপস্থিত হইয়া তাহা ঘোষণা কর। বর্ত্তমান কালে সুশিক্ষিত লোক সকল তীর্থোৎসবে উপস্থিত থাকা কুসংস্কার মনে করেন। কিন্তু আমরা বলি তীর্থস্থান শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই গুরুতর কার্য্যসাধনের লীলাভূমি। বক্তাগণ! পণ্ডিতগণ! দেশহিতৈষী বিচক্ষণগণ! মন্ত্রণানিপুণ উপদেষ্টাগণ! যদি ভারতে কোন প্রকৃত কার্য্যসাধন করিতে চাও, যদি এক ইঙ্গিতে ভারতকে উন্মত্ত করিতে চাও, যদি সমস্ত ভারত একত্র বদ্ধপরিকর হইয়া কোন কঠোর গুহ্য মন্ত্র সাধন করিতে চাও, তবে তীর্থস্থানে সমাগত হও। তীর্থোৎসবকে আর্য্যদিগের প্রতিভাকাল সুলভ ভাবে পুনর্নবীভূত করিয়া তোল। হরিহরক্ষেত্র, কাশী, প্রয়াগ, পুষ্কর, হরিদ্বার প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ সকলে যে মধ্যে মধ্যে পর্ব্বোপলক্ষে মহামেলা হইয়া থাকে, তত্তৎকালে কোন কোন গুরুতর বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য মহা মহা সভার আহ্বান করিবার জন্য, তাহার পূর্ব্ব হইতেই সংবাদপত্র সকলে ঘোষণা করা হউক। দেশদেশান্তর হইতে অশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত সকল লোক আসিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে সাধুভাবে সম্মিলিত হউন। পর্ব্বোৎসবের যথাবিহিত কার্য্য সমাপনান্তে সভা সকলের অধিবেশন হউক। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারোলে সভার গুরুতর উদ্দেশ্য ভারতের চারিদিকে বায়ুবেগে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ, রাজা মহারাজগণ, ও সাধারণ বিষয়িগণ আসিয়া তীর্থক্ষেত্রে একত্রিত হইতেন এবং ঋষিগণ নৈষ্কর্ম্ম্যে ভক্তি, জ্ঞান,

ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির অনেক উপদেশ দান করিতেন এবং তদ্দ্বারা ভারতের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইত। ভারতে পুনর্ব্বার তীর্থোৎসবের ভেরী বাজিয়া আবার ভারতকে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করুক। তীর্থোৎসব আবার ভারতের ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারের মহা-সমারোহ-ক্ষেত্র হউক। তীর্থোৎসব প্রকৃত কার্য্যভূমি হউক। তীর্থোৎসবে ভগবানের দিব্য আবির্ভাব দর্শন করিয়া সন্তপ্ত ভারতের প্রাণ পুনর্ব্বার সন্তৃপ্ত হউক।

এবমস্তু।

—o—

ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজন কি ?

যদি প্রত্যেক মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তুমি আপনার সাধ্যমত যত্ন সহকারে যে সকল কার্য্য করিতেছ, যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য সদা সত্বরপদে অগ্রসর হইতেছ, যে সকল কার্য্য সম্পাদনে স্বয়ং অপারগ বিবেচনায় অপরের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছ, যে সমুদয় কার্য্য সংসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সংকল্প সিদ্ধ করিতে না পারিলে তোমার অবসাদের সীমা থাকে না, যে সকল কার্য্য তোমার চিত্তরঞ্জন ও ফলদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে ও সুযোগ সংযোগে তদনুষ্ঠানে রত হইবে বাসনা করিতেছ, সেই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? তাহা হইলে বোধ করি প্রত্যেকেই স্ব স্ব সংকল্পের মূলানুসন্ধান করতঃ মুক্তকণ্ঠে এক বাক্যে এই বলিবেন যে আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সুখ, শান্তি, আনন্দ লাভ। ইহা ভিন্ন বোধ করি কেহই কোন কথা বলিতে অভিলাষ করেন না। জীবমাত্রেই সুখ চায়, শান্তি চায় ও আনন্দ চায়। যে সকল কার্য্যে যাহার অভীপ্সিত সুখ আনন্দাদি নাই সে কখনই তৎকার্য্যাচরণে প্রবৃত্ত হয় না। সুখ ও আনন্দলাভ লোলুপ হইয়া বিপুল বিত্ত বিভবের উপার্জ্জনোদ্দেশে কেহ উর্ব্বরক্ষেত্র প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে কর্ষণ করতঃ প্রচুর শস্যোৎপাদন লালসায় কৃষিকার্য্যের সমুন্নতি সাধন করিতেছেন, কেহ অর্ণবযানারোহণে একদেশ হইতে দেশান্তরে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা স্বার্থ সাধনের জন্য নদ নদী সাগর মহাসাগরাদি অতিক্রম করিতে নির্ভয় চিত্তে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ প্রভুপদ পরিসেবন-পরায়ণ হইয়া দাস্যবৃত্তিকে অবলম্বন করিতেছেন; কেহ কুসীদ লাভার্থ উত্তমর্ণ হইয়া, কেহ বা দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধনাহরণ করিতেছে। এইরূপ বিবিধোপায়ে ধন হইতে সুখ ও আনন্দ প্রাপ্তির আশায় অনেকেই আগ্রহ সহকারে যত্নপর হইয়া মনঃসংকল্প সাধনের বশবর্ত্তী হইতে-

ছেন। কেহ বা সুখী হইবার জন্য সামাজিক নানাবিধ মঙ্গলকর ও স্বীয় সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা যশোরাশি সঞ্চয় করিতেছেন; কেহ বা আত্মপ্রশংসায় এবং জ্ঞান লাভ ও জ্ঞান প্রচার দ্বারা সুখাশা করিয়া বিবিধ বিদ্যাবিশারদ হইবার মানসে দিবানিশি অধ্যয়নপরায়ণ থাকিয়া মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতেছেন; কেহ বা সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজসংস্কারে অবিরত রত হইতেছেন; কেহ বা সাধারণ জনসমাজে খ্যাত্যাপন্ন হইয়া অথবা পরোপকার সাধন দ্বারা পরমসুখলাভ করিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, রাজপথ নির্ম্মাণ, পান্থনিবাস প্রস্তুত, পুষ্করিণী খনন আদি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতেছেন; কেহ বা ধন, বস্ত্র ভূমি আদি দান দ্বারা পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয়ে পারলৌকিক সুখের প্রত্যাশায় কাল হরণ করিতেছেন; কেহ সুখী হইবার একান্ত বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদি বহুপরিবারে পরিবৃত থাকিতে স্থিরসংকল্প হইয়াছেন; কেহ বা আবার সেই সুখের জন্যই লোকসমাজ ত্যাগ করিয়া বিজন বাস বাসনা করিতেছেন; কেহ বা রূপলাবণ্যবতী যুবতী সমাগমে বাঞ্ছিত সুখের আশা করিয়া নৃত্য করিতেছেন; কেহ বা কামিনী পাণিপীড়নে বীতরাগ হইয়া চির কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন দ্বারা অশেষ সুখ শান্তি আনন্দের আশা করতঃ জীবন যাপন করিতেছেন; কেহ বা সুতাদির সুকুমার বদনারবিন্দ সন্দর্শন দ্বারা সুখাশা পূর্ণ করিবার মানসে প্রফুল্ল হইতেছেন; কেহ বা কুৎসিত ইন্দ্রিয়াদি জনিত ভোগ সুখই প্রার্থিত সুখ স্থির করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন; কেহ বা অঙ্গরাগ-লাবণ্য জন্য দেহের সৌকুমার্য্য ও মনোহর দৃশ্য পরম সুখকর বোধ করিতেছেন; কেহ বা বৃথা ক্রীড়ামোদ প্রমোদাদিই সুখদায়ক নিরূপণ করিয়া সদাই তাহাতে রত, ও কেহ বা সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে স্বীয় আধিপত্যের অধীন করিবার নিমিত্ত যমরাষ্ট্র-বিবর্দ্ধন প্রচণ্ড সমরানলশিখায় শত শত জীবের জীবন আহুতি দিতে

প্রবৃত্ত হইতেছেন। এইরূপ সকলেই কোন না কোন কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পরম পরিতোষের প্রত্যাশা করিতেছেন।

যদি এই অবকাশে সকলকেই জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাঁহারা কিরূপ সুখ প্রার্থনা করেন—ক্ষণকাল বা কিছুদিনের জন্য ? অথবা নিরবচ্ছিন্ন অনন্তকালের জন্য ? তাহা হইলে বোধ হয় "ক্ষণ জন্য" এ কথা কাহারও বদন বিবর হইতে বিনির্গত হইবে না।

সুখ দুই প্রকার। প্রথম, বিষয়ানুগত বা কারণিক, অর্থাৎ জাত পদার্থপুঞ্জ হইতে উদিত বা লব্ধ যে সুখ ; যথা—পুত্রমুখ দর্শনে সুখ, ধনলাভে সুখ, সম্মানলাভে সুখ, ইত্যাদি। দ্বিতীয়, বিষয়াতীত বা অকারণিক অর্থাৎ অজাত বস্তু বিশেষ হইতে প্রাপ্ত যে অপূর্ব্ব সুখ। প্রথম ও দ্বিতীয়বিধ সুখে প্রভেদ এই যে, যদি কোন সুখ কোন জাত বা সৃষ্টবস্তু হইতে উদয় হইয়া থাকে, তবে তাহা ক্ষণ বা কিছু দিনের জন্য ; কেননা তাহার বিনাশ আছে। কারণ সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই বিনশ্বর। সুতরাং তদনুগত সুখও বিনশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর। যথা, পুত্রমুখ দর্শনে সুখোদয় হইলে পুত্রের মৃত্যুতে দুঃখ সম্ভাবনা ; যদি ধনলাভে আনন্দ হয়, তবে ধনক্ষয়ে কখনই সুখের আশা নাই। অতএব যাবতীয় পদার্থানুগত সুখই চিরদিনের সুখ হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিষয়াতীত ব্রহ্মানুগত পরম সুখ ; এ সুখের অবচ্ছেদ, বা শেষ অথবা বিনাশ হইতে পারে না, কেন না, কার্য্যকারণাতীত, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের বিচ্ছেদ, অন্ত বা বিনাশ নাই। সুতরাং ভগবদানন্দের পরম সুখকরী অবস্থাই চিরন্তন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বিচার করা হইয়াছে যে অচিরস্থায়ী সুখের কেহই প্রত্যাশা করে না। অনন্ত সুখই সকলে চায়। সেই পরমানন্দই একান্ত প্রার্থনীয়, ইহাই সকলের চিরবাঞ্ছিত। এই সুখের জন্যই জীব লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাস করিতে পারেন যে, যদি সকল লোকেই সেই নিরবচ্ছিন্ন চিরন্তন সুখের আশাপথের যায়, তবে ক্ষণভঙ্গুর

বিষয়বিশেষে মনোনিবেশ করিয়া সামান্য সুখ রসাস্বাদন করিতে সকলের এত আগ্রহ দেখা যায় কেন ? এতদুত্তরে এইমাত্র বলিলেই বোধ করি প্রচুর হইবে যে, যদি কোন দেশ-কালের অবস্থানভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন দেশে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার কোন দ্রব্যবিশেষ ক্রয় করিবার আবশ্যকতা হয়, অথচ সে দেশের কোন স্থানে কাহার কাছে সেই দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা না জানে, তবে হয় তো সে ব্যক্তি বহুবার এরূপ স্থানে উপস্থিত হইবে যেখানে সে দ্রব্য পাওয়া সুকঠিন। এখানে তাহার অনভিজ্ঞতাই সেই অপ্রয়োজনীয় স্থান সমূহ পর্য্যটন করিবার একমাত্র কারণ বলিতে হইবে। যদি কোন সদয় হৃদয় ব্যক্তি তাহাকে তাহার উদ্দিষ্ট স্থানের নিদর্শন প্রদর্শন করেন অথবা সে আপনিই বহু অনুসন্ধানের পর অভীপ্সিত স্থান ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার পূর্ব্বগত স্থান সমূহে ভ্রমণ করা বৃথা হইয়াছে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে এবং তাহার আশার ফল-প্রাপ্তিতে সে অতুল সুখী হইবে। জীব মাত্রেই সেইরূপ চির প্রার্থিত পরম সুখ অনন্তকালের জন্য সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত একান্ত অনুসন্ধিৎসু হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু ঐ বাঞ্ছিত বস্তু কোথায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা জানিতে না পারিয়াই এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাহার অন্বেষণ করিতেছে। ধনেতে সেই বাঞ্ছিত সুখ পাওয়া যাইবে ভাবিয়া বিবিধ কার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে নিরত হইল, প্রাপ্ত অর্থে মনঃসন্তোষ পাইল না ; এজন্য বহু ধনের আশা বলবতী হইল, তাহাতেও মনোমত সুখ জন্মিল না, আরও ধন আবশ্যক বোধ হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যদি কেহ ভোগ্য বস্তুর চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তথাচ জীব তাহাতে অসীম অনন্তকালব্যাপী সুখ সমাগমে সমর্থ হইতে পারে না, কারণ সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই ইয়ত্তা আছে। হয় তো কেহ ভোগ্য বস্তুর সীমা না পাইয়াই কলেবর পরিহার করিল। বিবেচনা কর, যদি কোন ব্যক্তি চিরজীবীও

হয়েন, তথাচ বিবিধ ভোগ্য বিষয় হইতে তাঁহার মনের মত আনন্দ লাভের সম্ভাবনা নাই, কেননা ক্রমে ক্রমে একটীর পর আর একটী, এইরূপ সকল বস্তুরই চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াও কোন মতেই অভিলষিত ফললাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যত দিন মনের বিহার ক্ষেত্র রূপ জগদ্বস্তু-পরম্পরা অনুভূত হইবে, তত দিন সেই সকল ক্রমান্বয়ে ভোগ করিতে থাকিবে এবং উপস্থিত ও প্রাপ্ত বিষয়টীতে সুখ নাই ভাবিয়া ভবিষ্যৎ অপ্রাপ্ত বিষয়ে মন চালনা করিয়া সুখী হইবার আশা করিবে। অতঃপর তাবৎ ভোগ্য বিষয়ের সীমাবসান হইলে, আর উপায় নাই, কোথায় যাইবে; এত দিন ভোগ করিয়াও কৈ আশা পূর্ণ হইল না, সুখের সন্ধান মাত্রও পাওয়া গেল না, যাহার জন্য জীবন ক্ষীণ হইল, তাহার বিন্দু মাত্র আস্বাদ করিবার সুযোগ হইল না; কেবল লক্ষ্য বস্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতেই কাল অতিবাহিত হইল। এক্ষণে বিচার দ্বারা উত্তম প্রতীতি জন্মিতেছে যে, আমরা জগতীয় যে কোন বস্তু হইতেই আমাদের চিরবাঞ্ছিত সুখের আশা করি না কেন, কিছুতে আমাদের চিত্তক্ষেত্র বিচিত্র পবিত্রানন্দ-পয়োধি-প্রবাহে পরিপ্লুত হইবে না, কিছুতেই আমরা কার্য্যারম্ভ-শূন্য হইতে পারিব না, কিছুতেই আমাদের মন বসন্ত বায়ুবেগে বিবিধ কুসুমকিশলয়-কলাপের ন্যায় স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইবে না, কিছুতেই আমরা "আর কিছুই চাহিনা, পূর্ণকাম হইয়াছি," একথা মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে পারিব না, কিছুতেই আমরা বহুভোজনান্তে উদরপূর্ত্তি হইলে যেরূপ অমৃত দিলেও "আর প্রয়োজন নাই" বলি, সেরূপ চিরস্থির থাকিতে পারিব না, কিছুতেই আমরা বিপুলানন্দলাভের বাঙ্মনোবিচারাতীত চমৎকার গতি প্রাপ্তির আশাপাশ ছেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সেই সুখ, সেই আনন্দ ও সেই শান্তি জগদ্বস্তু বিষয়াতীত কোন অপূর্ব্ব, অদৃশ্য অচিন্ত্য পদার্থে স্থির ভাবে,

সূক্ষ্ম-ভাবে, উজ্জ্বল ভাবে, নির্ম্মল ভাবে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই আধারই সত্যসুখ-সুধা-সিন্ধু। সেই সিন্ধু সলিল বিন্দু মাত্র সেবনেই আমাদের চিরবাঞ্ছিত অশেষ ক্লেশবিশেষোপশমকারী সুখের উদয় হইতে পারে। সেই পরমানন্দ-পয়োনিধিতে অবগাহন করাই যে আমাদের জন্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ইহা সহজেই উপপন্ন হইল। ধর্ম্ম সেই অসীম সাগরে যাইবার পথ স্বরূপ। যিনিই সুখ-সিন্ধুনীরে স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেই এই পন্থানুসরণ করিতে হয়। ধর্ম্মপথে না চলিলে তথায় পৌঁছিবার উপায় নাই। ধর্ম্ম দুঃখ হইতে জীবকে সুখধামের অধিকারী করে, অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যায়, অন্ধকারপূর্ণ স্থানে জ্যোতিঃ প্রকাশ করে, এবং মর্ত্ত্য জীবকে অমৃতনিকেতন বাসের উপযুক্ত করিয়া দেয়। ধর্ম্মই একমাত্র পরম বন্ধু, মৃত্যু হইলেও জীবকে পরিত্যাগ করে না। অন্যান্য সমস্ত বস্তু শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গেই দূরে পলায়ন করে। সাধু চরিত্র সংগঠন দ্বারা ধর্ম্মের সহিত চির সৌহার্দ্য রক্ষা করা দেহী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সাধন দ্বারা জীব নিশ্চয়ই সুখ হইতে পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে, আনন্দ হইতে পরমানন্দ-ধামে বাস করিবে। হে জীব! যদি সুখ, শান্তি, আনন্দ চাও, তবে ধর্ম্ম সাধন কর। "ধর্ম্মাৎ পরতরন্নহি"—ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

—o—

ধর্ম্ম।

দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা সকলেরই। কিরূপে সুখ লাভ করিতে পারিব তদ্বিষয়ক যত্ন করা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। সুখ পাই বা না পাই, সুখ পাওয়া যাইবে বলিয়া মহাদুঃখ-দুর্ব্বিপত্তির জ্বালা মালায় প্রবেশ করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হয় না। কি অবস্থায় প্রকৃত সুখ হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। সুখ শব্দটী বস্তুতঃ কোন অবস্থার নাম অথবা একটী কাল্পনিক কথা, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই অবধারণ করিতে পারেন নাই। সুখের সমস্যা যেমনই কেন হউক না, সুখের আশায় নিবৃত্ত হইতে কাহাকেও এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। আপনার কল্পনার রেখায় অবস্থা বিশেষের চিত্র করিয়া লোকে সুখ অনুভব করিতে চায়, কিন্তু ললাটে জল-তিলকের ন্যায় ক্ষণ বিলম্বেই সেই সুখের সরস রেখা শুকাইয়া যায়। আমরা যখন যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন দুঃখের দুর্গন্ধ তাহার মধ্যে কিছু থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং চিত্ত সন্তৃপ্ত হইতে চাহে না, অবস্থান্তরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়। মনের এই দুর্দ্দম্য গতি কেহ কখনও রোধ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা যোগী বা মুক্তাত্মাগণ বলিতে পারেন, আমাদের মলিন মন তাহা কল্পনা করিতেও অসমর্থ। প্রকৃত সুখ কোন্ উদ্যানের প্রফুল্ল কুসুম, দুঃখের পরম নিবৃত্তি বস্তুতঃ কোন্ কানন আলো করিয়া আছে, মনের সম্পূর্ণ শান্তিরত্ন কোন্ সাগর-গর্ভে লুক্কায়িত, তাহা আমাদের বুদ্ধি নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হয় না।

গুরুজন-মুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রে পড়িয়াছি ও সংস্কার বশতঃই হউক বা অন্য কোন্ কারণেই হউক, ইহাই মনে ধারণা করিয়া রাখিয়াছি যে ধর্ম্মে সুখ ও অধর্ম্মে দুঃখ হয়। সুখ দুঃখের লক্ষণ কত লোকে কত কি করিয়াছেন তাহা লইয়া এক্ষণে বিচার করিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে যাহাতে তোমার সুখ বা দুঃখ হয়, তাহাতে যে আমারও সুখ ও

দুখ অনুভূত হইবে এরূপ নহে। অবস্থা, সময় ও কার্য্য-বিশেষে যেটি পরম সুখের কারণ বলিয়া বোধ হইল, সেইটীই আবার অবস্থান্তরে, সময়ান্তরে ও কার্য্যান্তরে পরম দুঃখ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং সুখের বা দুঃখের উপাদান চিরকাল আমার পক্ষে সমান থাকে না। আমি বালক কালে যাহাতে সুখী ছিলাম, যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে তাহাতে সুখ পাই না। সুতরাং সুখ অন্বেষণ করিতে গেলে প্রকৃত উপাদান চিনিয়া লওয়া আমার পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। ধর্ম্মে যে সুখ হয় তাহা কিরূপ সুখ, তাহা ধার্ম্মিকেই বলিতে পারেন। তাহাই যে প্রকৃত সুখ তাহা স্বীকার করিব কিরূপে? দুঃখের নিবৃত্তি যদি সুখ হয়, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুখ আছে, এ কথা স্বীকার করিতে সহসা অগ্রসর নহি। "ধর্ম্মের" মর্ম্মস্থলে আমরা এক্ষণে প্রবেশ করিব না, তবে লোকে যে সকল কার্য্যকে বা আচার ব্যবহারকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, আমরা তাহা লইয়াই বিচার করিব। শাস্ত্রে পড়িলাম, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে পরম সুখ, শাস্ত্রে আবার পড়িলাম দীনের প্রতি দয়া করা পরম ধর্ম্ম। অমনি সুখের লোভে লালায়িত হইয়া দুঃখীর প্রতি দয়া করিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম দয়া রূপ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে আমার দুঃখ নিবৃত্ত হইবে; কিন্তু কপাল-গুণে ফল বিপরীত হইল। পূর্ব্বে কেবল আমি আমারই দুঃখে কাতর ছিলাম, দয়ালু হইয়া দেশের দুঃখ ভাবিতে ভাবিতে পাগল হইয়া উঠিলাম। তখন আমারই মাত্র দুঃখ হইলে কাঁদিতাম, এখন তদ্ভিন্ন পরের দুঃখ দেখিয়াও কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম, অশ্রুধারার পরিমাণ বাড়িল। তখন একাকীর উদর-পূর্ত্তির জন্য ভাবিয়া আকুল হইতাম, এখন দয়ালু হইয়া লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখীর অন্ন-কষ্ট কিরূপে দূর হইবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইলাম। দুঃখ দুশ্চিন্তার আবেগ পূর্ব্ব অপেক্ষা বহু পরিমাণে বাড়িল। তখন একাকীর দুঃখ সম্বরণ করিতে পারিতাম না, এখন দয়ালু হইয়া—ধার্ম্মিক হইয়া—সুখলুব্ধ হইয়া দিবা-

প্রস্তরের ন্যায় অকূল দুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। আমার সাধারণ অবস্থায় আমার দুঃখের পরিমাণ এক বিন্দুমাত্র ছিল, ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া দুঃখের নদীর স্রোত বহিয়া গেল। দুঃখ নিবৃত্তি যদি আমার লক্ষ্য হয়, তবে ধর্ম্মের—দয়ার সেবা করিয়া তাহা পাইলাম কৈ? সত্য কথা বলা পরম ধর্ম্ম। সত্য কথা বলিতে লাগিলাম, হয়তো কত স্থানে বিষম বিপদে পড়িলাম, ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম, ভয় পাইলাম, বেদনা সহ্য করিলাম। কৈ সত্যে তো সুখ পাইলাম না। ধর্ম্মাত্মারা বলিবেন এখন না হয়, পরে সুখ পাইবে, ইহলোকে না হয় পরলোকে সুখ পাইবে। দৃষ্টার্থে যাহার ফল মিথ্যা হইল, অদৃষ্টার্থে তাহা যে সত্য হইবে তাহাতে বিশ্বাস কি? সত্যের জয়, সত্যের জয়, এই মহা নিনাদে কর্ণ কুহর বধির হইল। কিন্তু জাগ্রৎ চক্ষুর সম্মুখে শত সহস্র অসত্যের জয় হইয়া যাইতেছে। কালক্রমে বিজয় হইলে মনকে কি এইরূপ প্রবোধ দিয়াই সুখ অনুভব করিতে হইবে? রাজা যুধিষ্ঠির সত্যশীলতার জন্য চির দিন যাতনা সহ্য করিলেন, পরিশেষে সত্যের জয় হইল; কিন্তু এ জয়ে লাভ কি? এরূপ জয় কি কাহারও স্পৃহনীয়? সমস্ত দেশ ছারখার হইল, ভারত উচ্ছেদ-সাগরে ডুবিল, কতক গুলি বিধবা মাত্র অবশিষ্ট রহিল, এই অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের বিজয়-ভেরী বাজিল, এরূপ ভেরী নিনাদ বাস্তবিক কি প্রকৃত জিগীষুর প্রার্থনীয়? আর সত্য কথা কহিলেই যদি ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, তবে সুখলিপ্সু লোক কি ভরসায় সত্য কথা বলিবে? আর অধিক দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা বাড়াবাড়ি করিব না। দৃষ্টান্ত দুইটীর প্রকৃতি পাঠ করিয়াই ধর্ম্মাভিমানী লোকে বলিবেন যে, প্রথমে দুঃখভোগ না করিলে সুখ অনুভব হইবে কিরূপে? দুঃখ ভিন্ন যে সুখ লাভ করা যায় না, আমরা সে সুখ পাইবার পক্ষপাতী নহি। আমার কণ্ঠে মণি-বিজড়িত এক গাছি হার ছিল, বিস্মরণের কোপে পড়িয়া বোধ হইল যেন হার গাছটী হারাইয়াছি, চারিদিকে

উদ্বিগ্ন ভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, খুঁজিতে খুঁজিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, ভাবনায় ও ভয়ে মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎপরে অকস্মাৎ একবার কণ্ডুয়নচ্ছলে গ্রীবায় হাত পড়িল, দেখিলাম—হার আমার গলদেশেই লম্ববান, তখন আহ্লাদের সীমা রহিল না। রত্ন-মালা পাইয়া গদ্গদ চিত্ত হইলাম, সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। এইরূপ সুখ কি কেহই প্রার্থনা করেন? আমরা বলি, স্মৃতিশক্তি অবিচলিত থাকিলে এ অনর্থপাত হইত না, দুঃখও আসিত না। আবার হার পাইয়া সুখীও হইতে হইত না। অতএব একটী নূতন দুঃখের সৃষ্টি করিয়া তাহার শান্তিতে সুখ বোধ করা বস্তুতঃ সুখ নহে। দ্বিতল হইতে নিজ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ লাফাইয়া পড়িলাম, পা ভাঙ্গিয়া গেল, দুঃখে কাঁদিতে লাগিলাম, চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে যাতনার শেষ হইল, উল্লাসে পুলকিত হইলাম, আবার হাঁটিতে শিখিয়া বড় সুখী হইলাম। এইরূপ নিজ কৃত দুঃখের অবসানে সুখী হওয়া কি মনুষ্যের প্রার্থনীয় সুখ? আমরা বলি—প্রথমতঃ লম্ফদানের দুর্ব্বুদ্ধি না ঘটিলে এই দুঃখ বা সুখের অভিনয় দেখিতে হইত না। স্বয়ং খাত খনন করিলে—তাহাতে বর্ষার জল জমিল, তোমার পুত্র খেলিতে গিয়া ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গেল, তুমি তৎপর দিনই মৃত্তিকা দ্বারা খাত পূর্ণ করিয়া দিলে, বিপদের আশঙ্কা হইতে বাঁচিলে বলিয়া, এই পৌরুষে তোমার সুখ বোধ হইল। বস্তুতঃ এরূপ সুখরাশির মূল ভিত্তি দুঃখ; সুতরাং এ সুখ প্রকৃত সুখকর নহে। দয়ার কার্য্যও এই পদ্ধতির। তোমার বুদ্ধি চিকণ হইল, লোকের মতে তোমার মন নির্ম্মল হইল, অন্যের দুঃখ দেখিতে শিখিলে, করুণার উদ্রেক হইল, সেই দুঃখের একটী প্রতিকৃতি তোমার মনে পড়িল, অমনি তুমিও দুঃখী হইলে। সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য তোমার চেষ্টাও প্রবল হইল। যদি তুমি দান করিয়া তাহার উপকার করিতে পার, তাহার মলিন মুখ প্রসন্ন করিতে পার, তাহার দুঃখাপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার

অন্তঃকরণে নিপতিত তাহার দুঃখের প্রতিবিম্বটীও মুছিয়া যাইবে, তুমিও সুখী হইবে। আর মনের পটে লিখিয়া রাখিবে ও লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুখ হয়। বস্তুতঃ তোমার এই সুখ কি পূর্ব্বোল্লিখিত উদাহরণ-শ্রেণীর অনুগত নহে? বস্তুতঃ ধর্ম্মসাধনে সুখ (লোকে যাহাকে সাধারণতঃ সুখ মনে করে) হয় এ কথা কল্পনাপ্রসূত। নিজকৃত খাত-পূর্ত্তি করিতে করিতেই যদি জীবন ফুরাইয়া যায়, তবে মনুষ্য বস্তুতঃ সুখের সন্ধান করিবে কবে?

লোক-সমাজে দুর্ভাগ্যবশতঃ যেরূপ ধর্ম্মশিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে পরম দুঃখনিবৃত্তির উপায় দেখিবার অবসর অতি অল্প। বালক কালে আমাকে যত্ন করিয়া শিখাইলে, পিতা মাতা, ভাই ভগিনীকে আপনার বলিয়া বিবেচনা কর, শিক্ষার গুণে তাহাই সংস্কার হইয়া গেল। যৌবনে বিবাহ-কালে স্ত্রীকে আপনার করিতে শিখাইলে, পরে পুত্র কন্যাকে আপনার ভাবিতে বলিলে। আবার কিছু দিন বাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলে, পিতা মাতা কেহ কাহারও নহে, স্ত্রী পুত্র তোমার আপনার নহে। এই সকল কথা যখন শ্রবণ করিতে লাগিলাম, তখন মনে মনে বড় ক্ষোভ হইল। ভাবিলাম এই কথা বালক-কালে শিখাইলেই হইত। তাহা হইলে ইহাদিগকে আপনার বলিয়া এত দৃঢ় সংস্কার জন্মিত না, তখন অনায়াসে ছাড়িতে পারিতাম; এক্ষণে যদিও বা এরূপ অবস্থায় কেহ গৃহদ্বার ত্যাগ করিয়া যান, তিনি ভাবেন—ইহা পরম পুরুষকার সাধিত হইল, এরূপ ত্যাগের দিন তাঁহার জীবনের একটী আহ্লাদজনক ঘটনা। বস্তুতঃ এরূপ আহ্লাদও কি প্রোক্ত উদাহরণ-রাশির শ্রেণীভুক্ত নহে?

এইরূপ ভাবে সুখ সাধন করিবার জন্য ধর্ম্মের সেবা করিতে হয়, ইহা আমাদের বিশ্বাসবিরুদ্ধ। জন্ম জন্মান্তরে আমি ধারাবাহিক ক্রমে যে দুঃখরাশি ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহারই পরম নিবৃত্তি আমার

প্রার্থনীয়। নূতন দুঃখ রচনা করিয়া তাহার শান্তি-সুখ অনুভব করা আমার ধর্ম্ম-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। দয়া দ্বারা পরদুঃখ-বিমোচনে যে সুখ হয়, সেই সুখ লাভ করা দয়ার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রথমে আমি যে আপনার দুঃখ ভাবিতেছিলাম, পরের দুঃখ ভাবিতে গিয়া আমার সেই দুঃখ আর স্থান পাইল না, আমার দুঃখ নিবৃত্তি হইল, ইহাই দয়া ধর্ম্মের পরম ফল। যে দিন দেখিবে আমার স্বীয় দুঃখের জন্য আর আমার উদ্বেগ হয় না, সে দিন অন্যের দুঃখ দেখিয়াও আমার দয়ার সঞ্চার হইবে না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এইরূপে অসৎপ্রবৃত্তিরাশিকে সংহার করিয়া অবশেষে আপনারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। জ্ঞান-যোগিগণ ধর্ম্ম সাধন দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন, সুখে বা দুঃখে বিপদে বা সম্পদে আর বিচলিত হয়েন না।

এক্ষণে দেখিলাম আমাতে যে সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত দুঃখরাশির নিবৃত্তি করিবার ও ভবিষ্যৎ দুঃখরাশির প্রবেশ-পথ রোধ করিবার জন্য। কিন্তু ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল যদি শৈশব হইতেই দুর্জ্জয় দুঃখরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্ম-বৃত্তিনিচয় কোন কালেই নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিতে পারিবে না। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ বালকের উপনয়ন হইলেই—কার্য্য-চেষ্টা-কাল উপস্থিত হইলেই কার্য্য-ক্ষেত্র ও লোক-সমাজ হইতে অতি দূরে গুরুর আশ্রমে রক্ষা করিতেন। সেখানে বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলের সুগঠন, বল ও পুষ্টি হইত। অতঃপর গার্হস্থ্য আশ্রমে—সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান কালের আমাদিগের ন্যায়—দুর্ব্বলের ন্যায় সংসারের পদ তলে বিলুণ্ঠিত ও দুষ্ক্রিয়ার তাড়নায় বিড়ম্বিত হইতে হইত না। এখন সত্য কথা কহিয়া নির্য্যাতিত হইলে আমরা দুঃখাশ্রু বিসর্জ্জন করি, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুক্লেশে পড়িয়াও অম্লানবদন ও অক্ষুণ্ণ চিত্ত থাকিতেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা সুগঠিত ও

পূর্ণপুষ্টি-যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সত্যের রসাস্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের অপুষ্ট, দুর্ব্বল সত্যনিষ্ঠা লোভের সামান্য সংগ্রামে—সংসারের কটাক্ষ-তাড়নায় অভিভূত হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া থাকি সত্যে সুখ নাই, তাই মিথ্যা কথনে প্রবৃত্তি হয়। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল প্রকৃত রূপে পুষ্ট হইলে আমরা সাধারণতঃ যে ক্ষুদ্র সুখের জন্য ধর্ম্মের সেবা করি, ধর্ম্ম তৎপরিবর্ত্তে আমাদের আশাতীত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন; সঞ্চিত ও অনাগত দুঃখ-নিবৃত্তির—দুঃখ-সাগর-পারের সুদৃঢ় সোপান রচনা করিয়া দেন। ধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা প্রথমতঃ ধর্ম্মের সেবা করি না, বরং ধর্ম্মকেই আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখি। একে আমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল অপুষ্ট রহিল, আবার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় আমার কার্য্য করিতে লাগিল। সুতরাং ধর্ম্ম আমাকে পরম সুখ দিবেন কোথা হইতে? আমরা যেন যথোচিত ধর্ম্মের সেবা করিতে—ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ধর্ম্মকে পুষ্ট করিতে শিক্ষা করি। সামান্য সুখের জন্য যেন ধর্ম্মকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত না করি। ধর্ম্ম আমাদের কল্যাণপ্রদ হউন।

—o—

আর্য্যশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি, ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি, ধর্ম্মেণ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠং, তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি ইতি শ্রুতিঃ।"

ধর্ম্মই জগতের একমাত্র আশ্রয়। ধর্ম্ম দ্বারাই অধর্ম্ম বা পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। প্রজাপুঞ্জ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিবর্গেরই শরণাগত হয়। ধর্ম্মই সমস্ত পদার্থে সত্তার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত, অতএব ধর্ম্মই পরম সুহৃদ্ ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মগতপ্রাণ ঋষিগণ ধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যান করিলেও বস্তুতঃ বা কার্য্যতঃ বিশেষ মত-বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। ভগবদ্বাণী শ্রুতির পরামর্শেই সকলে নিজ নিজ ভাব ও ভাষায় ধর্ম্ম-বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

১। আর্য্যগুরু গুরু কহিয়াছেন, "বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসো গুণো মতঃ।" বেদাদিশাস্ত্র-বিহিত বিধানে অনুষ্ঠিত কর্ম্মজাত সুকৃতিরই নাম ধর্ম্ম।

উক্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম লৌকিক ও অলৌকিক দুই ভাগে বিভক্ত। লৌকিক, যথা—ভোজন, আচ্ছাদন, মৈথুন, শয়ন, গমন, শ্রবণ, ত্যাগ ইত্যাদি। অলৌকিক, যথা—বেদাদি শাস্ত্রবিহিত সন্ধ্যা বন্দন, পঞ্চ মহা যজ্ঞ, স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, তীর্থস্নান, দেবতা ও সদ্‌ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দান, গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার, উপবাস, ব্রত, দেবপূজা, হোম ও যাগাদি। এই লৌকিক ও অলৌকিক ক্রিয়াও আবার শাস্ত্রানুমোদিত 'বিধি' ও

করুন—স্নান ভোজনাদি লৌকিক ক্রিয়া হইয়াও 'বিধি' বিশেষ দ্বারা সময়ে সময়ে অধিকতর শুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। যথা—

"তুলা-মকর-মেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥"

সূর্য্য তুলা, মকর ও মেষ রাশিতে গমন করিলে (বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে) প্রাতঃস্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান-ফলে মহা-পাতকাদি বিনষ্ট হয়। আবার "অলৌকিক" ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও শাস্ত্রানুমোদিত নিষেধ-বাক্য অবহেলা করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। বিবেচনা করুন বেদবিহিত সন্ধ্যা বন্দন নিত্য অনুষ্ঠেয় অলৌকিক কর্ম্ম ('অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' ইতি শ্রুতিঃ), কিন্তু ইহার নিষেধ বাক্যও আছে, যথা—

"সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ ॥"

সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধদিনে সায়ং সন্ধ্যা করিবে না, করিলে পিতৃহত্যার পাতক হইবে।

অলৌকিক ক্রিয়াও আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, এই তিন ভাগে বিভক্ত। সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য, পুরশ্চরণাদি নৈমিত্তিক ও অগ্নিষ্টোম যাগাদি কাম্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

২। মহামুনি জৈমিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ লক্ষণ কহিয়াছেন, যথা, "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ বিহিত বিধি দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ফল-সাধনই ধর্ম্ম, আর নিষেধ-বিধি দ্বারা অনীপ্সিত ফল (নরক) সাধনই অধর্ম্ম।

৩। আর্য্যকুলভূষণ প্রভাকর এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা—

"যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিভিঃ।
তং ধর্ম্মং যং বিনিন্দন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥"

বেদজ্ঞ আর্য্যগণ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যাহা বিজ্ঞগণের নিকট প্রশংসিত হয়, মহাত্মাগণ তাহাকে "ধর্ম্ম" কহিয়াছেন এবং আর্য্যগণ যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাই 'অধর্ম্ম' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪। মহাভারতে ধর্ম্মের স্বরূপ এইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্মকঃ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ (সত্যবিক্রম !)॥"

যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরের বিরোধী, তাহা 'ধর্ম্ম' নহে, উহা অসদ্ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য এবং যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরোধ করে না, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

চেষ্টা, বাক্য ও মন দ্বারা কাহারও অনিষ্ট না করা, অন্যের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং দান, ইহাই সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম।

৫। পদ্মপুরাণে ধর্ম্মের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"পাত্রে দানং কৃষ্ণে মতির্ম্মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।
শ্রদ্ধা বলি গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

সৎপাত্রে (বিদ্যাবান্, জ্ঞানবান্, পরোপকারী, ধর্ম্মাত্মা পীড়িত, দরিদ্র আদিকে) দান, ভগবচ্চরণারবিন্দে একান্তানুরাগ, মাতা পিতার সেবা, মহাত্মা ও দেবাদিতে শ্রদ্ধা, বলি বৈশ্বদেবকর্ম্ম, এবং গোগ্রাস প্রদান—এই ছয়টী ধর্ম্মের লক্ষণ।

মনু বলিয়াছেন যথা—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম॥"

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, নির্ম্মল বুদ্ধি, তত্ত্ববিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

মৎস্যপুরাণে ধর্ম্মের মূল সম্বন্ধে লিখিত আছে, যে—

"অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্॥"

অবিরোধ, অলোভ, বহিরিন্দ্রিয়-সংযম, জীবের প্রতি দয়া, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অনুক্রোশ, ক্ষমা ও ধৃতি এই দশটী সনাতন ধর্ম্মের মূল।

পদ্মপুরাণে ধর্ম্মের অঙ্গ কথিত হইয়াছে। যথা—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ॥
অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে।
এতৈর্দ্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব সুসূচয়েৎ॥"

ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপস্যা, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, শান্তি ও অস্তেয় এই দশবিধ অঙ্গ-সৌষ্ঠবযুক্ত হইলে ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়েন।

৬। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি জঞ্জালপূর্ণ ও ক্লেশ বিপত্তিসঙ্কুল সংসারে সদাই নির্ভয় ও সুখী; কেননা ধর্ম্মসাধন বলে তাঁহারা সমাগত বিপত্তি রাশিকেও সানন্দ অন্তঃকরণে তুচ্ছ করিতে সমর্থ। শোক, ঋণ, মৃত্যু আদি তাঁহারা ত্রিভুবনের একমাত্র আশ্রয় ভগবানের চরণসেবায় মন,

প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রসন্নবদন দর্শন করিলে, তাঁহাদের জ্ঞানামৃতমৃক্ষিত বাণী শ্রবণ করিলে, তাঁহাদের পরহিতসাধিনী রীতি নীতি ও হৃদয়ের বল, সৎসাহসাদি স্মরণ করিলে, তাঁহাদিগকে যেন অন্য রাজ্যের প্রজা বলিয়া বোধ হয়। যখন তাঁহারা সেই সুখ-রাজ্যের সমাচার সকল লোক-সমাজে প্রচার করিতে থাকেন, তখন মূঢ়গণ তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, পাপাত্মাগণ উহা দুঃসহ বিবেচনা করিয়া কর্ণপাত করিতে অগ্রসর হয় না, বিশ্বাসী, ভক্ত ও সাধকগণই কেবল দলে দলে সমবেত হইয়া সেই সমাচারের অমৃতধারা পান করিয়া থাকেন। যিনি এই সুমধুর সুধার বিন্দুমাত্র পান করেন, তাঁহারও জীবন সফল হয়। তিনিও সেই ব্রহ্মাদি-পরীক্ষিত আনন্দ-ধামে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পাপ, তাপ, ক্লেশ, জন্ম, জরা, মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া যিনি সুরগণসেবিত সুখ-নিকেতনে যাইতে চাহেন, ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র পথ। ধর্ম্মই মনুষ্যের চিরদিনের প্রকৃত সহায়, ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃত বন্ধু, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে আর কোন বিপদই ভোগ করিতে হয় না। এতদর্থে মনু কহিয়াছেন, যথা—

"নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥"

হে জীব! পিতা, মাতা, দারা, জ্ঞাতি আদি কেহই পরলোকে সহায় হয়েন না, কেবল ধর্ম্মই সহায় হইয়া থাকেন।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সুহৃৎ। (কেননা যিনি বিপৎকালে সহায়তা করেন তিনিই বন্ধু। মৃত্যু অপেক্ষা জীবের আর কি মহা-বিপদ্ হইবে!

সে সময়ে জীবের যাতনা, ভয়াদি নিবারণ জন্য ধর্ম্ম ভিন্ন আর কে অগ্রসর হইয়া থাকে,) ধর্ম্ম মৃত্যুর পরেও সহগামী হয়েন। অন্যান্য সকলই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়।

"একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতং॥"

জীব একাকীই নিজ কর্ম্মানুসারে উৎপন্ন হয়, একাকীই লয় প্রাপ্ত হয় এবং একাকীই আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিয়া থাকে।

"তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্॥"

অতএব জীব! আপনার শেষ দিনের ও চিরদিনের সহায়তার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম সহায় থাকিলে, দুস্তর অন্ধকার (নরক যন্ত্রণাদি) উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

বিষয়-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া, ষড়্‌রিপুর ষড়্‌যন্ত্রে অন্ধ হইয়া, অজ্ঞানের কুচক্রান্তে আত্মবিস্মৃত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধির পরামর্শে ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিও না। মহাভারতে লিখিত আছে, যে—

"ন ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে।
অশ্রদ্দধানা ধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥"

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া, যাহারা সাধুগণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা নিঃসংশয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"যে তু ধর্ম্মানসূয়ন্তে বুদ্ধিমোহান্বিতা নরাঃ।
অপথা গচ্ছতাং তেষামনুযাতাপি পীড্যতে॥"

যে সকল মোহান্ধ ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে; তাহারা স্বয়ং অপথগামী হয় এবং যাহারা তাহাদের অনুগমন করে তাহারাও পীড্যমান হইতে থাকে।

আর্য্যশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ ও শ্রুতি বারম্বার উচ্চ ও গম্ভীর নিনাদে জীবকে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ কল্যাণ লাভের জন্য সৎপরামর্শ ঘোষণা করিতেছেন—জীব! অমনোযোগী ও অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিজ সুখের কণ্টক বিস্তার করিও না। বৃথা সময়ও নষ্ট করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইও না। বাল্যকালে বা যৌবনকালে ধর্ম্মসাধন না করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় করিবে, এ ভাবনা পরিত্যাগ কর। কেননা—

"ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
নচাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদা হি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে॥"

মৃত্যু মনুষ্যের সময়াসময় প্রতীক্ষা করে না, অতএব মনুষ্যের ধর্ম্ম-সাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। মনুষ্য যখন সদাই মৃত্যুমুখে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সময়েই শোভা পায়।

এক্ষণে কোন্ জাতির কিরূপ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ কিরূপ ধর্ম্মসাধন করিলে সকলেই কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে, আমরা বামন-পুরাণের সাহায্য লইয়া তত্তাবৎ ধর্ম্মাত্মা পাঠকগণের বিদিতার্থ ও কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া অবসর গ্রহণ করিব। জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্ম বিভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক প্রকৃতির ধর্ম্ম অন্য প্রকৃতিস্থ জীব অনুষ্ঠান করিলে, তাহাতে কোন ফললাভ হয় না, বরং তাহাতে প্রত্যবায় দৃষ্ট হয়।

দেব ধর্ম্ম।

দেবানাং পরমো ধর্ম্মঃ সদা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাধ্যায়বেদবেত্তৃত্বং বিষ্ণুপূজারতিঃ স্মৃতঃ॥

নিরন্তর যজ্ঞাদি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, বেদার্থ মর্ম্মের অনুধ্যান, বোধ ও অনুশীলন, বিষ্ণুপূজায় একান্ত অনুরাগ, এই কয়েকটী বৃন্দারকবৃন্দের পরম ধর্ম্ম।

দানব ধর্ম্ম।

দৈত্যানাং বাহুশালিত্বং মাৎসর্য্যং যুদ্ধসৎক্রিয়া।
বিন্দনং নীতিশাস্ত্রাণাং হরভক্তিরুদাহৃতা॥

বাহুযুদ্ধ, মাৎসর্য্য, যুদ্ধে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান (সমরনীতির বহির্ভূত অবৈধ যুদ্ধ না করা), নীতি শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ এবং কৈলাশপতি মহাদেবের প্রতি ভক্তি—এই কয়েকটী দৈত্যদিগের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধধর্ম্ম।

সিদ্ধানামুদিতো ধর্ম্মো যোগযুক্তিরনুত্তমা।
স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মবিজ্ঞানং ভক্তির্দ্বাভ্যামপি স্থিরা॥

উৎকৃষ্ট যোগাদিতে স্থিরমতি, বেদাধ্যয়ন, বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান, হরি ও হর উভয়েতেই সমান অচলা ভক্তি এতাবৎ সিদ্ধগণের ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

গান্ধর্ব্বধর্ম্ম।

উৎকৃষ্টোপাসনং জ্ঞেয়ং নৃত্যবাদ্যেষু বাদিতা।
সরস্বত্যাং স্থিরা ভক্তি গান্ধর্ব্বো ধর্ম্ম উচ্যতে॥

উৎকৃষ্টরূপ নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা এবং সরস্বতীতে অচলা ভক্তিই গন্ধর্ব্বগণের পরম ধর্ম্ম।

বিদ্যাধর ধর্ম্ম।

বিদ্যাধরত্বমতুলং বিজ্ঞানং পৌরুষে মতিঃ।
বিদ্যাধরাণাং ধর্ম্মোহথ ভবান্যাং ভক্তিরেব চ॥

বিদ্যা ও বিজ্ঞান-শিক্ষাতে ঐশ্বর্য্যলাভ জ্ঞান, দৈব অপেক্ষা পৌরুষেই অধিক প্রীতি এবং ভবানীতে (শক্তিতত্ত্বে) ভক্তি—এই সমস্তই বিদ্যাধর-দিগের ধর্ম্ম।

কৈম্পুরুষ ধর্ম্ম।

গান্ধর্ব্ব-বিদ্যাবেদিত্বং ভক্তিঃ স্থাণৌ তথা স্থিরা।
কৌশল্যং সর্ব্বশিল্পেষু ধর্ম্মঃ কৈম্পুরুষঃ স্মৃতঃ॥

গান্ধর্ব্ব বিদ্যাতে দক্ষতা, দেব-প্রতিমাদিতে অচলা ভক্তি, এবং সর্ব্বপ্রকার শিল্পনৈপুণ্য কিম্পুরুষদিগের ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পৈতৃক ধর্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্যমমানিত্বং যোগাভ্যাসে রতির্দৃঢ়া।
সর্ব্বত্রে কামচারিত্বং ধর্ম্মোহয়ং পৈতৃকঃ স্মৃতঃ॥

সদাশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, নিরভিমানিত্ব, যোগাভ্যাসে দৃঢ় অনুরাগ, এবং সর্ব্বত্র ইচ্ছামত আচার বা বিচরণ শক্তি—এই গুলি পিতৃগণের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আর্য্যধর্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্যং যতাশিত্বং জপ্যজ্ঞানঞ্চ রাক্ষস।
নিয়মা ধর্ম্মবেদিত্বমার্ষং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

ব্রহ্মচর্য্য, আহার-সংযম, জপ্য তত্ত্বের জ্ঞান, নিয়ম সকলের বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মজ্ঞতা, এতাবতই ঋষিগণের ধর্ম্ম।

মানব ধর্ম্ম।

স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ দানং যজনমেব চ।
অকার্পণ্যমনায়াসং দয়াহিংসা ক্ষমাদয়ঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ত্ব শৌচঞ্চ মাঙ্গল্যং ভক্তিরুচ্যতে।
শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাং ধর্ম্মোঽয়ং মানবঃ স্মৃতঃ॥

বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য বা সদা শুদ্ধাচার, উপযুক্ত ও অভাবযুক্ত ব্যক্তিকে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, বিদ্যা, জ্ঞানাদি দান, যাগযজ্ঞ ব্রত হোমাদির অনুষ্ঠান, অকার্পণ্য, দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচাচার, মাঙ্গল্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, শঙ্কর, ভাস্কর ও দেবীতে ভক্তি—এই সমস্তই মানবদিগের পরমধর্ম্ম।

গুহ্যক ধর্ম্ম।

ধনাধিপত্যং ভোগানি স্বাধ্যায়ং শঙ্করার্চ্চনং।
অহঙ্কারমশৌচঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং গুহ্যকেম্বিতি॥

ধনাধিপত্য, সুখসেব্য দ্রব্যাদিভোগ, বেদপাঠ, শিবপূজা, অহঙ্কার ও অশৌচ গুহ্যকগণের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

রাক্ষস ধর্ম্ম।

পরদারাভিমর্ষিত্বং পরার্থেঽপিচ লোলুপা।
স্বাধ্যায়স্ত্র্যম্বকে ভক্তির্ধর্ম্মোঽয়ং রাক্ষসঃ স্মৃতঃ॥

পরদারাভিমর্ষণ, অন্যের জন্যই হউক বা আপনার জন্যই হউক, সকল বিষয়েই লালসা, বেদাধ্যায়ন, ও মহাদেবে ভক্তি রাক্ষসদিগের ধর্ম্ম।

পৈশাচ ধর্ম্ম।

অবিবেকস্তথাজ্ঞানং শৌচহানিরসত্যতা।
পিশাচানাময়ং ধর্ম্মঃ সদাচামিষগৃধ্নুতা॥

অবিবেকতা, অজ্ঞান, শৌচহীনতা, অসত্যতা, এবং সদা আমিষ ভক্ষণে একান্ত তৃষ্ণা—এইগুলি পৈশাচ ধর্ম্মের লক্ষণ।

এক গঙ্গাই যেমন গঙ্গোত্রী, গোমুখী হরিদ্বার, ত্রিবেণী আদিতে ভিন্ন ভিন্ন মহাত্ম্যযুক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এক ধর্ম্মই দেব, দানব, মানবাদির দেহ ও প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।

ধর্ম্ম সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধান ও কুশল রক্ষা করুন।

একটী সার কথা।

কোন নব্য সভ্য নৌকারোহণে গমন করিতেছিলেন। তিনি নভোমার্গে নেত্রপাত করিয়া নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাবিক! তুমি জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিদিত আছ? নাবিক বলিল, মহাশয় আমি উহার নামও জানি না। এতাবচ্ছ্রবণে বাবু বলিলেন, তবে তোমার জীবনের এক চতুর্থাংশ বৃথা ব্যয়িত হইয়াছে। নদীর উভয় তীরে হরিদ্বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের শোভা সন্দর্শন করিয়া বাবু পুনঃপ্রফুল্ল মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাবিক! তুমি উদ্ভিদ্ বিদ্যা জান? নাবিক উত্তর করিল, না মহাশয়! তাহাতে বাবু বলিলেন, তবে তোমার জীবনের আর এক চতুর্থাংশ বৃথা বিনষ্ট হইয়াছে। ক্ষণ বিলম্বে নদীর প্রবল বেগবতী গতি দর্শনে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, নাবিক! তুমি গণিত জান? নাবিক বলিল, আমি কোন শাস্ত্রই জানি না। ইহা শুনিয়া বাবু বলিলেন, তবে তোমার জীবনের চারি ভাগের তিন ভাগ অনর্থক ক্ষয় হইয়াছে। এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে একটী প্রবল ঝড় উঠিল, নৌকা জল-মগ্ন-প্রায়, নাবিক জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল ও সাঁতার দিতে দিতে বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সাঁতার জান কি? বাবু বলিলেন না। নাবিক বলিল তবে দেখিতেছি তোমার সমস্ত জীবনই বৃথা বুঝি বিনষ্ট হইল। তুমি শীঘ্রই ভগবান্কে স্মরণ করিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হও।

যে সকল বিদ্যা মনুষ্যকে মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে পারে না, তাহা শিক্ষা করিয়া অভিমান ও অহঙ্কার করা বৃথা ও মূর্খতা মাত্র। যে পরা বিদ্যা অভ্যাস পূর্ব্বক সাধুগণ সন্তরণ দ্বারা অগাধ গম্ভীর ভব-নদীর প্রবল স্রোত অতিক্রম করিয়া পাপ-তাপ, শোক, রোগ, মৃত্যু আদি হইতে নিস্তার পান, তাহাই সকলের শিক্ষণীয়া।

——০——

ভারতোদ্ধার।

সোনার ভারত মলিন হইল! উৎসব-পূর্ণ গৃহ আজ আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল! ভারতের বিজয়পতাকা প্রবল বায়ুতাড়নায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, এক্ষণে তাহার চিহ্নও আর দেখা যায় না। নির্ম্মল নীল নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্বল্লীবিজৃম্ভিত ঘন ঘোর মেঘমালা উদয় হইয়া ভারতকে ভয়াকুল করিয়া তুলিল। পরিমলামোদিত কুসুম-কাননে পূতিগন্ধকর পতঙ্গ-পুঞ্জ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। রাজ-প্রাসাদ প্রেত-মণ্ডলীর উপদ্রবে বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিল। তরুণ অরুণ প্রভাপ্রফুল্লিত উষা দেবীর বিকশিত বদন কুজ্‌ঝটিকায় বিবর্ণ করিয়া ফেলিল। বিশ্ব-মনোহর পূর্ণ শশধর রাহুগ্রস্ত হইল। অভ্রভেদী বিন্ধ্যাচলশিখর ভূমিতে অবনত হইয়া রহিল। ভারত বীরদর্পে নিজবিজয়-শঙ্খ বাজাইয়া জগৎকে জাগরিত করিতেছিল, কোন্ অলক্ষিত দিক্ হইতে ভারতের বিশাল বক্ষে একটী বিষমৃক্ষিত বাণ আসিয়া বিদ্ধ হইল, ভারত অকস্মাৎ অবসন্ন মূর্চ্ছিত ও মৃতবৎ ভূমিতে পতিত হইল। ভারতের কণ্ঠরোধ ও হস্তপদ প্রসারণ সঙ্কোচনাদি শক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। নেত্র নিমীলিত, শরীর স্পন্দন শূন্য, নিশ্চেষ্ট ও অসাড়। ভারত স্তম্ভিত হইয়া তুমুল বিপ্লব সঙ্কুল সংসারারণ্যে ধরায় শয়ন করিয়া রহিল। ধমনীতে এখনও রক্ত সঞ্চলিত হইতেছে, শ্বাস-বায়ু এখনও নাসারন্ধ্রে যাতায়াত করিতেছে, প্রাণ বহির্গত হয় নাই। জীবনের আশা ত্যাগ করিবার এখনও সময় হয় নাই। ভারতের মরণাশঙ্কা নাই। আর্য্য ঋষিগণ ভারতকে অমৃত পান করাইয়া অমর করিয়া গিয়াছেন, ভারতের প্রাণ মজ্জাগত হইয়া আছে, ভারত মূর্চ্ছিত হইয়াছে, মৃত হয় নাই। কিঞ্চিৎ শুশ্রূষা করিলেই ও উপযুক্ত ঔষধ দান করিলেই ভারত আবার সংজ্ঞালাভ করিবে, ভারত আবার পূর্ব্ববৎ বীরবেশে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত জগৎকে নিজগুণে অবাক্ ও বিমোহিত করিতে

পারিবে। অহো! বৃদ্ধ মুমূর্ষু ভারতের কি কেহ শুশ্রূষু সন্তান জীবিত নাই! চিরমঙ্গল-কোলাহল কূজিত ভারত নিকেতন কি আজ জনশূন্য হইয়াছে। ভারতের কৃতজ্ঞ সন্তানগণ কি এক্ষণে ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! আহা! ভারতের এই বিপত্তিসাগরের কাণ্ডারী হরি এক্ষণে কোথায়! দেখ দেখ নাথ! তোমার চিরসেবক ভারত আজি নিরাশ্রয় নিঃসহায় হইয়া ধরাতলে পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতের মণিমুক্তা-মণ্ডিত মুকুট আজ ধূলায় ধূসরিত, অভেদ্য বর্ম্ম অঙ্গস্খলিত, অসীচর্ম্ম করকমলচ্যুত হইয়াছে, কটীবন্ধন খুলিয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে হরি! তুমি ভিন্ন আর কে ভারতের জীবন রক্ষা করিবে। তুমিই এই বিপদ্ কালে কৃপাবলে ভারতের উদ্ধার কর। দেখ নাথ! প্রতাপশীল ভারতের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া ভারতলক্ষ্মী একাকিনী বিজনবনে বসিয়া সকরুণস্বরে রোদন করিতেছেন। ইঁহার সে বেশ, সে ভূষণ, সে লাবণ্য, সে মাধুর্য্য নাই। ইঁহার কটাক্ষ মাত্রেই ত্রিভুবন মোহিত হইত, আজ সেই ভারতলক্ষ্মীর রোদন-ধ্বনি কি কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না? ইঁহার নয়নাশ্রু মোচন করিবার কি একটিও উপযুক্ত সন্তান নাই! শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দ ব্যাকুল ভাবে ভারতোদ্ধারে যত্ন করিতে যাইতেছ, যাও! তোমাদের উদ্যম দেখিয়া অনেক আশা হইতেছে, কিন্তু দেখো যেন তোমরা নিজ নিজ জ্ঞান ও বিদ্যাভিমানে অভিভূত হইয়া ভারত-শুশ্রূষু আর্য্যগণের উপদেশ রাশি অবহেলা করিয়া যথেচ্ছা-চারে প্রবৃত্ত হইও না, তাহা হইলে তোমাদের আশা পূর্ণ হওয়া সুকঠিন হইবে। বিচক্ষণ পরিণাম-বিবেকিবর্গের পরামর্শ না লইয়া কোন বিষয়ে অকস্মাৎ হস্তক্ষেপ করিও না। অনেক বিষয় তোমাদের আশু-প্রীতিকর বোধ হইবে, কিন্তু যদি তাহার পরিণাম শুভফলপ্রসূ না হয়, তবে ক্লেশ হইলেও তাহা অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবে। যদি মুমূর্ষু ভারতের মঙ্গল চাও, তবে শান্ত, ধীর, বিচারশীল হও, দেশকাল পাত্রের অবস্থা পর্য্যা-

লোচনা কর। শুষ্ককণ্ঠে একবারে অধিক জল দান করিও না, অকস্মাৎ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। আর্য্যগণের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, তাঁহারা তোমাদিগকে ভারতোদ্ধারের উপায় বলিয়া দিবেন।

আর্য্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মহাশয়গণ! আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া কি ভাবিতেছেন? ভারতের বিপৎপাত কি আপনাদিগের হৃদ্গত হয় নাই? ভারতলক্ষ্মীর কাতর কণ্ঠস্বর কি আপনাদিগের শ্রুতিবিবরে এখনও প্রবেশ করে নাই! ভারতের দুর্দ্দশা কি আপনাদিগের চক্ষুর্গোচর হইতেছে না! বাল্মিকী, ব্যাস, বশিষ্ঠ, জৈমিনি, জাবালি, জনক, ভৃগু, ভার্গব, ভরদ্বাজ, মনু, মার্কণ্ডেয়, কপিল, কশ্যপ, কণাদ, শুক, সমীক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামনাগণ যে ভারতের কল্যাণ জন্য বিবিধ শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, আপনারাই তত্তাবতের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্য সাধন-জন্য এতাবতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আপনারাও তাঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, জ্ঞান আদি সাধারণ্যে প্রচার দ্বারা ভারতের কল্যাণ বিধান করুন। কেবল মাত্র কয়েকটী ছাত্রকে ব্যাকরণের ছল, আভিধানিক কূটার্থ, "ঘটত্ব" "পটত্ব" ইত্যাদি বুঝাইয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না। আর্য্যগণ আপনাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগের অমূল্য রত্ন রাশিরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের পূর্ণাধিকারী করিয়াছেন। দেখিবেন যেন আপনারা আলস্য বা ঔদাস্য বশতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কোনরূপ ক্রটী করিয়া ভারতের কল্যাণ হানি করতঃ ভারতের পরম পূজনীয় আর্য্যগণের সম্মান লাভে বঞ্চিত না হন। তাহা হইলে পরম পবিত্র আর্য্যনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। যাহাতে দেশে দেশে ভারতের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত নীতি ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রতিগৃহ নিবিষ্টচিত্ত হয়, তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিয়া ভারতোদ্ধারের উপায় বিধান করুন।

রাজ্য ও ধর্ম্মের উপযুক্ত রক্ষয়িতা, নারায়ণ যুগে যুগে ভূপতিগণের হস্তে ধর্ম্মরক্ষার ভারার্পণ করিয়া অবনীমণ্ডলের, সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আপনাদিগের মনোযোগ, উৎসাহ, উদ্যম না থাকিলে ভারতে ধর্ম্ম প্রচারের ও ভারতীয় কল্যাণ সাধনের অত্যন্ত বিঘ্ন হইবে। অর্থাদি দান দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারাদি কার্য্যের পথ পরিষ্কার করুন। নীতি প্রচার দ্বারা প্রত্যেক প্রজার অন্তঃকরণে বিশুদ্ধভাব আরোপণ করিয়া দিন। আর্য্যগণ রাজাকে নারায়ণাংশজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, অতএব আপনাদিগের যত্নের উপরই ভারতের ভাবী মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। এই দুরবস্থ ভারতের মুখের দিকে যদি একবার আপনারা না চাহিবেন, তবে আর কে এই বিপদে সহায় হইবে। বিধিমতে সহায়তা করিয়া ভারত-লক্ষ্মীর অশ্রুমোচন করুন। ভারতলক্ষ্মীকে আবার ভারতের রত্ন সিংহাসনে বসাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া ভারতকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।

—o—

শুভাশুভ কর্ম্ম।

মনুষ্য মাত্রেই কর্ম্ম-প্রিয়। প্রগাঢ় নিদ্রিতাবস্থা ভিন্ন আমরা কর্ম্ম পাশ ছেদ করিতে পারি না। কায়া দ্বারা ও বাক্য দ্বারা যখন কোন কার্য্য করি, তখনই অন্যে আমাদিগকে ক্রিয়াশীল দেখিতে পায়, অন্যথা বা অলসভাবে বসিয়া থাকিলে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া থাকে। কিন্তু তখনও আমরা বস্তুতঃ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। সে সময় সংকল্প জাল বিস্তার পূর্ব্বক মনে মনে কত শত কার্য্য করি তাহা গণনা করা যায় না। মনুষ্যের মন যখন নির্ম্মল ও ব্রহ্মভাবে সমাহিত হয়, তখনই কেবল ক্রিয়াশূন্য হইতে পারে।

আমরা যখন যে কোন কার্য্য করি, তন্মধ্যে কোনটী সৎ ও কোনটী অসৎ। সৎকর্ম্ম শুভ ফল-প্রসূ ও অসৎ কর্ম্ম অকল্যাণকারী।

"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবং।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥"

মনঃ, বাক্য ও শরীর কৃত কর্ম্মজাল শুভ ও অশুভ ফলোৎপাদন করে। তদনুসারে মনুষ্য উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

"পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥"

পর দ্রব্যে অভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা, ও বিপরীত বুদ্ধি, এই ত্রিবিধ মানসিক কর্ম্ম অশুভ জনক।

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥'

অপ্রিয় বাক্য, অসত্য কথা, পরদোষাবিষ্কার, অসম্বদ্ধ প্রলাপ—এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক কর্ম্ম অশুভকর।

"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥"

অদত্তধন গ্রহণ, শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ হিংসা, ও পরদারাভিমর্ষণ এই তিনটি শারীরিক কার্য্য অশুভ ফলপ্রসূ।

অতএব মনুষ্য মাত্রেরই নিজ নিজ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলার্থ এই অকল্যাণকর কার্য্য সকল যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্বিপরীতাচরণ দ্বারা জীবের সদ্গতি হইয়া থাকে। কর্ম্ম করা স্বল্পায়াস-সাধ্য বটে, কিন্তু কিয়দ্দিবস পরেই দেহ বিনষ্ট হইলেও কর্ম্মফল জীবকে পরকাল পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করিবে। এজন্য যাহাতে চিত্তের তনুতা ও নির্ম্মলতা জন্মে, সেই পরমার্থকর কার্য্যে মনোনিবেশ করা বিধেয়।

"অনন্তং কর্ম্মশৌচঞ্চ তপো যজ্ঞস্তথৈবচ।
তীর্থযাত্রাদি গমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥"

যে পর্য্যন্ত জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি যত্ন পূর্ব্বক বিধিবোধিত অনন্ত কর্ম্ম, শৌচ, তপ, যজ্ঞ ও তীর্থযাত্রাদি এই সকল চিত্তশুদ্ধি জনক কার্য্য করিবেন।

শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অশুভ কর্ম্ম রাশিকে বিনাশ করিয়া অবশেষে শুভ কর্ম্মেও বীতরাগ হইতে হইবে। যেমন একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার একখানি গৃহকে ভস্ম করিয়া অবশেষে আপনিও ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ শুভ কর্ম্ম অশুভ কর্ম্মকে বিনাশ করিয়া আপনিও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

"যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ॥"

শতকল্প পর্য্যন্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেও, যে পর্য্যন্ত শুভ ও অশুভ এতদুভয় কর্ম্মই ক্ষয় না হইবে তত দিন মনুষ্যের মোক্ষ হইবে না। অশুভ কর্ম্ম লৌহময় ও শুভকর্ম্ম কাঞ্চনময় পাশ স্বরূপ, কিন্তু এ উভয়ই জীবের বন্ধন স্বরূপ। তপস্যা দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া পূর্ণানন্দ স্বরূপে বিরাজ করিবে। কর্ম্মক্ষয়ে মনোনাশ ও মনোনাশই মুক্তির কারণ।

এই স্থানে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপন্যাস লিখিতে বাধ্য হইলাম। একটি প্রেত একটি মনুষ্যের রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক এক মহাজনের নিকট আসিয়া কহিল যে মহাশয়! আমি বিনা বেতনে আপনার দাসত্ব করিতে ইচ্ছা করি, আমাকে নিযুক্ত করুন, কিন্তু আমার পণ এই যে আমি ক্ষণ জন্যও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিব না, সর্ব্বদাই কর্ম্ম চাই; যে সময়ে আপনি আমাকে কোন কর্ম্ম দিতে না পারিবেন তখনই আমি আপনার অনিষ্ট করিব; আর আমি নিজে কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে আমাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। মহাজন বিনা বেতনে এরূপ কর্ম্মঠ দাস প্রাপ্তি একটী পরম লাভ মনে করিয়া তাহাকে নিয়োগ করিলেন। কিন্তু প্রেত অলৌকিক শক্তি প্রভাবে বিলম্ব-সাধ্য কর্ম্মও ক্ষণ মধ্যে নিষ্পাদন করে। ৬ মাসের পথের কোন সমাচার আনিতে হইলে, তৎক্ষণাৎ আনিয়া দেয়। মহাজনের আবশ্যকীয় তাবৎ কার্য্যই সে আজ্ঞা মাত্রেই সাধন করিতে লাগিল। মহাজন তাহার ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আর কর্ম্ম যোগাইতে পারেন না বলিয়া প্রেতের পণানুসারে তৎকর্ত্তৃক উপদ্রবগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। একদিন একান্তে বসিয়া এই দুর্ব্বিপাক চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একজন আগন্তুক আসিয়া তাঁহার

মনোগ্লানির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তদ্বিবরণ বলিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি মহাজনকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে—তুমি গৃহ মধ্যে একটী বাঁশ পুতিয়া রাখ, যখন তাহাকে অন্য কোন কর্ম্ম না দিতে পারিবে, তখনই তাহাকে সেই "বাঁশটীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উঠিবে ও আবার নিম্নে নামিবে" এইরূপ আদেশ করিও। আবশ্যক মত অন্য কর্ম্ম করিতে দিবে! মহাজন এই চতুরবুদ্ধি ব্যক্তির পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলেন। প্রেত গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া অনবরত বাঁশে উঠিতে ও নামিতে হয় দেখিয়া ভাবিল যে আমার আর উপদ্রব করিবার সময় বা উপায় নাই। তখন অগত্যা মহাজনকে কহিল, মহাশয়! আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। মহাজনও কহিলেন, আমিও বাঁচিলাম। এই উপাখ্যানটীর তাৎপর্য্য এই যে—মনোরূপী প্রেত, জীবরূপ মহাজনের নিকট নিযুক্ত হইল। সংকল্প দ্বারা তাবৎ কার্য্যই ক্ষণমধ্যে সাধন করিয়া অবশিষ্ট সময় জীবের অকল্যাণকর দুশ্চিন্তা দ্বারা তাহাকে খেদগ্রস্ত করে। জীবের অনুতাপ উদয় হইলে গুরুরূপী আগন্তুক আসিয়া "অবকাশ পাইলেই মনকে পরমাত্ম-চিন্তনরূপ বাঁশ অবলম্বন করিতে দিবে," তাহাকে এইরূপ শিক্ষা দেন। মন তখন আত্মাভিপ্রায়-সিদ্ধির বিঘ্ন দর্শনে কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম-সত্তায় বিলীন হইয়া যায়। অতঃপর আর জীবকে শুভ ও অশুভরূপ কর্ম্মময় ভবসাগরে সুখ দুঃখ রূপ তরঙ্গে আকুলিত হইতে হয় না।

—০—

করিলাম কি !

একান্ত স্থানে শান্ত হৃদয়ে এক ভয়ঙ্কর তরঙ্গ উঠিল। কোথায় ছিলাম, কোথায়ই বা আসিলাম, কি জন্যই বা আসিলাম, আসিয়াই বা করিলাম কি ! এখানে আমাকে কে আনিলেন ! কেনই বা আনিলেন ! কিরূপেই বা আনিলেন এবং যে জন্য আনিলেন, তাহারই বা করিলাম কি ! এখানে আসিয়া কত কিই দেখিলাম, কত কিই শুনিলাম, কত কিই বলিলাম, কত কিই ভাবিলাম, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়াই বা করিলাম কি ! এখানে পিতা মাতা পাইলাম, ভাই ভগ্নী পাইলাম, স্ত্রী পুত্র পাইলাম (?), বন্ধু বান্ধব পাইলাম, ধনজন পাইলাম, সুখ সম্পদ পাইলাম, পাইয়াই বা করিলাম কি ! নানা ভাষা শিখিলাম, নানা দেশ বেড়াইলাম, নানা বস্তু দেখিলাম, নানা লোকের সঙ্গে রহিলাম, নানা গ্রন্থ পড়িলাম, নানা তর্ক বিতর্কে দিন কাটাইলাম, অবশেষে করিলাম কি ! শরীর সবল হইল, ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল, মন বুদ্ধির প্রণয় জন্মিল, সংশয়-সিদ্ধান্তের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ববায়ু বহিল, বিবেক-বিচার বিষয়বিকারাদি সহ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিবাদ লাগিল, সংসার সমুদ্রে প্রলয়-তুফান উঠিল, কিন্তু আমি করিলাম কি ! যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই সাম্প্রদায়িকগণের বিষম মতভেদ, ক্রিয়াভেদ। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজনীতি, কেহ সমরনীতি কেহ বা ধর্ম্মনীতি লইয়া ব্যস্ত ; কেহ বলিতেছে, কেহ শুনিতেছে, কেহ বুঝাইতেছে, কেহ স্তব্ধ রহিয়াছে, কেহ আন্দোলন করিতেছে ; কেহ শাসন করিতেছে, কেহ দ্বৈরদসিংহাসনে, কেহ বা ধরাসনে বসিয়াছে ; কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ বা অবাক্ হইয়া রহিয়াছে। সংসারহট্টে সকলেই ঘুরিতেছে ও চীৎকার করিতেছে, সকলেই গোলমালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কিন্তু হায় আমি করিলাম কি !

কেহ ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছে, কেহ গার্হস্থ্য-নীতি বুঝিতে না পারিয়া কর্ত্তব্য পালনে অপারগতা বশতঃ বৃথা গৃহী হইয়াই নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে, কেহ সন্ন্যাসী কেহ বা যোগী হইয়া ভগবানের সন্নিকর্ষানুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, কেহ শাস্ত্রাধ্যাপন দ্বারা দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন, কেহ ভক্তি-সরোবরের আনন্দ-সরোজ-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কেহ ভগবৎসত্ত্বানুভূতিরূপ গভীরসমুদ্রে মগ্ন হইয়া যাইতেছেন, কিন্তু হা ! আমি করিলাম কি !! আমি রক্তের তেজে নাস্তিক হইয়া, মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক বলি "ভগবান্ নাই", বিষম বিষয়-বিষপানে বিহ্বল হইয়া, অসৎসঙ্গে থাকিয়া সাধুহৃদয়গণেরও সাংসারিক ক্লেশ ও দুর্নীতিপরায়ণ পাপাত্মাগণেরও বৈষয়িক উন্নতি দেখিয়া সময়ে সময়ে বলি "ভগবান্ নাই", দুঃখে পড়িয়া বলি, "ভগবান্ নাই", আমার পাপ চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া বলি, "ভগবান্ নাই", দুরাত্মা দুরাচারগণের তদ্দণ্ডেই কোন বিষম ঐশী দণ্ড বিধান হইল না দেখিয়া বলি, "ভগবান্ নাই"। কিন্তু তাঁহার অনন্ত সৃষ্টি রুষ্ট হইয়া বজ্রনিনাদে তিরস্কার পূর্ব্বক আমাকে বলিল, রে পাপ ! তুই সামান্য ধূলিকণামাত্র, তোর এত কি সাহস, এত কি সামার্থ্য, যে তুই বলিস্ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিনায়ক অনাদি অনন্তস্বরূপ ভগবান্ নাই ! তুই জানিস্ না যে তোর মত কোটী কোটী জীব মুহু র্মুহুঃ তিনি সৃষ্টি করিতেছেন আবার পলকমাত্রে প্রলয়পয়োধি-প্রবাহে ভাসাইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ! তখন কম্পিতকলেবরে ভয়ে ভাবিলাম, হায় হায় ! আমি করিলাম কি !! তরু, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল, আদি যাঁহার সত্তার সাক্ষ্য দান করিতেছে, হিমালয় উন্নত মস্তকে যাঁহার কীর্ত্তি ও জয় ঘোষণা করিতেছে, সমুদ্র যাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া উত্তাল-তরঙ্গ-মালায় পৃথিবীময় নৃত্য করিতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আদি দলে দলে যাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না, হায় !

তবে আমি করিলাম কি ?! গুরু যাঁহাকে চিনিবার জন্য উপদেশ দান করিলেন, চতুর্দ্দশ ভুবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাঁহার অন্বেষণ করিতেছে, যিনি অন্তরে, বাহিরে, পশ্চাতে ও সম্মুখে থাকিতেও কেহ ধরিতে পারিতেছে না, অথচ যিনি সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন, সেই সার সুধানিধিকে আমি আলিঙ্গন করিতে পারিলাম না, তবে আমি করিলাম কি !! বিজ্ঞান-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সমস্ত বস্তুরই পরিচয় লইতেছি, কিন্তু "আমি কে" তাহার পরিচয় লইলাম না, "আমার কে" তাহাও বুঝিলাম না, "তুমি" "আমি" "তিনি" আদি শব্দে কাহাকে নির্দ্দেশ করি, তাহার তত্ত্ব বিদিত হইলাম না, হা ! দেহ-ধারণ করিয়া তবে আমি করিলাম কি !! যাঁহার সংসার, যাঁহার সর্ব্বস্ব, যাঁহার "আমি", তাঁহাকে সমস্ত সমর্পণ না করিয়া দেহাভিমানী "আমি কর্ত্তা" হইয়া বসিলাম, উঃ, এই দুষ্ক্রিয়া বশতঃ ঐ যে যম দশনে অধর নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক আমাকে শাসন করিবার নিমিত্ত মৃত্যু-দণ্ড-হস্তে আগমন করিতেছে, হায় হায় ! আমি তাহা না বুঝিয়া করিলাম কি ! যাঁহার নাম করিলে আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠে, যাঁহাকে ভাবিলে ভয় ভাবনা দূরে পলায়ন করে, যাঁহাকে স্মরণ মাত্র বিপদ সম্পদ সমান হয়, যাঁহার চরণে প্রণত হইলে জন্ম মরণ যন্ত্রণা জীবকে স্পর্শও করে না, হা ! হৃদয়মন্দিরে তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্থাপন করিতে পারিলাম না, তবে দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া আমি করিলাম কি !!

গুরুদেব ! অবোধ শিষ্যের প্রতি কৃপা বিতরণ কর, তুমিই আমার গতি ; আত্ম-মন্ত্রে যাঁহার ইঙ্গিত করিয়াছ, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাঁহার পূর্ণ সত্তায় নিজসত্তা বিসর্জ্জন দিতে পারি। যদি তাহাই না পারিলাম, তবে তোমার অভয়-চরণে শরণাপন্ন হইয়াই বা করিলাম কি !!

হে ত্রিজগদ্‌গুরো ! সকল বস্তুর মূলে তোমার সত্তা, "অস্তি" শব্দ তোমারই জীবন্ত ও জ্বলন্ত সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তুমি স্বীয় সত্তায় জগৎ প্রকাশিত করিয়াছ, "আমার" সত্তাও দেখাইয়া

দাও ! যদি তোমার কৃপায় আমার "আমিত্বই" বুঝিতে না পারিলাম, তবে তোমার কৃপা-কল্পতরুতলে থাকিয়াই বা করিলাম কি !!!

মনুষ্য ! সচেতন হও, নিজ জীবনী সমালোচনা কর, আর একান্তে বসিয়া মনঃ-প্রাণে ঐক্য করত আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর, "এত দিন আমি করিলাম কি" !!!

কামিনীকুলের কলঙ্কভঞ্জন।

আর্য্য শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ যখন প্রত্যেক জীবের অধিকার, চরিত্র, কার্য্যকলাপ ব্যাখ্যান দ্বারা জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন, যে সময়ে লোকসমাজের সুশৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করা তাঁহাদের সাধু ভাবের প্রধান অঙ্গ ছিল, যে সময়ে মানবগণকে ধরাধামে একমাত্র ধর্ম্মাধিকারী ও সকল প্রাণীর প্রধান বলিয়া প্রতীতি করিয়াছিলেন, যে সময়ে দেখিলেন যে ললনাগণের স্নেহ, যত্ন ও সাহায্য ব্যতীত শিশু উত্তমাঙ্গ ও সদ্ভাব লাভ করিতে পারে না, সে সময়ে তাঁহারা স্ত্রী জাতিকে কুলাভরণ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে প্রচার করিয়াছেন। যে সময়ে দেখিলেন স্ত্রী ও পুরুষ এতদুভয়ের পরস্পর সাহচর্য্য ভিন্ন গার্হস্থ্যাশ্রমের অনেক কার্য্য অপূর্ণাঙ্গ থাকিয়া যায়, যখন দেখিলেন ধার্ম্মিক গৃহীর একটী কোমল প্রকৃতির আদর্শ ও সহধর্ম্মিণী আবশ্যক এবং যখন বিবেচনা করিলেন, স্ত্রীজাতি মানবধর্ম্মের অঙ্গ পূরণে অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, তখন তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে গৃহস্থগণের ভূষণ স্বরূপ বলিয়া সমাদর করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ যখন ত্যাগী সন্ন্যাসী পরিব্রাজকগণের তীব্র উপদেশের প্রতি গৃহিগণের কর্ণ ধাবিত হইল, যখন গৃহিগণ নিজোচিত উপদেশ অবহেলা করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম ও বৈরাগ্যাশ্রম উৎকৃষ্ট বলিয়া মান্য করিতে লাগিল, এবং সন্ন্যাসধর্ম্মের কথা মধুর ও চমৎকার বলিয়া গৃহিগণ যখন তাঁহাদেরই গ্রন্থ পাঠে ও চরিত্র সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, সেই সময় হইতেই ভোগিগণ যোগি-গণের ন্যায় স্ত্রীজাতিকে নিন্দা ও অনাস্থা পূর্ব্বক বন্ধনের কারণ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। কেবল অবহেলা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিল না, বরং তাহাদের উপর অনেক দোষারোপ ও গ্লানি করিতেও প্রবৃত্ত হইল। এবং যাহারা শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম, তাহারাও ধর্ম্মসাধনের সহচারিণী কামিনীকে শাস্ত্র-বাক্যানুসারে ঘৃণা করিতে লাগিল। স্ত্রীগণের

সম্বন্ধে যে কতকগুলি অপকলঙ্ক প্রচারিত আছে, শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা আমরা তাহারই যথাযথ ব্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিব। পুরুষবর্গ কামিনীগণকে সম্ভাবাঞ্জনানুরঞ্জিত নেত্রে অবলোকন করেন ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

"আহারং দ্বিগুণং প্রোক্তং বুদ্ধিস্তস্যাশ্চতুর্গুণা।
ব্যবসায়ঃ ষড়্গুণঃ প্রোক্তঃ কামাশ্চাষ্টাগুণাঃ স্মৃতা" ॥

স্ত্রীজাতি আহারে পুরুষাপেক্ষা দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, ব্যবসায়ে (কার্য্য, ব্যাপারাদিতে) ছয় গুণ ও কামে অষ্ট গুণ। এই শ্লোকটী জনসাধারণের উন্মীলিত নয়ন সমক্ষে স্ত্রীদিগকে উপহাস, অনাস্থা ও ঘৃণার দ্রব্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। আমরা এক্ষণে ইহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা না করিয়া কামিনীগণের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিতে চাহি না।

পুরুষগণ দুই বেলাই উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজন ও সময়ানুসারে মিষ্টান্নাদিও পৃথক্ খাইয়া থাকেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে স্ত্রীগণ প্রায় সচরাচর দুই বেলা ভোজন করে মাত্র, কিন্তু নিয়মিত জল খাওয়া সকলের ভাগ্যেই ঘটে না—বিধবাগণের দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যাশন ও সধবাগণের গর্ভাবস্থাতে অল্পাহার হইয়া থাকে। জীবনের পরিমাণে পুরুষগণের অপেক্ষা স্ত্রীজাতি দ্বিগুণ দূরে থাকুক, অল্প ভিন্ন অধিক ভোজন করে না। নারীর বুদ্ধি চতুর্গুণ, একথাটী নিতান্ত প্রলাপ বলিলেও হয়। কয়জন স্ত্রী ব্রহ্মা, বাল্মিকী, ব্যাস, মহর্ষি শেষাবতার, কপিল, আসুরি, গোতমের ন্যায় বুদ্ধি লাভ করিয়াছে? কয়জন স্ত্রী, কণাদ, যাস্ক, বাৎস্যায়ন ঋষি, শঙ্করাচার্য্য, পাণিনি, জৈমিনি, মুনি কাত্যায়ন আদির ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়াছে? কয়টী স্ত্রীর কীর্ত্তি-স্তম্ভ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? উক্ত মহাত্মা আদির কীর্ত্তি কলাপ

ভারতে দেদীপ্যমান থাকিতে নারী-বুদ্ধি চতুর্গুণ বলা কি স্ত্রীগণের যোগ্য ? যদি বুদ্ধি ক্ষুদ্র মানিত হয় তবে ব্যবসায়ে (বুদ্ধির ব্যাপারে) নারী কিরূপে ষড়্‌গুণ হইবে ? স্ত্রীগণের কাম পুরুষাপেক্ষা অষ্ট গুণ। এটী বলিতেও লজ্জা হয়। পুরুষগণ বহু বিবাহে আসক্ত, স্ত্রীগণ একমাত্র পতিলাভে সন্তুষ্ট। স্ত্রীহীন পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে প্রবৃত্ত, বিধবা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা। অতএব নারীবৈরিগণ অকারণে নারীমনে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া থাকে। এইক্ষণে প্রোক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থ তাৎপর্য্য কহিব।

নর ও নারীর প্রকৃত অর্থ পুরুষ ও প্রকৃতি। আহারার্থ ভোজন নহে, এখানে প্রবৃত্তি স্বরূপ বুঝিতে হইবে। পুরুষের একমাত্র প্রবৃত্তি আছে—যদ্দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে ; প্রকৃতির আহার বা প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, ভোগ ও অপবর্গ। বাস্তবিক ভোজনে দ্বিগুণ নহে। পুরুষাপেক্ষা প্রকৃতিতে বুদ্ধি চতুর্গুণ আছে। পুরুষের স্বরূপ চৈতন্যই এক মাত্র বুদ্ধি, কিন্তু প্রকৃতিতে লৌকিকী, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই বুদ্ধি চতুষ্টয় রহিয়াছে। আনন্দোপভোগই পুরুষের একমাত্র ব্যবসায়, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—"ভগ" শব্দ-বাচ্য এই ছয়টী প্রকৃতির ব্যবসায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পুরুষাপেক্ষা প্রকৃতির ব্যবসায় ষড়্‌গুণ। আবার কাম শব্দে রিপু রতিপতি নহে, কামের ন্যায়দর্শন-সঙ্গত যথার্থ অর্থ কামনা। দ্বৈতবাদীরা বলেন পুরুষের একমাত্র ইচ্ছা মুক্তিলাভ, কিন্তু প্রকৃতি অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা ও বশিতা এতৎ অষ্ট সিদ্ধির কামনা করেন। এইরূপ পুরুষাপেক্ষা নারীর (প্রকৃতির) অষ্টগুণ কাম প্রসিদ্ধ হইল। এক্ষণে উত্তম প্রতীতি হইতেছে সাধারণের কলুষিত চক্ষু স্ত্রীজাতিকে ভ্রম বশতঃ কলঙ্কিত দেখিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে। স্ত্রীজাতি কোমলপ্রকৃতি, এবং স্নেহ, মমতা ও প্রীতির আধার স্বরূপ বলিতে হইবে। পুরুষগণের বিলাসকৌতুক-কলুষিত নেত্র কামিনী-

কুলের প্রকৃতিতে যে কলঙ্ক দেখিতেছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কামিনীকুল পুরুষগণের সদ্ভাব-বর্দ্ধিনী হইলে ভারতের কল্যাণ হইবে। ভগবদ্ভাবাঞ্জনে ভারতীয় নর নারীর চক্ষু অনুরঞ্জিত হউক।

রাজা ও সাধু।

কোন সময়ে জনৈক রাজা বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তিনি একটী মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং একটি বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন, যে একজন তপস্বী প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগবদ্‌গুণানুবাদ গান করিতেছেন। রাজা তাঁহার নিকট গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি একাকী এই বিজন বনে কিরূপে বাস করেন? তপস্বী বলিলেন, রাজন্! আমি ক্ষণ জন্যও একাকী থাকি না, সর্ব্বসামর্থ্যশীল পরমেশ্বর নিরন্তর আমার সঙ্গে রহিয়াছেন।

রা। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্পাদি সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভীষণ জন্তুগণ এখানে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, ইহাদিগকে দেখিয়া কি আপনার ভয় হয় না?

ত। আমি আপনার ন্যায় ধনুর্ব্বাণ লইয়া কখনও উহাদিগকে বধ করিবার চেষ্টা করি না। আমার মনেও কখন তাহাদের প্রতি বৈরভাব উদয় হয় না, তবে উহারা কেন আমার শত্রুতাচরণ করিবে? বরং সর্ব্বত্র আত্ম-দৃষ্টি বশতঃ আমি তাহাদিগকে মিত্রভাবে প্রেম করিয়া থাকি, তাহাতে উহারা আমার রক্ষণাবেক্ষণই করিয়া থাকে।

রা। এখানে তো অন্য কোন মনুষ্য নাই, তবে আপনার ভোজনাদির কিরূপ ব্যবস্থা হয়?

ত। লোকালয়ে যিনি ভোজন দান করেন, তিনি এখানেও নিত্য বিরাজমান। তাঁহার আজ্ঞানুসারে বৃক্ষ সমূহ আমার আবশ্যক মত সুরস ফল, পত্র, কন্দ আদি প্রস্তুত রাখে।

রা। আপনি একজন মহাত্মা। আপনার বিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।

ত। গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া নিজ পরিচয় জানিয়া লউন, তৎপরে আমার পরিচয় জানিতে আর বিলম্ব হইবে না।

রা। আপনিই প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ।

ত। আমি না আপনি? আমি নিত্য অমূল্য পরম পদার্থ লাভের জন্য তুচ্ছ সংসার মাত্র ত্যাগ করিয়াছি, যাহা বাস্তবিক কিছুই নয় বলিলেও হয়। আর আপনি কিঞ্চিৎ স্বপ্নবৎ সুখেই তৃপ্ত হইয়া অমূল্য পদার্থের দিকে চাহিয়াও দেখেন না। আমি সর্ব্বোত্তমের জন্য বৃথা পদার্থ ত্যাগ করিয়াছি মাত্র, কিন্তু আপনি তুচ্ছ সংসারের নিমিত্ত সর্ব্বস্বরূপ পরম পদার্থকে ত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনিই সর্ব্বত্যাগী!!!

রা। (লজ্জিত হইয়া) মহাত্মন্! আমি দিবাতে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করি, রাত্রিতে সুকোমল শয্যায় শুইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করি, অতএব অধিক সুখী কে, আপনি কি আমি?

ত। আমি। কেননা আপনি সমস্ত দিন রাজকীয় চিন্তায় ব্যাকুল, ও সদাই শত্রুভয়ে ভীত; আমি সমস্ত দিন পরমাত্ম-সত্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতুল আনন্দ রস পান করি। রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে আপনারও কোমল শয্যা স্মরণ থাকে না, আমারও বৃক্ষতল মনে পড়ে না। সুতরাং তখন উভয়ের অবস্থাই এক। বরং মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন জন্য আপনার সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। অতএব আপনার সুখ কোথায়?

রাজা সাধু অপেক্ষা নিজ অবস্থা হীন বুঝিতে পারিয়া সাধুকে বারংবার প্রণামপূর্ব্বক মনে মনে তত্ত্বাবৎ বিচার করিতে করিতে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

———o———

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পাপের কথা শুনিলে লোকে চমকিয়া উঠে। লোকে পাপ হইতে দূরে থাকিতে চায় ও পাপকে বড় ভয় করে। ধর্ম্মরাজ্য পাপের নামে টলমল করিয়া উঠে। সকল ধর্ম্মপুস্তকেই পাপের বড় বীভৎস চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পাপের সঙ্গে জ্বলন্ত নরকাগ্নির, পাপের সঙ্গে শূল, শেল ও অঙ্কুশাঘাতের, পাপের সঙ্গে কৃমিকীট-পূর্ণ বিষ্ঠা, পূয, শোণিত কুণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিত্রিত হইয়াছে। পাপ মানবের সুখরাজ্যের পরম শত্রু, ইহা চিরদিন জগতে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। যাহাকে আমরা শত্রু বলিয়া দূরে রাখিতে চাই, তাহাকে না ডাকিতেও আমার কাছে সে আসে কেন? আমি যাহাকে আদৌ ভালবাসি না, সে আমার সঙ্গ ছাড়ে না কেন? এ প্রহেলিকার গূঢ় রহস্য ভেদ করা বড় কঠিন। পাপ পদার্থ টা কি, তাহার একবার পরিচয় লওয়া আবশ্যক। তুমি বলিবে, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করার নাম পাপ। আমি বলি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ঈশ্বরের "ইচ্ছা" প্রকৃতির নামান্তর মাত্র। প্রকৃতির গতিকে রোধ করিতে কেহই সমর্থ নহে। কিন্তু ঈশ্বরের "ইচ্ছা" অর্থাৎ প্রকৃতির গতি বুঝিতে না পারিয়া যে নিজ কল্যাণানুকূল পথ পরিহার করিয়া যায়, সেই পাপী। পাপের ফল পরলোকেই ভোগ করিতে হয়, তাহা নহে। পাপের প্রকৃতি অনুসারে কতক ইহলোকে, কতক পরলোকেও ভোগ হইয়া থাকে। প্রকৃতি ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি পাপের জন্য কাহাকেও ক্ষমা করেন না। তুমি অজ্ঞানী হও—অসমর্থ হও, পাপের জন্য তোমার ফল ভোগ করিতেই হইবে। তুমি অজ্ঞানী, প্রকৃতির নিয়ম অবগত নও, অগ্নিতে হাত দিলে দগ্ধ হয়, ইহা তুমি জাননা; জান বা নাই জান, অগ্নিতে হস্ত দিলেই অগ্নির প্রকৃতি তোমাকে দগ্ধ করিবে। তুমি শিশু,

অজ্ঞান বলিয়া ক্ষমা করিবে না। এই প্রকৃতির নিয়ম না বুঝিয়া যে কাজ করিল, সে পাপের ফল হাতে হাতে পাইল। জীব এইরূপ পাপ নিরন্তর করিতেছে, ফলও যথা সময়ে পাইতেছে। এইরূপ সামাজিক বা রাজনৈতিক যখন যাহার নিরূপিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে না পারিবে, তখনই দণ্ডিত হইবে। কিন্তু আমরা যে পাপের কথা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, তাহা আধ্যাত্মিক। অসত্যকথন, পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ প্রভৃতি শাস্ত্র-কথিত পাপগুলি আধ্যাত্মিক রাজ্যের। তুমি হয়ত শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত না হইয়া বলিবে—মিথ্যা "বলা" পাপ, চুরি "করা" পাপ, পরনারীতে "অভিগমন" করা পাপ। বস্তুতঃ এগুলিকে পাপ বলে না। মিথ্যা "কহিলে", চুরি "করিলে", পরদার "গমন করিলে" যে "ফলের" উদয় হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণে যে একটী "সংস্কার" রূপ দাগ পড়ে, তাহারই নাম পাপ। কুকার্য্য পাপ নহে, কিন্তু কুকার্য্যে প্রবৃত্তিই পাপ এবং কুকার্য্য জনিত সংস্কারই পাপ। মনু বলিয়াছেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" ॥

তুমি হয়তো ইহার অর্থ করিবে, যে মাংস-ভোজনে, মদ্য-সেবনে ও মৈথুনে পাপ নাই, কেননা ইহাই জীবগণের সাধারণ প্রবৃত্তি। তবে এতাবৎ হইতে নিবৃত্ত হইলে মহা ফল হয়। বস্তুতঃ তোমার এ অর্থ ভ্রমসঙ্কুল। প্রকৃত অর্থ এই যে মাংস "ভোজন," মদ্য "সেবন" এবং পরনারী "গমন" রূপ "ক্রিয়াতে" দোষ বা পাপ নাই, কিন্তু এতাবৎ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিই পাপ এবং ঈদৃশী বাসনার নিবৃত্তিই পরম ফলদায়িকা। অনেক সময় জীব পুণ্যকার্য্য করিতে গিয়া পাপ ভোগ করিয়া থাকে। মনে কর তুমি "দান" করা পুণ্য ভাবিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে, কিন্তু দান করিবার সময় "আমি দাতা" "সকলে

আমার যশোগান করিবে” এই গর্ব্বের উদয় হইল—এই দানে তোমার পুণ্য না হইয়া পাপ ভোগ করিতে হইল। কেননা দানের শুভ সংকল্প তোমার মনে স্থান পাইল না, কিন্তু গর্ব্বের কলঙ্ক-রেখা মনে গম্ভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। এই জন্যই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াও তাহার ফলভাগী হয়েন না। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করিয়াও নিষ্পাপ ও নির্ম্মল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।

শুভাশুভ কর্ম্ম জন্য যাঁহাদের অন্তঃকরণে আদৌ দাগ লাগে না, সেই মহানুভবগণের কথা আন্দোলন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কার্য্য করিলেই কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ যে মানবগণের অন্তঃকরণে সংস্কার রূপ দাগ লাগে, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? পাপের প্রায়শ্চিত্ত নানা স্থানে নানারূপ বিহিত হইয়াছে। নানা কৃচ্ছ্র সাধন, তপশ্চর্য্যা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপে ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোথাও তীর্থ-পর্য্যটন, কোথাও কোনরূপ মন্ত্রজপ, ইত্যাদি ব্যবস্থা হইয়াছে। একই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নানা স্থানে নানারূপে বিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বস্তুতঃ কোন্ প্রায়শ্চিত্তটী করিলে পাপের শান্তি হয়, তাহাই বিবেচ্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে, গঙ্গাস্নান করিলে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয় ও হরিনাম করিলে সমস্ত পাপের শান্তি হয়।

“পরদাররতো বাপি, পরাপকৃতিকারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥”

মৎস্যপুরাণং।

পরদার-নিরত, পরানিষ্টকারী পাতকী হরিনামকীর্ত্তনে নিষ্পাপ হইয়া মুক্তি লাভ করে। তুমি হয় তো বলিবে, শাস্ত্রের এই শ্লোকগুলি রোচক মাত্র, বস্তুতঃ সত্য নহে। ইহাতে শাস্ত্রের প্রতি নিতান্ত দোষারোপ করা হইল। মনের মলিনতা ও চির দিনের সংস্কার বস্তুতঃ পাপকে যত বিশাল ও

ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ আছে, হরিতে তোমার তাদৃশ বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা নাই। পাপকে তোমার বিশাল বোধ হইল, হরির নাম তাহা অপেক্ষা যে সুবিশাল নহে তাহা তোমাকে কে বলিল? অন্ধকার দেখিতে দিগ্ব্যাপী ও অত্যন্ত বিশাল—দেখিলে বোধ হয়, উহাকে দূর করা বড় কঠিন। কিন্তু ক্ষুদ্র দীপবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইলেই গৃহের অন্ধকার কোথায় পলায়ন করে, তাহার নিদর্শন থাকে না। তুমি পাপকে যে রূপ প্রকাণ্ড দেখ, পাপ-হন্তাকেও সেইরূপ একটা প্রকাণ্ড আকারে দেখিতে চাও। একজন রোগী জ্বরবিকারে ছট্ ফট্ করিতেছে, তুমি মনে কর, আধ ঘণ্টা অন্তর আধ ছটাক করিয়া ডাক্তারের কটু কষায় ঔষধ সেবন করাইলেই উপযুক্ত চিকিৎসা হইল। কবিরাজের ক্ষুদ্র সূচিকাভরণও তাহার যে মহৌষধ, হোমিওপ্যাথিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বটিকাও বিকার-বিঘ্ন বিঘাতনে যে সমর্থ ইহা তোমার সহসা বিশ্বাস হয় না। দেখিতে ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, তাহার শক্তি প্রবল। বহু দিন ধরিয়া যোগ যাগ করিলে তোমার মনে হয়—বহু দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কিন্তু একবার হরি বলিলেই একবার গঙ্গাস্নান করিলেই যে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়, ইহা স্বীকার করিলে না কেন? তুমি বলিবে গঙ্গাস্নানে, হরি নামে আমার পাপ গেল কৈ? আমি যেমন ছিলাম তেমনই তো আছি। তোমার মনের দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। হরি নাম বা গঙ্গা স্নানের দোষ নাই। তুমি রজ্জু-দর্শনে সর্প ভ্রম করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে, তোমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, মুখ মলিন হইয়া গেল, বুক ধড়ধড় করিতে লাগিল। তোমার পিতা প্রদীপ আনিয়া দেখাইলেন—উহা সর্প নহে, রজ্জু। তুমি বলবান্ হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত উদ্বেগ কাটিয়া যাইত, কিন্তু তুমি দুর্ব্বল বলিয়া, সর্প-ভ্রম দূর হইলেও তোমার বুকের ধড়ধড়ানি শীঘ্র বন্ধ হইল না। যদি বিশ্বাসের দ্বারা চিত্তের বল বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাও, স্ফুলিঙ্গমাত্র অগ্নিতে ক্ষণ মধ্যে তৃণস্তূপ দাহনের ন্যায় হরি-নামা-

দিতে তোমার সমস্ত পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। যিনি রোগের নিরূপণ করিয়াছেন, তিনিই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে শাস্ত্র পাপের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই হরিনাম কীর্ত্তনাদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহা লিখিয়াছেন। তবে অবিশ্বাস কেন?

একটী বেশ্যা চিরদিন ভ্রূণহত্যা, ব্রহ্মহত্যাদি নানা পাপাচার করিয়া পরিশেষে পরিতপ্ত ও পারলৌকিক যাতনার ভয়ে ভীত হইয়া পণ্ডিতের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিল। পণ্ডিত বলিলেন, তোমার ন্যায় পাতকিনীর পতিতপাবনী গঙ্গাতে স্নান ভিন্ন আর কোন প্রায়শ্চিত্তেই উদ্ধার দেখিতেছি না। তুষানলেও তোমার সদ্গতি হওয়া অসম্ভব। তবে সর্ব্বপাপ-সংহর্ত্রী জাহ্নবীর দয়ায় উদ্ধার হইতে পার। বেশ্যা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান আরম্ভ করিল। স্নানান্তে "মা! যদি সত্য হয়, তবে সবই সত্য, আর যদি মিথ্যা হয় তবে সবই মিথ্যা" এই বলিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া গৃহে আসিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি শাস্ত্র-বাক্যানুসারে আমার পাপ সত্য হয়, তবে তোমার মহিমাও সত্য, অতএব আমি পাপ-মুক্ত হইলাম। আর যদি শাস্ত্রলিখিতানুরূপ তোমার মহিমা মিথ্যা হয়, তবে সেই শাস্ত্রেরই লেখা আমার পাপই কেবল সত্য হইবে কেন? উহাও মিথ্যা। তাহা হইলেও আমি পাপশূন্য, কেননা শাস্ত্রের একটী কথা সত্য, অপরটী মিথ্যা হইতে পারে না। এইরূপ শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বেশ্যা কিছু দিনের মধ্যে পরম ভক্তিমতী ও নিষ্পাপ হইয়া শান্তি লাভ করিল। অজামিলের জীবনীও ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

দেখিয়া থাকিবে সামান্য একটী তৃণমূলের দ্বারা অতি কঠিন পীড়াও আরোগ্য হইয়া থাকে। রোগী পাছে সামান্য গাছের নাম শুনিলে ঔষধে অনাস্থা বা অশ্রদ্ধা করে, সেই জন্য চিকিৎসক তৃণমূলটী অন্য একটী পদার্থের সহিত মিশাইয়া রোগীকে দুর্মূল্য ঔষধ বলিয়া সেবন করিতে দেন। রোগী তৎসেবনে রোগমুক্ত হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নান, হরি নাম-

কীর্ত্তনাদি বাস্তবিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু ভব-রোগাক্রান্ত অবিশ্বাসী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির জন্যই যোগ, যাগ, ব্রত, নিয়ম, কৃচ্ছ্র আদির সহিত উহা মিশাইয়া সেবন করিতে দেওয়া হইয়াছে। হরিনাম-কীর্ত্তন গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা যে যে স্থলে পাপ মোচনের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তত্তাবৎ সর্ব্বথা প্রকৃত বলিতে হইবে। রোচক নহে।

যোগ যাগ করিয়াই হউক, তীর্থ-সেবা বা কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াই হউক, অথবা হরিনাম বা গঙ্গাস্নান করিয়াই হউক, যাহাতে তোমার মনের সংস্কারটী মুছিয়া যাইবে, তাহাই তোমার প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তের এটী উৎকৃষ্ট ও অপরটী অপকৃষ্ট মনে করিও না। মনের প্রকৃতি ও বিশ্বাসানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। মনের পাপ মনের তেজে দগ্ধীভূত হয়। আবশ্যক বোধে এই স্থানে একটী পৌরাণিকী কথার অবতারণা করিতেছি। ভগবতী পার্ব্বতী এক সময়ে লোক-গুরু শ্রীমন্মহাদেবকে বলিয়াছিলেন যে, হে নাথ! তুমি গঙ্গাস্নানের যে মহিমা ঘোষণা করিয়াছ, তাহাতে লোকে আর ব্রত, তপ, পূজা, যাগ, যজ্ঞ করিবেনা। যদি গঙ্গাস্নানেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় তবে এত শ্রম ও যত্নসাধ্য কার্য্যে লোকে প্রবৃত্ত হইবে কেন? তাহাতে ভগবান্ ত্রিলোক-নাথ উত্তর করিয়াছিলেন, দেবি! পাপ-নিরসনার্থ আমার সমস্ত ব্যবস্থারই মূল্য সমান। যোগ, যাগ, পূজা, পাঠ ও গঙ্গাস্নান আদিতে কিছুমাত্র তারতম্য নাই। সকলের ধাতু, সকলের প্রকৃতি সমান নহে। কেহ যোগে, কেহ যজ্ঞে, কেহ তীর্থে, কেহ গঙ্গাস্নানে নিজ নিজ নিষ্ঠানুসারে পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে। সকল গুলিতেই সকল লোকের নিষ্ঠা নাই। যাহার যাহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হইবে, সে তাহাতেই নিষ্পাপ হইয়া মুক্তি লাভ করিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্ঠাসহ গঙ্গাস্নান করিলে নিশ্চয়ই পাপের বিমোচন হইবে। তাহাতে ভগবতী বলিলেন, প্রত্যহ

হইবে ? তাহাতে ভগবান্ বলিলেন, লক্ষ লক্ষ গঙ্গাস্নাত লোকের মধ্যে কদাচ দুই এক জনকে প্রকৃতভাবে গঙ্গাস্নান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গূঢ় রহস্য কল্য তোমাকে দেখাইব। রহস্য-ভেদের সমস্ত পরামর্শ স্থির হইল। অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে দিক্ বিভাসিত করিয়া ভগবতী যোড়শী যুবতী রূপে তৎপর দিন প্রাতে গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট। মহাদেব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বৃদ্ধ, তাঁহার উরুদেশে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া মৃতাবস্থায় রহিলেন। প্রাতে স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবা সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেছে, স্নান পূজা করিয়া চতুর্ব্বর্ণের কতলোক কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া মায়ারূপিণীকে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভগবতী শোক-বিকলকণ্ঠে বলিলেন, আমার স্বামীর তো এই দুর্দ্দশা দেখিতেছ। আমি একাকিনী। যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে তবে দয়া করিয়া ইঁহার মৃতদেহ গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও, আমাকে নিস্তার কর ; কিন্তু পাপ থাকিতে যদি কেহ ইঁহাকে স্পর্শ করে, তবে তাহারও ইঁহার ন্যায় অবস্থা হইবে। ভগবতীর অনুরোধ রক্ষায় প্রায় সকলেরই ইচ্ছা হইল। কিন্তু "আমি নিষ্পাপ" এরূপ বিশ্বাস কাহারও না থাকায় কেহই দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। ভগবতী বলিলেন, তোমাদের মধ্যে অনেককেই পূজা-পাঠ-নিষ্ঠ ও গঙ্গাস্নাত দেখিতেছি, তবে কেন তোমরা আমার সহায়তা করিতেছ না ? সকলেই নিরুত্তর—নীরব রহিল। দেখিতে দেখিতে বেলা প্রহরাতীত হয়। একজন যুবা গঙ্গাস্নানে আসিল। রাত্রিতে বেশ্যালয়ে থাকিয়া মদ্য পানাদি করিয়াছে, তাহার চিহ্ন এখনও লক্ষিত হইতেছে। সে জনাকীর্ণ মণ্ডলী দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং পার্ব্বতীর অপূর্ব্ব রূপে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে ? কি চাও ? ভগবতী সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্ববৎ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে যুবক বলিল,— যদি নিষ্পাপ হইলেই তোমার এই উপকার করিতে পারা

যায়, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমিই তোমার উপকার সাধন করিব। একজন মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্তের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল লোকে হাসিয়া উঠিল। যুবক সকলের উপহাসকে উপেক্ষা করিয়া নিষ্পাপ হইবার জন্য গাত্র-বস্ত্রাদি উন্মোচন পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিতে নামিল। এই অবকাশে গৌরী ও শঙ্কর উভয়েই অন্তর্হিত হইলেন এবং মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন, দেখ লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই ব্যক্তিই গঙ্গাস্নান করিল। ইহারই অন্তঃকরণ হইতে পাপ ধৌত হইয়া গেল। অন্যান্য সকলের গাত্রমার্জ্জনা হইল মাত্র। মদুক্ত গঙ্গামহিমায় ইহারই স্থির বিশ্বাস। ইহার মনের বিচিত্র বলে জন্মজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে রক্ষা পাইল।

বস্তুতঃ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত যে প্রায়শ্চিত্তটি তোমার মনঃপুত হয়, তাহাই তোমার উপকারী হইবে। স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা তোমার পাপক্ষয় হয় না, তাহা নহে ; কদনুষ্ঠান জন্য নরকাদির আশঙ্কা রাশি তদ্দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। শাস্ত্রবিহিত স্নান, ব্রত, উপবাস, পবিত্র শুদ্ধিকর পদার্থাদির সেবন, মন্ত্রাদির জপ প্রভৃতির দ্বারা শরীরের অশৌচভাব বিদূরিত ও তত্তদনুষ্ঠানের প্রকৃতিনিহিত-শক্তি-কৌশলে মনের তেজ, বল ও পবিত্রতার বৃদ্ধি হওয়ায় মানসপটে অঙ্কিত পাপের অপবিত্র ছায়া রূপ মলিন চিহ্নগুলি তিরোহিত হইয়া যায়। তাহাতেও যদি মনে কর, মনের কালিমা দুর হইল না, তবে দৃঢ় মনে "পাপক্ষয়কাম" হইয়া সাধু "সংকল্প" পূর্ব্বক একবার গঙ্গাস্নান করিয়া দেখ, একবার ভক্তিসহ প্রাণ ভরিয়া "হরি"বলিয়া ডাকিয়া দেখ ; দেখ, তাহাতে তোমার মন বিগলিত হয় কি না। অগ্নি-তাপে বিগলিত হইলেই যেমন স্বর্ণ-কুণ্ডলাদিতে আর কোন চিত্র বা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিশ্বাস, ঐকান্তিকতা ও ভক্তিতে চিত্ত বিগলিত হইলে অন্তঃকরণে অঙ্কিত অশুভ কর্ম্মের ফলরূপ পাপের মলিন চিহ্নগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়। সৎসঙ্কল্প ও একান্ত ভক্তি-প্রবাহই মানস পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

দুর্গোৎসব ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"তত্ত্ববোধিনী" বঙ্গদেশের প্রাচীনতম ধর্ম্মপ্রচারিকা পত্রিকা। ইহার উৎপত্তি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে যে অতি উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বঙ্গীয় পাঠকগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক গূঢ় কথা অবগত হইয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আমাদিগের চক্ষে সম্মান ও আদরের বস্তু। ইহার লিপি-নৈপুণ্যে ও অভিজ্ঞতার গুণে অনেকেই এতৎ পত্রিকার প্রবন্ধগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। ভগবানের কাছে আমরাও প্রার্থনা করি যে তত্ত্ববোধিনীর এই উচ্চ অধিকার অবিচলিত থাকুক।

কিন্তু কার্ত্তিক মাসের (শকাব্দা ১৮০৭) তত্ত্ববোধিনীতে "দুর্গোৎসব" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, এ দেশের আবাল বৃদ্ধের সংস্কার এই যে অযোধ্যাপতি রাম দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া রাবণ-বধে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু ইহাও স্বীকার করিয়াছেন, "কালিকা পুরাণে এই রাবণ-বধের পূর্ব্বে রামের দুর্গা মূর্ত্তির পূজার উল্লেখ আছে।" দুর্গাপূজা যে রাম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নহে, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্ম লিখিয়াছেন "কিন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া রামের চরিত্র নির্ণীত হয় এবং যাহা রামের জীবদ্দশায় রচিত, সেই বাল্মীকীয় রামায়ণে এই দুর্গোৎসবের কোনও উল্লেখ করেন নাই। ইহা রামায়ণ রচনার অনেক পশ্চাৎ পৌরাণিক কবিরা কল্পনা করিয়া যান, হিন্দুর মধ্যে তাহাই দুর্গোৎসব।" তত্ত্ববোধিনীতে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ হইবে ইহা আমাদিগের আশাবহির্ভূত। লেখক রামায়ণের প্রামাণিকতাকে বলবতী রাখিয়া কালিকা পুরাণের প্রমাণকে উপেক্ষা ও অবহেলা করিলেন-কোন সাহসে?

যদি বুঝিতাম রামায়ণের উক্তির সহিত কালিকা পুরাণের উক্তির কিছু বিরুদ্ধতা আছে, তাহা হইলেও একদিন বিবেচনার স্থল ছিল। কিন্তু স্পষ্টতঃ দেখিতেছি, রামায়ণ ও কালিকা পুরাণে বিরুদ্ধতা আদৌ নাই, কেবল কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে মাত্র। রাবণ-বধের পূর্ব্বে রামায়ণের রামচন্দ্র ব্রহ্মের স্তব বা ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। কালিকা পুরাণের রামচন্দ্র সেই সময়ে দুর্গা-মূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। রামায়ণে দুর্গামূর্ত্তির উল্লেখ নাই, অতএব রামের দুর্গাপূজা মিথ্যা ইহা প্রমাণিত হয় না। রামায়ণ দেখিয়া রাম-চরিত্র নিশ্চিত হয় এবং কালিকাপুরাণের রাম-চরিত্র অপ্রামাণিক ইহা তাঁহাকে কে বলিল? হিন্দুর চক্ষে রামায়ণ ও কালিকা পুরাণ উভয়ই সমান সম্মান ও আদরের সামগ্রী। উভয়ই আর্য্য গ্রন্থ, সুতরাং প্রমাণ-মূলক। রামায়ণ রামচন্দ্রের জীবদ্দশায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া রাম-চরিত্রের সকল কথাই যে উহাতে লিখিত ছিল, তাহার প্রমাণ কি? বাল্মীকি যদি দুই একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকেন, তাহাতে শাস্ত্র-বৈষম্য-দোষ ঘটে না। দেখা গিয়াছে অনেক লোকের জীবন-চরিত জীবদ্দশায় ও মরণান্তে রচিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশায় গ্রন্থ খানিতে হয় তো যে কথার আদৌ উল্লেখ ছিল না, তাহার মরণান্তকালের ইতিহাস-লেখক বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার জীবনের অনেক নূতন সত্য ঘটনা সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ লিখিত গ্রন্থদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয় না। এবং প্রথম খানি প্রমাণ-মূলক ও দ্বিতীয় খানি অপ্রামাণিক ইহাও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলে রাধিকার নামোল্লেখ পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়িক গোপলীলার বহু বিস্তার বর্ণনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র নির্ণীত হইয়া থাকে; তবে কি ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সমস্ত

বতে মহাভারতোক্ত "ভগবদ্গীতা" রূপ অমূল্য উপদেশ-মালার আদৌ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অতএব তজ্জন্য গীতা কি অমূলক হইবে ? না! হিন্দুর সমক্ষে নহে। শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও মহাভারত এ সমস্ত হিন্দুর পরম প্রামাণিক গ্রন্থ। এক খানি গ্রন্থকে মান্য করা এবং অন্যকে তুচ্ছ ও অপ্রামাণিক বোধ করা মনুষ্যের স্বেচ্ছাধীন, কিন্তু শাস্ত্র-বিচারাধীন নহে। রামায়ণে যাহা লিখিত আছে তাহাই সত্য, এবং পৌরাণিক কথা "কল্পনা", এই কথাগুলি মনে করিতেও হাস্যোদয় হয়। যদি তত্ত্ব-বোধিনীর স্বরে কেহ পুরাণকে প্রমাণ-মূলক মনে করিয়া রামায়ণকে কল্পনার ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়, তাহাতে তিনি কি করিতে পারেন ? পৌরাণিকদিগের লেখাকে "কবির কল্পনা" বলিয়া অবহেলা করা বর্ত্তমান ভারতের একটী বিষম রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ রোগের ঔষধ কি ?

রাম রাবণবধের পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন বলিলে কি তাহাতে কিছু বাধা ঘটে ? দুর্গাপূজা কি ব্রহ্মোপাসনা হইতে স্বতন্ত্র সামগ্রী ? লিখিত হইয়াছে, "বস্তুতঃ আদিত্য-হৃদয় ব্রহ্মস্তোত্র (ইহাই রামায়ণের রামচন্দ্র রাবণ-বধের পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়াছিলেন), ইহার প্রত্যেক অক্ষর ব্রহ্মকেই প্রমাণ করিতেছে।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, দুর্গাপূজার প্রত্যেক অক্ষর কি বাঁশ, দড়ী, মাটী, রং ও রাংতা প্রকাশ করিতেছে ? দুর্গা বলিলে তো হিন্দুরা ইহাই বুঝেন, যে——

নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী।
ব্রহ্মাদিদেবৈর্মুনিভির্মনুভিঃ পূজিতা স্তুতা॥
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সর্ব্বরূপা সনাতনী।
ধর্ম্মসত্যপুণ্যকীর্ত্তিযশোমঙ্গলদায়িনী॥
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী।
বুদ্ধির্নিদ্রা ক্ষুৎপিপাসা ছায়া তন্দ্রা দয়া স্মৃতিঃ॥

কৈ এতৎপাঠে তো দুর্গাকে ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সামগ্রী বলিয়া বুঝিলাম না। তবে আপত্তি হইতে পারে, মূর্ত্তিপূজা কেন? এ কথার তুমুল আন্দোলন এখন তুলিবার আমাদিগের অবকাশ নাই, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, যে মূর্ত্তিগুলি আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের আধিভৌতিক প্রকাশন্বী রূপ মাত্র। মনুষ্য যখন নামরূপময় জগতের—পাঞ্চভৌতিক দেহের—প্রপঞ্চ অবিদ্যা মায়ার স্থূল বিদ্যমানতা অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র ও সূক্ষ্ম আত্মাকে স্বরূপতঃ অনুভব করিতে শিখিবে, সেই দিন নাম, রূপ, মূর্ত্তি পূজার সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে।

সম্পাদক লিখিয়াছেন, দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে প্রকাণ্ড হিন্দু সম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে এই দুর্গোৎসব এখন হয় না, তবে "নব রাত্রি" নামে এই সময়ে একটা জাতীয় উৎসব হইয়া থাকে। কোথাও মূর্ত্তিপূজার বাহুল্য আর কোথাও বা যৎস্বল্প, কেন এরূপ? লেখক নব রাত্রির মেলাকে বাঙ্গালা দেশের দুর্গোৎসব হইতে "যৎস্বল্প" মনে করিয়াছেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। দুর্গোৎসবেও দেবীর পূজা এবং নব রাত্রিতেও সেইরূপ দেবীর পূজা হইয়া থাকে। যে যে স্থানে প্রাচীন কাল হইতে দেবীর স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানকার লোকেরা আর স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গঠন করিয়া নিজ গৃহে পূজা করিবার আবশ্যকতা মনে করেন না। সকলে সেই দেবীস্থানে গিয়াই পুষ্প বিল্বদল নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। বারাণসীর দুর্গা-বাড়িতে নবরাত্রির নয়দিন ধরিয়া রাত্রি আড়াইটা হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত যেরূপ লোকের ভীড় হয়, সেরূপ ভীড় বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবেও হয় কি না সন্দেহস্থল। নব রাত্রির মেলা কি "যৎ স্বল্প"! তত্ত্ববোধিনীর সংস্কার এই যে ভারতের বঙ্গদেশ ভিন্ন পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে "বৈদান্তিক ধর্ম্ম, একেশ্বরবাদ অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে।" লেখক বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় রীতি নীতি প্রকৃতি ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া

কি এত দিনে স্থির করিলেন যে বাঙ্গালীরা বহু-ঈশ্বর-বাদী? বঙ্গবাসিগণ কি ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা ও স্তুতি করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে উপাসনা করেন না? পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে রাম, কৃষ্ণ, শিব লিঙ্গাদির বহুল প্রচার সত্বেও তদ্দেশবাসিগণ একেশ্বরবাদী, ও দুর্গা, কালী জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়াই বঙ্গবাসিগণ মূর্ত্তির উপাসক, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত নূতন ও বিচিত্র। আমরা বলি, পশ্চিম দেশে কেন, ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এক ঈশ্বরেরই পূজা হইয়া থাকে। বহুমুর্ত্তিতে উপাসনা হয় বলিয়া বহু ঈশ্বরের উপাসনা হয় না। যদি বৈদান্তিক ধর্ম্ম-প্রভাবেই পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে একেশ্বর বাদ প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে সেই বৈদান্তিক 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মহাসত্যের প্রভাবে কি বঙ্গীয় দুর্গার খড়, মাটী, রং, রাংতা প্রত্যেক অণু পরমাণু ব্রহ্মময় হইয়া একেশ্বরবাদের উচ্চধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না?

তত্ত্ববোধিনীর ইহাও সংস্কার, যে বঙ্গবাসিগণ স্থানীয় জল বায়ুর গুণে নিতান্ত "আমোদপ্রিয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই মূর্ত্তি পূজা এতদ্দেশে বাহুল্য রূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে।" ধন্য সিদ্ধান্ত! বঙ্গবাসিগণ! শুনিয়া রাখুন, তত্ত্ববোধিনী স্থির করিলেন, যে আমোদের জন্যই আপনারা পূজা করিয়া থাকেন। তত্ত্ববোধিনীর এই কথাতে আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি কি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর হৃদয় খুলিয়া পাঠ করিতে শিখেন নাই! হইতে পারে, আধুনিক কতিপয় আমোদ-প্রিয় ব্যক্তি দুর্গোৎসবাদির উপলক্ষে কুৎসিত নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিস্তৃত বঙ্গ-ক্ষেত্রে যে সহস্র সহস্র হিন্দুহৃদয় ভক্তি ও প্রেমে, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া জগন্মাতার চরণে জবা বিল্বদল গঙ্গাজল অর্পণ করিবে বলিয়া দুর্গোৎসবের কতদিন পূর্ব্ব হইতে উন্মত্ত

কুলাঙ্গনা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমাশ্রুবিগলিত নেত্রে গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে মায়ের পবিত্র উজ্জ্বল মূর্ত্তি ও পূজা দর্শন করিয়া এবং জীবনের কল্যাণার্থ কামনা করিয়া থাকেন, তাহা কি তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই? কত পূজাবাড়ীতে যে এই উপলক্ষে পণ্ডিতদিগের বিদায়, সাধু ব্রাহ্মণাদির সৎকার ও বহুল পরিমাণে দীন দুঃখী অনাথ ও আতুরগণকে অবারিত অন্নদানাদি হইয়া থাকে, তত্ত্ববোধিনী কি তাহা দেখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন? কিছু দিন পূর্ব্বেও অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ বঙ্গীয় গৃহস্থগণ ভক্তিযুক্ত চিত্তে পূজা করিতেন, অথবা যে পর্য্যন্ত আজ কালকার আমোদের রস তরঙ্গ উথলিয়া না উঠিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে দুর্গা-পূজা, কালী-পূজা, জগদ্ধাত্রীপূজার প্রচার "বাহুল্য" ছিল। এখন দিন দিন যেমন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের হ্রাস, ভক্তির ও আমোদের "বাহুল্য" হইতেছে, তেমনি দিন দিন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পূজার সংখ্যা কমিয়াই আসিতেছে। যদি আমোদার্থে মূর্ত্তিপূজার "বাহুল্য" প্রচার হইত, তবে আজ কাল অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্গোৎসবাদির প্রচার দেখিতে পাইতাম।

যাঁহারা বঙ্গবাসীর মূর্ত্তিপূজাকে আমোদ মূলক বলিয়া স্থির করেন, বোধ হয় আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহারা বাঙ্গালীর হৃদয় হারাইয়াছেন। দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর আমোদের উৎসব নহে, উহা সাধু হৃদয়ের মহামহোৎসব, উহা ভক্ত জীবনের সাম্বৎসরিক দিব্য পূর্ণোৎসব, উহা ভারতবাসী আর্য্যদিগের সমস্ত উৎসবের মধ্যে প্রধান উৎসব। এই উৎসবে পাষাণ হৃদয় গলিতে দৃষ্ট হয়, শোকার্ত্তের হৃদয়েও আনন্দের চিহ্ন দেখা যায়, শত্রু মিত্রে প্রেমালিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়। ভগবান্ এই দুর্গোৎসবকে প্রতিগৃহের উৎসব করিয়া রাখুন।

মূর্ত্তিপূজা লইয়াই তত্ত্ববোধিনীর বিষম বিরোধ। লিখিয়াছেন "অমূর্ত্তের রূপ নাই, সুতরাং রূপে বা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা প্রকৃত

ব্রহ্মোপসনা হইতে পারে না।" কিন্তু আমরা বলি, রূপে, নামে, ভাবে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ভিতরে, বাহিরে, অগ্রে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, নিম্নে, উর্দ্ধে, যথা তথা সর্ব্বথা তাঁহাকে দেখাই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা। ব্রহ্মোপাসনা বলিলেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বুঝিতে হইবে, ইহা আর্য্য শাস্ত্রের চিরন্তন সিদ্ধান্ত। "নেদং যদিদমুপাসতে" কেনোপনিষদুক্ত এই মন্ত্রাংশ টুকু উদ্ধৃত করিবার সময় তত্ত্ববোধিনী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই তাঁহার মনের গোল মিটিয়া যাইত। উক্ত উপনিষদের চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত শ্লোক পাঁচটি নির্গুণ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। 'নেদং যদিদমুপাসতে"র—নাম রূপে যাহা উপাসনা কর, তাহা ব্রহ্ম নহে—তত্ত্ববোধিনী এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যাচার্য্যগণ বলেন—ইহা (নির্গুণ) ব্রহ্ম নহে, যাহাকে লোকে উপাসনা করে। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয়ীভূত নহেন। তিনি অনির্ব্বচনীয়, মনোবুদ্ধির অগোচর এবং ইন্দ্রিয়গণের বহির্ভূত। হস্তপদাদিবিশিষ্ট জড়পিণ্ডই কেবল প্রতিমা নহে, মনোবুদ্ধির গম্য, জ্ঞানের ও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ীভূত রূপ, নাম বা ভাব, যাহারই তুমি উপাসনা কর, তাহাই "প্রতিমা"। এই প্রতিমা-পূজা অনাদি কাল হইতে জগতে প্রচলিত। কঠোর তপস্যা দ্বারা মনের বিনাশ (মনোলয়) সাধন করিতে না পারিলে এই মূর্ত্তি-পূজার হস্ত হইতে কাহারও এড়াইবার যো নাই। ইহাতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি কাহারও হাত নাই। আদিত্যের জ্যোতির মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করা আর ত্রিনয়ন। দশভুজার মৃণ্ময়ী-প্রতিমাতে ত্রিকালদর্শিনী দশদিগ্ব্যাপিনী অনন্ত ব্রহ্ম-রূপিণীকে দর্শন করা একই কথা। উভয়ই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, উভয়ই প্রতিমা-পূজা। প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, রামায়ণ ও কালিকা পুরাণে কিছু মাত্র "প্রাণগত বিরোধ" নাই, কেবল কিঞ্চিদ্ বিভিন্নতা আছে মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী বলিয়াছেন যে উপনিষদ্ উপাসনাকাণ্ডের চরম সীমা

এবং পুরাণ ও তন্ত্র উপাসনা কাণ্ডের অবনতির জন্য আমরা বলি উপনিষদ্ উপাসনা কাণ্ডের উর্দ্ধ সীমা এবং পুরাণ ও তন্ত্র উপাসনার বিস্তার ও বিকাশ। বেদ বেদান্তে যাহা বীজভূত ছিল, পুরাণ ও তন্ত্রে তাহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র।

পশ্চিমোত্তর দেশাদির হিন্দু অধিবাসিগণ প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত স্থান বিশেষে বা মন্দির বিশেষে গিয়া যে মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন ও বঙ্গবাসিগণ গৃহে প্রতিমা গঠন পূর্ব্বক যে মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন, পৌত্তলিকতার সংস্কারে এই উভয় মধ্যে তত্ত্ববোধিনী যে কি তারতম্য ও প্রভেদ দেখিলেন, কিসে পশ্চিমোত্তর-দেশ-বাসিগণ বেদান্ত-প্রতি[illegible] ব্রহ্ম-জ্ঞানসম্পন্ন, ও কিসে যে বঙ্গবাসিগণ পৌত্তলিক বুঝিলেন, ইহাতো আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তবে এই মাত্র বলিতে পারেন, যে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা পশ্চিমোত্তর দেশে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা অধিক। কিন্তু উপাসনা কালে উভয়ই সমান। মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া তত্ত্ববোধিনীর সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। আমরাও ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াই আমাদের কথিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কৈ আমরাতো পশ্চিমোত্তর দেশাদির কোন স্থলে দলে দলে শমদমাদিসাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন লোক দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, সুসজ্জিত মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর নেত্রের যেমন তৃপ্তি—পশ্চিমোত্তর, পঞ্জাব, রাজপুতানাদিবাসীরও তেমনই তৃপ্তি! সুমধুর বাদ্য বাঙ্গালির যেমন ভাল লাগে, তাহাদিগেরও তেমনি ভাল লাগে এবং প্রসাদভক্ষণে উভয় রসনারই সমান উল্লাস। সুতরাং উপাসনারাজ্যে ভারতের সকল দেশই সমান। শমদমাদি সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে হইলে যে কষ্টসহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহা মুষ্টিমাত্র চণক বা শক্তু মাত্র সেবন পূর্ব্বক দিন কাটাইলেই সিদ্ধ হয় না। উহাতে মনোবেগসহিষ্ণুতা বা বিষয়-বিরাগাদির প্রয়োজন। ইহাতেও বাঙ্গালা ও

পশ্চিমোত্তর দেশ সমান অধিকারী। বাঙ্গালা দেশে আমোদের অংশ অধিক, ও ভারতে অন্যত্র কম, ইহাতো প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না।

—o—

গুরু ও শিষ্য।

শিক্ষা-গুরু ও দীক্ষা-গুরু ভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুর উপদেশ ব্যতীত একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণেরও ভালরূপ পরিচয় সহজে জানিতে পারা যায় না। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় আদি কেহই আর একটি প্রবল শক্তি কর্ত্তৃক উত্তেজিত, আকৃষ্ট বা পরিচালিত না হইলে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যে শক্তির দ্বারা আমরা উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হই, সেই শক্তি আমাদের গুরু। দুই শক্তির একত্র সংঘর্ষণ ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না; এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল, তাহাই অপরের গুরু। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যাঁহার শক্তির ইঙ্গিতে স্ব স্ব কার্য্যে প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে, তিনিই জগদ্‌-গুরু। এই জগদ্‌-গুরুকে জানিবার জন্য জীবের মনঃপ্রাণ ব্যাকুল হইলে যিনি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা জীবের কল্যাণ-পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দেন তিনিই দীক্ষা-গুরু। আর জগদ্‌গুরুর মায়া-বিজৃম্ভন স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের পরমাণু হইতে বিরাট বিশ্ব ব্যাপার পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বাহ্যাভ্যন্তর তত্ত্ব যিনি বুঝাইয়া দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। একটি কীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেই শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী আদি সকলেই কত সময়ে কত শিক্ষা দেয়, তাহা গুণগ্রাহী শিক্ষিতগণের অবিদিত নাই। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু অথবা ব্যভিচারিণী বারাঙ্গনাও কত সময়ে কত লোকের শিক্ষা-গুরু হইয়া থাকে। শিখিব বলিয়া যেখানেই গমনকর, সেই খানেই কিছু না কিছু শিখিবার বিষয় দেখিতে পাইবে। যে শিক্ষার দ্বারা জীবের পরমাত্মদৃষ্টি-পথে যাইবার আনুকূল্য হয়, তাহাই সুশিক্ষা। আজ কাল সুশিক্ষার অভাবে, অশিক্ষার স্বভাবে ও কুশিক্ষার প্রভাবে শিক্ষার পবিত্র ক্ষেত্র কিছু মলিন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষা-গুরুগণ জীবের অবশ্যগন্তব্য পথের কথা বিস্মৃত হইয়া যথেচ্ছগমনের পথ মুক্ত করিয়া দিতেছেন। সূক্ষ্ম-তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য শিক্ষা প্রথম সোপান, ও

দীক্ষা দ্বিতীয় বা চরম সোপান! শিক্ষা দীক্ষার অনুকূল হওয়া চাই। শিক্ষা বিধি পূর্ব্বক না হইলে দীক্ষা সহজে ফলবতী হয় না। এই জন্য শিক্ষা দিবার সময়ে সুশিক্ষিত ও দীক্ষিত সদ্গুরুর আবশ্যক। যিনি শিক্ষা-তত্ত্ব ও দীক্ষা-তত্ত্বকে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করেন, তিনি শিষ্যকে বিশেষ রূপে সুশিক্ষিত করিতে পারেন না। শিক্ষা যদি দীক্ষার অনুগামিনী না হয়, তবে সে শিক্ষা কুশিক্ষা ও জীবের অকল্যাণকারিণী। আমাদের ভাগ্যদোষে বর্ত্তমান ভারতে এই শিক্ষারই বিস্তার অধিক। যেমন শৈশব যৌবনের এবং যৌবন বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা, সেই রূপ শিক্ষা দীক্ষার পূর্ব্বাবস্থা। যিনি শৈশবে সুপথে চলেন, যৌবনে তিনি সুখী হয়েন ও যিনি যৌবনে সুপথে চলেন, তিনি বার্দ্ধক্যে সুখ ভোগ করেন। সেইরূপ শিক্ষা-কালে যিনি সুপরিচালিত হয়েন দীক্ষাকালে তাঁহার স্বাত্মানুভূতি পরিমার্জ্জিত হয়। শিক্ষার দ্বারা মন সংশয়বর্জ্জিত পরিস্কৃত ও দিব্য দৃষ্টিযুক্ত হয়, ও দীক্ষার দ্বারা জীবনের পরমারাধ্য পরম দেবতাকে দর্শন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার অধিকারী কেহই নহে। যিনি সদ্গুরু-প্রসাদাৎ শিক্ষিত হইয়া দীক্ষিত হয়েন, তিনিই ধন্যজন্মা ও তাঁহারই জীবন সার্থক।

আমরা এ স্থানে শিক্ষাগুরুকে লইয়া অধিক কালক্ষেপ করিতে পারিতেছিনা। দীক্ষাগুরুই এ প্রস্তাবের লক্ষ্য। গুরু বলিলেই প্রায় লোকে দীক্ষাগুরু বুঝিয়া থাকে। গুরুকে মনে করিলেই তাঁহাকে যেন জগৎ ছাড়া কোন স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাকে আমাদিগের ন্যায় মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে ভয় হয়—তাঁহার সহিত একাসনে বসিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—তাঁহার বাক্য বেদবাণী, তাঁহার আজ্ঞা অনুল্লঙ্ঘনীয়, তাঁহার পাদ-ধৌত জল অমৃত, তাঁহার দর্শনে জীবন সফল হয়। তিনি অপার সংসার-সমুদ্রে বিচক্ষণ কর্ণধার। গুরু শ্রদ্ধা ও চিরসম্মানের সামগ্রী।

কিন্তু এ পবিত্র দীক্ষা-গুরুর পদে বরণ করি কাহাকে? আমাদিগের দেশে যাঁহারা আজ কাল গুরুগিরি ব্যবসা করিয়া থাকেন, দীক্ষাদান যাঁহাদের পণ্য, শিষ্যগণ যাঁহাদের গ্রাহক, গুরু-দক্ষিণা লাভ যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদিগকে তো সদ্‌গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করা যায় না, ইচ্ছাও হয়না। কুলগুরু ত্যাগ করিতে নাই এই সংস্কারই আমাদের দেশের গুরুগণকে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। আমরা এই খানে অবশ্যই স্বীকার করি যে অনেক কুলগুরু সুশিক্ষিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ আছেন, তাঁহারা অবশ্যই সদ্‌গুরু বলিয়া পরিগণিত। আমরা সেই কুলগুরুগণকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। কিন্তু যাহারা অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অসচ্চরিত্র, সাধনাবর্জ্জিত, তাহাদের দীক্ষা দিবার কি অধিকার আছে? শিষ্য যখন বলিবে—

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তখন একথার সার্থকতা হইবে কিরূপে? তিনি তো নিজেই অবিদ্যা-মায়ান্ধকারে অন্ধীভূত, জ্ঞানাঞ্জনে তাঁহারই চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই, তিনি অন্যের চক্ষু "উন্মীলিত" করিতে গিয়া হয় তো শলাকাতে শিষ্যের চক্ষু "উৎপাটিত" করিয়া বসেন। যখন শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিবার সময় বলিবেন—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

হে গুরুগিরিধারিন্! তুমি তো শিষ্যকে চরাচরব্যাপী অখণ্ড মণ্ডলাকার পুরুষকে দেখাইতে পার নাই, (তুমি নিজেই দেখ নাই তো অন্যকে কোথা হইতে দেখাইবে।) তবে সদ্‌গুরুর প্রাপ্য প্রণামটা তুমি চুপি

গুরু ঠাকুর! তোমাদের ন্যায় গুরুগিরিধারিগণকে স্মরণ করিয়াই সর্ব্বলোকবন্দনীয় দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বড় দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদ্‌গুরুর্দ্দেবি! শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

শিষ্যের মাথায় পা দিয়া পয়সা লইবার গুরু অনেক, কিন্তু শিষ্যের ত্রিতাপহারী শান্তিবিধাতা সদ্‌গুরু বড়ই দুর্ল্লভ।

পৈতৃক বাগবাগিচা গৃহ সম্পত্তির ন্যায় তুমি শিষ্য ঘরটা অধিকার করিয়া বসিয়াছ। একবারও কি মনে ভাব না, যে মন্ত্র-দীক্ষা তামাসা নহে, ক্রীড়া নহে, শিষ্যকে সংসার-সিন্ধু পার করিবার গুরু ভার তোমার উপর ন্যস্ত, ভগবানের সম্মুখে তুমি শিষ্যের জন্য দায়ী। কিছু না জানিয়া শুনিয়া কোন্ সাহসে এই জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় হাত দাও, তাহা জানি না। হিন্দু হইয়া শাস্ত্র মানিয়া কেমন করিয়া অশাস্ত্রীয় কার্য্য কর, তাহা বলিতে পারি না। "গুং বোধয়তীতি গুরুঃ"—যিনি অবিদ্যান্ধকার-নিবারণে সক্ষম, তিনিই তো গুরু। পুনর্ব্বার বলি, ঠাকুর মহাশয়! একবার গুরুর লক্ষণটা দেখুন।

"সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচঃ সুন্দরঃ স্বঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ॥
আশ্রমী দেশবাসী চ গুরুরেবং বিধীয়তে॥"

যিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী কার্য্যদক্ষ, শাস্ত্রের যথার্থ অর্থবেত্তা, সুভাষী, সুরূপ, অবিকলাঙ্গ, কুলীন, যাঁহার দর্শনে লোকের কল্যাণ হয় এবং যিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণ্যশীল ব্রাহ্মণ, শান্তচিত্ত, পিতৃমাতৃহিতনিরত,

সর্ব্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠানশীল, আশ্রমী ও দেশবাসী, তাঁহাকেই গুরু পদে বরণ করিবে। এই রূপ গুণ যুক্ত হইয়া শিষ্যকে দীক্ষা দান করিলে উভয়েরই কল্যাণ। আজি কাল গুরুগিরি, চাকরী, বাণিজ্য আদির ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্মদোষে লোকে গুরুপদকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছে।

মন্ত্রদীক্ষার পূর্ব্বে গুরু শিষ্যে অন্ততঃ ৬ মাস বা বর্ষকাল একত্রে বাস করিবেন। পরস্পর প্রীতিযুক্ত ও উপযুক্ত বোধ করিয়া শিষ্য গুরুর নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিবেন ও গুরু কৃপা পূর্ব্বক শিষ্যের ভব-যন্ত্রণা-নিস্তারের উপায় স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দীক্ষা দান করিবেন। অনেক সময়ে শিষ্যের অনভিমতে গুরুগণ দীক্ষা দেন শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হই। বল বা ছল পূর্ব্বক মন্ত্র দীক্ষা দেওয়া মহাপাপ। গুরু স্বয়ং উপযাচক হইয়া মন্ত্র দিতে যান কেন? বোধ হয় পয়সার প্রত্যাশায়। শিষ্য করযোড়ে প্রার্থনা না করিলে কোন সদ্‌গুরু মন্ত্র দীক্ষা দিবেন না, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। তুমি মন্ত্র জপ কর কিনা, তুমি ধর্ম্ম সাধন করিতেছ কিনা, সাধনে কোন বিঘ্ন হইতেছে কিনা, গুরু ঠাকুরের এ সকল তত্ত্ব লইবার অবকাশ নাই। কিন্তু তুমি কত টাকা বেতন পাও, আর মাসে মাসে কিছু উপরি পাওনা আছে কিনা, এ সংবাদটী গুরু প্রথমেই লইয়া থাকেন। ধনলুব্ধ গুরুর দ্বারা শিষ্যের পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হওয়া সুকঠিন। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"-অন্ধে যেমন অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ কাম ক্রোধ লোভাদিতে অন্ধীভূত গুরু শিষ্যকে সংসার সিন্ধুপার করিতে পারেন না। মহর্ষিগণ! আচার্য্যগণ! একবার ভারতের দিকে তাকাইয়া দেখ, তোমরা যে সিদ্ধ গুরুর আসনে বসিয়া শিষ্যগণকে পরমানন্দধামের অধিকার দান করিতে আজ সেইখানে বসিয়া গুরুগিরিধারী ব্যাপারি গণ বণিগ্‌বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে!!

অনেক লোক আজ কাল কুলগুরু গণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া দীক্ষা লইতেও পরাঙ্‌মুখ হইয়াছেন! তাঁহারা যোগ্য গুরু পাইলে মন্ত্র লইতে সম্মত আছেন। গুরু অন্বেষণ করিলে হাটে বাজারে পথে ঘাটে গুরু পাওয়া যায়না। ভগবানের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিলে ভগবৎ-কৃপাতেই সদ্‌গুরুর দর্শন পাওয়া যায়। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন ভগবান্‌কে পাইবার জন্য একান্ত মনে কাঁদিতে লাগিলেন, ভগবান্ অমনি দয়া করিয়া দেবর্ষি নারদকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মশাপ-সন্তপ্ত মহারাজ পরীক্ষিত আসন্ন মৃত্যু জানিয়া ভগবদ্দর্শন-বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন, ভগবান্ অমনি কুরুজাঙ্গল হইতে শুকদেবকে প্রেরণ করিলেন। তুমি ভগবদ্বিরহে কাতর হও, সদ্‌গুরুর দর্শন পাইবেই পাইবে। সদ্‌গুরু যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ সৎশিষ্য হওয়া আবশ্যক; নতুবা তুমিও যেমন শিষ্য, তোমার গুরুও তেমনি জুটিবে। শিষ্যের লক্ষণ যথা—

"অলুব্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ আজ্ঞাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্তিকো দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে চ দৈবতে।
এবম্বিধো ভবেৎ শিষ্য ইতরো দুঃখকৃদ্‌গুরোঃ॥"

নির্লোভ, স্থির দেহ, গুরুর আজ্ঞাকারী, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক, এবং গুরু, মন্ত্র ও দেবতাতে দৃঢ়ভক্তিযুক্ত যিনি, তিনিই সদ্‌গুরুর উপযুক্ত শিষ্য; অন্যথা শিষ্য কেবল গুরুর দুঃখদায়ী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ স্বয়ং উত্তমাধিকারী না হইলে সদ্‌গুরু পাওয়াও দুর্লভ।

উপসংহার কালে আবার ইহাও বলি যে শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হন্, দীক্ষামন্ত্রে ও ভগবানে যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তবে গুরু যেমনই কেন হউন না, শিষ্য পরম ধামের অধিকারী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—০—

ত্রিগুণ।

"ত্রি" এই মায়া-কুহক-জড়িত সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া আর্য্য ঋষিগণ শাস্ত্রে অনেক গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। অনাদ্যনন্ত শক্তির গুহ্য প্রহেলিকা ভেদ করিতে বসিয়া আর্য্যঋষিগণ বেদের নিভৃত গুহা হইতে এই "ত্রি" সংখ্যাকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন। পুরুষের অনাদি শক্তি প্রভাবে প্রথমতঃ ত্রিগুণময়ী (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) মায়া বিস্ফুরিত হইয়া এই অনন্ত জগৎ প্রসব করিয়াছেন। এই ত্রিগুণই মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রাকৃতিক কার্য্য কুশলতা রক্ষণার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ রূপে, জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার এই তিন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। নির্ম্মল সত্ত্বগুণে (ব্রহ্মার হৃদয়ে) বেদও প্রধানতঃ ত্রয়ী রূপে (যজু, ঋক্ ও সাম) প্রতিবিম্বিত হইল। এই বেদ আবার ত্রিবর্ণাত্মক (অ+উ+ম্) অনাহত ধ্বনি প্রণব হইতেই উৎসারিত এবং কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিন ভাগে পল্লবিত হইয়া ভূঃ ভুবঃ স্বঃ নামক ত্রিলোককে পবিত্র করিয়াছেন। এই গুণত্রয়েরই ইঙ্গিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীরের বিকাশ; এতৎ প্রভাবে জীব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন দুঃসহ তাপে সন্তপ্ত; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ও ইহার অধীন। এমন কি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালও ইহার প্রচণ্ড শাসনকে অতিক্রম করিতে পারে না। এই তিনই ত্রিপুরাসুরের জনয়িতা। এই তিন পুর ভেদ করিয়া পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার জন্য ঈড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না এই তিন যোগাধিগম্যা নাড়ীর সাহায্যে পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন যোগ-বিধির পর সমাধি শিক্ষা করিতে হয়। এই তিনই ত্রিশূল। এই ত্রিশূলের উপরে বা ঊর্দ্ধতন স্থানে বারাণসী—জ্ঞানভূমি স্থাপিত রহিয়াছে। বায়ু পিত্ত, কফ, এই তিনের বিকারে বিমুগ্ধ না হইয়া যিনি তৎ, ত্বং, অহং

এই তিন ভেদ-দৃষ্টি ছাড়িতে সমর্থ, তিনিই চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এই তিনের জ্যোতির জ্যোতিঃ স্বরূপ হইয়া ত্রিকাল এক অবস্থায় আনন্দধামের অধিকারী হইতে পারেন। আলস্য, ঔদাস্য ও উপেক্ষা—শত্রুতা মিত্রতা ও অনবধান—আসক্তি, বিরক্তি ও মুক্তি আদি আর তাঁহাকে উদ্বেজিত করিতে পারিবে না। মনু লিখিয়াছেন—

> সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণং।
> যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্ মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ ॥

সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন মহত্তত্ত্ব রূপ আত্মার গুণ। এতত্ত্রিগুণময় মহত্তত্ত্ব সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন।

> যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
> স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণং ॥

দেহিমাত্রই এই তিন গুণ যুক্ত। কিন্তু ইহার মধ্যে যে গুণ যে শরীরে অধিক, সে দেহী তদ্গুণ-লক্ষণাক্রান্ত হয়। যে ব্যক্তি সত্ত্ব গুণ-প্রধান, তিনি জ্ঞান ও প্রীতিযুক্ত; যিনি রজোগুণ প্রধান, তিনি বিষয়াভিলাষ ও দুঃখের সন্তাপে পরিতপ্ত; যে ব্যক্তির শরীরে তমোগুণ অধিক, বিষাদ ও মোহ তাহাকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকে।

> সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং।
> এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥

সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞান, রজোগুণের রাগদ্বেষ, তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞান ইত্যাদি। ত্রিগুণের এতাবৎ লক্ষণ সমস্ত প্রাণীকেই আশ্রয় করিয়া বিশ্বচরাচর ক্রীড়া করিতেছে।

> তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
> প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥

আত্মাতে কান্তানুরাগ প্রকাশ স্বরূপ যে নির্ম্মল প্রশান্ত ভাব অনুভূত হয় তাহাই সত্ত্বগণ বলিয়া অবধারণ করিবে।

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজঃ প্রথিতং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাং॥

যাহার দ্বারা অন্তঃকরণে দুঃখ ক্লেশ ও অপ্রীতি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিষয় বাসনার বেগ মনকে উদ্বেজিত করিতে থাকে, তাহাই রজোগুণ।

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥

যাহা দ্বারা মোহ আসিয়া জীবকে আচ্ছন্ন করে এবং অব্যক্ত বিচার বোধের অতীত দুর্জ্ঞেয় বিষয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়, তাহারই নাম তমোগুণ।

বেদাভ্যাস স্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণং॥

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বেদাভ্যাস, প্রাজাপত্যাদির অনুষ্ঠান, শাস্ত্রার্থ অবধারণ পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ, মৃৎ, জল আদির দ্বারা শরীর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় গণের সংযম, সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান ও আত্মচিন্তা, এতাবৎ সত্ত্বগুণের কার্য্য।

আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণং॥

ফলের কামনা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণ, অল্প অর্থ প্রাপ্তিতেই মনের বিকলতা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অজস্র বিষয়োপভোগ এতৎ সমুদয় রজোগুণের কার্য্য।

লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণং॥

বহু ধনের লালসা, নিদ্রালুতা, অল্প ধনে অসন্তুষ্টি, পরোক্ষে পরদোষ-ঘোষণা, পরলোকে অবিশ্বাস, আচার ভ্রষ্টতা, ধনসত্বেও যাচঞা, ধর্ম্ম কর্ম্মে অনবধান, এই সমুদয় তমোগুণের লক্ষণ।

যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্॥

জ্ঞানার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সর্ব্ব প্রকার প্রযত্নের সহিত জানিতে ইচ্ছা করা, কার্য্যকালে লজ্জাস্পদ না হওয়া ও কার্য্য করিয়া আত্ম-তুষ্টি লাভ, এতাবৎ সত্ত্বগুণের লক্ষণ।

যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাং।
নচ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়স্তু রাজসং॥

পারলৌকিক সুখ ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া ইহলোকেই যশোলাভের জন্য ব্যগ্রতা, কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া উক্তবিধ ফল না পাইলেও দুঃখানুভব আদি না হওয়া রজোগুণের লক্ষণ।

যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণং॥

যে কার্য্য সম্পাদন করিলে পর, যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার সময় ও যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া গেলে লজ্জা বোধ হয়, তত্তাবৎ তমোগুণের লক্ষণ।

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরং॥

"কাম-প্রধানতা তমোগুণের লক্ষণ, অর্থনিষ্ঠতা রজোগুণের ও ধর্ম্ম

প্রাধান্য সত্ত্বগুণের লক্ষণ। ইহাদিগের মধ্যে ক্রমোত্তর শ্রেষ্ঠ জানিবে। অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জানিবে। কাম হইতে অর্থ লব্ধ হয় এবং অর্থ হইতে ধর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়।

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যত্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

সত্ত্ব গুণ বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, রজোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তমোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষ পশু পক্ষী আদি যোনি লাভ করে।

ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকী গতিঃ।
অধমা মধ্যমাগ্র্যাচ কর্ম্মবিদ্যা বিশেষতঃ॥

সত্ত্বাদি গুণ বৃত্তি যুক্ত ব্যক্তিদিগের যে তিন প্রকার গতি উক্ত হইল, এতাবৎ আবার দেশ কালাদি ভেদে এবং সংসার হেতু কর্ম্মের ভেদে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার।

স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যাঃ তামসী গতিঃ॥

বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কূর্ম্ম, পশু, মৃগ এতাবৎ তমোগুণ-প্রভাবে জঘন্য গতিবিশিষ্ট।

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্ব্বিতা।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ॥

হস্তী, ঘোটক, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, এ সকল তমোগুণ নিমিত্ত মধ্যম গতিবিশিষ্ট।

চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ॥

নট আদি মানব গণ, পক্ষী, ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত পুরুষগণ, রাক্ষস, পিশাচ আদি বিগ্রহ ধারণ তমোগুণজ উত্তমা গতি।

ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ॥

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন ঝল্ল নামক জাতি (যাহারা লগুড় দ্বারা যুদ্ধ করে,) এবং মল্ল জাতি (যাহারা বাহু দ্বারা যুদ্ধ করে), নট, শস্ত্রজীবী, দ্যূতক্রীড়াসক্ত ও মদ্যাদি পান পরায়ণ হওয়া রজোগুণজ অধমা গতি জানিবে।

রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ।
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ॥

অভিষিক্ত রাজা, জনপদের শাসনকর্ত্তা, এবং ক্ষত্রিয় জাতি মাত্র, রাজপুরোহিত, শাস্ত্রার্থ কলহ প্রিয় হওয়া রজোগুণজাত মধ্যমা গতি জানিবে।

গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসী উত্তমা গতিঃ॥

গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যক অর্থাৎ যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ এবং অপ্সরগণ হওয়া রজোগুণ জন্য উত্তমা গতি জানিবে।

তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ॥

বানপ্রস্থ, যতি, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদি বিমানচারিগণ, নক্ষত্র মণ্ডলী, ও দৈত্য দেহ লাভ সত্ত্বগণ জন্য উত্তমা গতির ফল।

যজ্বানো মুনয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ॥

যাগশীল ঋষি, বেদাদি বিগ্রহ বিশিষ্ট দেবতা, ধ্রুব প্রভৃতি জ্যোতির্গণ, বৎসর, সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণ, সাধ্যগণ আদি সত্ত্ব গুণজ মধ্যমা গতির ফল।

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ॥

ব্রহ্মা মরীচ্যাদি সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত-এতাবৎ সত্ত্ব গুণের উত্তমা গতি জানিবে।

মনুপ্রোক্ত এই গুণত্রয়ের ক্রিয়া, গুণ ও লক্ষণ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে এই তিন গুণেই বিশ্ব সংসারের সমস্ত কার্য্য সাধিত হইতেছে। মানসিক, বাচনিক ও দৈহিকসাধন সমস্তই এই তিন গুণের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। তমঃ ও রজঃ এই গুণ দ্বয়কে ক্ষীণ করিয়া যাহাতে সত্ত্বগুণের প্রভাব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, তাহারই যত্ন কর্ত্তব্য। সত্ত্ব গুণের উদ্রেক না হইলে মনুষ্যের পরম সুখ লাভের আশা নাই। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় হইয়া মনুষ্যকে আত্মার যথার্থ প্রতিকৃতি অনুভবে সমর্থ করিয়া দেয়। সত্ত্বগুণ উদয় হইলে দুঃখ, তাপ, চিন্তা, ক্লেশ বিদূরিত হইয়া যায়। মনুষ্য যে সুখের পিপাসু হইয়া দিগ্বিদিগ-জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে সর্ব্বথা কার্য্য-কারণ-ঘটনার তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে, সত্ত্ব গুণের যথাযথ বিকাশ ভিন্ন সেই সুখের আস্বাদনে কখনই সামর্থ্য হইবেনা। অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা হইলেই চিৎ—জ্যোৎস্না প্রকাশিত হয়, সেই নির্ম্মল কিরণেই ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীবকে সুশীতল করিতে পারে। তদ্দ্বারাই জীব সংসারের জ্বালামালার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানব জন্মের সার্থকতা সাধন করিতে পারে। অতএব গুণ-বিশুদ্ধিই মনুষ্যের যত্নতঃ লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা মানব দেবত্ব পাইয়া থাকে।

—o—

আসন।

নির্ম্মল-নীর নির্ঝরে, সরোবরে বা পুণ্যতোয় তীর্থকুণ্ডে অবগাহন করিলে এবং কোমল ও পবিত্র কৌষেয় পট্টবাসাদি পরিধান করিলে যেমন শরীর স্বচ্ছন্দ ও মন একাগ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধক সাধনোপযোগী আসনে উপবেশন করিলে ভগবচ্চিন্তায় যথোচিত সাহায্য পাইয়া থাকেন। আসনের গুণেই সাধক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির ভাবে আত্ম-সমাধি করিতে সমর্থ হয়েন। আসন দ্বিবিধ। ১ম—হস্ত পদাদির বিশেষ বিশেষ সংস্থানে যোগিগণ আসন রচনা করেন; যথা—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, বদ্ধপদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুষাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মাৎস্যাসন, মাৎস্যেন্দ্রাসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমাতানাসন, উৎকট্টাসন, সংকটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্ম্মাসন, উত্তানকূর্ম্মাসন, উত্তান মাণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, মাণ্ডুকাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন, যোগাসন, আদি চতুরশীতি প্রকার আসন সাধকগণের সাধনাঙ্গের প্রকার-ভেদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২য়—কুশাসন, রেমজাসন আদি, যাহার উপরে বসিয়া সাধকগণ মন্ত্রোপাসনাদি করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম প্রকার আসনের কথা অদ্য বলিব না, দ্বিতীয় প্রকার আসন-তত্ত্বই বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য।

সকল পদার্থেরই বহুবিধ গুণ বা শক্তি আছে। তদনুসারে যে যে দ্রব্যে আসনগুলি বিরচিত হয়, সেই সেই দ্রব্যের শক্তি তদুপবিষ্ট সাধক শরীরের শক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া সাধকের শরীরে ও অন্তঃকরণে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া থাকে। সাধনের গুণে সকল সাধকের শরীরে ও অন্তঃকরণে এক এক প্রকার ভাব থাকে। সাধনা করিতে

করিতে যাঁহার যেমন শক্তি জন্মিয়াছে—যাঁহার যেমন অধিকার হইয়াছে, তাঁহার তেমনি আসনও নিরূপিত আছে। গৃহী ও সন্ন্যাসীর অধিকার এক নহে, শরীর ও অন্তঃকরণের অবস্থাও এক নহে, সুতরাং উভয়ের পক্ষে এক প্রকার আসন ও উপকারী নহে। তবে সাধারণতঃ যাহাতে বসিলে শরীর ক্লিষ্ট হয়, অধিকক্ষণ সুখ পূর্ব্বক বসিতে পারা যায় না, সেরূপ আসনে সাধক বসিবেন না। তাহাতে মন স্থৈর্য্যচ্যুত হইয়া যায় ও সাধনার ব্যাঘাত জন্মে। এই জন্য কাষ্ঠাসন, ধরাসন, শৈলাসন, পল্লবাসন আদি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং কুশাসন, রোমজাসন আদি প্রসিদ্ধ কল্পে গৃহীত হইয়াছে। কুশাসনে বসিলে জ্ঞানবৃদ্ধি ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়, কম্বলাসনে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, মৃগরোমজাসনে শুভ ফল পাওয়া যায়, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে সাধনা করিলে মোক্ষ লাভ হয়, কিন্তু ইহাতে অদীক্ষিত বা গৃহস্থের বসিবার অধিকার নাই। ব্যাঘ্রচর্ম্মে বসিলে অত্যুগ্র তেজের সঞ্চার হয়, তাহাতে অনিদ্রা, বীর্য্য শক্তির হানি আদি গৃহস্থের প্রতিকূল অবস্থা রাশি আসিয়া স্থিত হয়। কৃষ্ণাজিনও যতি, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক ব্যতীত গৃহিগণ ব্যবহার করিবেন না, ইহাতে বহির্ব্যাপার শক্তি, চেষ্টা, উদ্যম আদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তৃণাসনে বসিলে দরিদ্রতার সঞ্চার হয়, পল্লবাসনে বসিতে নাই, কেননা উহাতে চিত্ত-বিভ্রম হয়, কাষ্ঠাসনে পূজা করিলে পূজা ব্যর্থ হয়, দৌর্ভাগ্য দেখা দেয় ও রোগের সঞ্চার হয়। পাষাণাসনে রোগ ও বাগ্‌রোধের আশঙ্কা, ধরাসন দুর্গতি দুঃখ ও শোক জনক, সুতরাং উহা ধীমানের অকর্ত্তব্য। কেবল বস্ত্রের আসন রচনা করিয়াও বসিবে না, উহা তপস্যার হানিকারক ও দরিদ্রতার সূচক। বংশাসনে বসিলে বংশক্ষয় হইয়া থাকে। আম্র, নিম্ব, কদম্ব প্রভৃতি নির্ম্মিত আসনে সর্ব্বনাশ হয়, বকুল, কিংশুক, এবং পনসাসনে সাধক হতশ্রী হইয়া পড়েন, কেবল গাম্ভারী অশুভদায়ক নহে। যথা—

পাদ্মোত্তরখণ্ডে।

উপবিশ্যাসনে রম্যে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে।
রাঙ্কবে কম্বলে বাপি কাশাদৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি॥
ন কুর্য্যাদর্চ্চনং বিষ্ণোঃ শিবে কাষ্ঠাসনাদিষু।
কাষ্ঠাসনে বৃথা পূজা পাষাণে রোগসম্ভবঃ॥
ভূম্যাসনে গতির্নাস্তি বস্ত্রাসনে দরিদ্রতা।
কুশাসনে জ্ঞানবৃদ্ধিঃ কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা॥
কৃষ্ণাজিনে ধনী পুত্রী মোক্ষঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
মন্ত্রযোগং প্রকুর্ব্বীত ভোগার্থং সুখমাসনে॥

গান্ধর্ব্বে।

ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।
আম্রনিম্বকদম্বনামাসনে সর্ব্বনাশনং॥
বকুলে কিংশুকে চৈব পনসেষু হতাঃ শ্রিয়ঃ।
গাম্ভারীনির্ম্মিতং শস্তং নান্যদারুময়ং শুভং॥

কামাখ্যাতন্ত্রে।

ত্রিপুরায়াশ্চ রুদ্রস্য বিষ্ণোশ্চাপি কুশাসনং।
যথোক্তমাসনং কার্য্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং॥
ন যথেষ্টাসনো ভূয়াৎ পূজা কর্ম্মণি সাধকঃ।
বংশস্য ধরণীদারুতৃণপল্লবনির্ম্মিতং॥
বর্জ্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদং।
কাষ্ঠাসনে ভবেদ্রোগী বংশে বংশক্ষয়ো ভবেৎ॥

শৈলাসনে চ বাগ্রোধঃ পল্লবে চিত্তবিভ্রমঃ।
ধরণ্যাং শোকসংযুক্তঃ অতস্ত্যজ্যং বিচক্ষণৈঃ॥

তন্ত্রান্তরে।

জপধ্যানতপোহানিং বস্ত্রাসনং করোতি হি॥

সম্মোহনে।

ন দীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী।
বিশেদ্‌যতির্ব্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুকঃ॥

আসন দ্বি হস্তের অধিক দীর্ঘ, দেড় হস্তের অধিক প্রশস্ত ও তিন অঙ্গুলি অপেক্ষা উচ্চ না হয়। অতি নীচ বা অত্যুচ্চ না হয়।

নৈতদ্দ্বিহস্ততো দীর্ঘং সার্দ্ধহস্তান্ন বিস্তৃতং।
নত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছ্রায়ং পূজাকর্ম্মণি সংগ্রহে॥
আসনঞ্চ ততঃ কুর্য্যান্নাতিনীচং ন চোচ্ছ্রিতং॥

গৃহস্থগণের পক্ষে কুশাসন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও উপকারী। আমরা অনেককে নদীতটে বা পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে প্রস্তর বা ইষ্টক-নির্ম্মিত সিঁড়ীর উপর বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক পূজা করিতে দেখিয়া বড় দুঃখিত হই। অনেকে স্নান করিয়া বাটী আসিতে আসিতে পথে ঐ কাজটী সারিয়া লয়েন। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিপোষক, ভগবদারাধনা রূপ পরম পবিত্র কার্য্যটি একটু স্থির হইয়া বসিয়া করিলে ভাল হয়। বাটীর পরিষ্কৃত নিভৃত কক্ষে প্রথমতঃ একখানি স্থূল কুশাসন, তদুপরি একখানি স্থূল রোমজাসন পাতিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি বসিবেন। তদনন্তর যথাবিধি সন্ধ্যাহ্নিকাদি করিয়া দেখিবেন, মনটি কেমন থাকে, তপস্তেজ বৃদ্ধি হয় কিনা। শরীর স্বচ্ছন্দ, মন পবিত্র হইবে। যোগগ্রন্থে ত কুশাসনের যথেষ্ট সুফল লিখিত আছেই, একবার আয়ুর্ব্বেদেও কি লিখিত আছে তাহা পাঠ করুন।

"কুশোদর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।
ততোহন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈবচ।
দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণাবস্তিরুক্প্রদরাস্রজিৎ॥"

ভাবপ্রকাশ।

কুশ দ্বিবিধ। কুশ, দর্ভ, বর্হি, সুচ্যগ্রী, যজ্ঞভূষণ—একজাতীয় কুশ এই সকল নামে অভিহিত হয়। অন্য প্রকারের নাম দীর্ঘপত্র, ক্ষুরপত্র। এই দ্বিবিধ কুশই বায়ু পিত্ত কফ নাশক, মধুর, কষায় এবং স্নিগ্ধকর। দীর্ঘকাল উপবেশন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমন পূর্ব্বক মহত্তর উচ্চতর পদার্থ চিন্তনে নিযুক্ত থাকিলে যে সকল উৎকট পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, কুশ তাহারই অব্যর্থ ঔষধ। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ এবং প্রদর পীড়ার আরোগ্য হয়।

—o—

ন্যায়বান্ ঈশ্বরের উপাসনা।

আমরা এক এক সময়ে এক এক জনের ধর্ম্মমতের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া যাই। কোন্ আসুরিকী মায়া আসিয়া মনুষ্যের হৃদয়কে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহা সহসা বুঝিবার সাধ্য নাই। মনুষ্য যেন নটের পুত্তলির ন্যায় নিত্য নূতন নাচ দেখাইতে ভাল বাসে। বস্তুতঃ তাহাতে কল্যাণ বা অহিত হইবে, সে চিন্তা আদৌ হয় না। অভিমান মনুষ্যকে আপনার চক্ষে সকল অপেক্ষা মহান্ ও বুদ্ধিমান করিয়া তুলে। তাই মনুষ্য নিজের মতকে সকলের অবলম্বনীয় করিতে চাহে। যে বিষয়ে যাহার পূর্ণ প্রবেশশক্তি আছে, সে তাহার গুহ্য প্রহেলিকা ভেদ করিতে অধিকারী ও ক্ষমবান্। কিন্তু কেবল কল্পনার রেখায় রাজ্যের সীমা বাঁধিয়া অন্যকে তাচ্ছীল্য করিলে শোভা পাইবে কেন? আজ কাল প্রকৃত ধর্ম্মার্থব্যক্তা অতি বিরল হওয়ায়, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া যেখানে একটু প্রভুত্ব আছে, সেই খানেই নিজ অগাধ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আর্য্য ঋষি দিগের পৃষ্ঠে কষাঘাত করিতে চায়।

পত্র দ্বারা জ্ঞাত হইলাম, একজন নাকি সম্প্রতি বেহার অঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বালবৎশিখি সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনি সম্প্রদায়ের মত বা নিজ মত প্রচার করিতেছেন, তাহা খুলিয়া বলেন না। সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি আমাদের অনাদর নাই, সুতরাং সম্প্রদায়ের দিকে কটাক্ষ করিব না। কিন্তু তিনি যে বালবৎ ভাষণ করিয়া, লোক সকলকে ভ্রষ্ট করিতে চাহেন, তাহা আমাদের উপেক্ষাযোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলেন "ঈশ্বর সর্ব্বদাই ন্যায়বান্ এবং মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; কারণ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাঁহার ন্যায়পরতার ব্যতিক্রম ঘটে, অতএব ঈশ্বরের

উপাসনা, আরাধনা করা "হে পরমেশ্বর! পাপ হইতে আমাকে মুক্ত কর" বলা বাতুলতা। ইহাতে পাপ বৈ পুণ্য নাই, কারণ তুমি প্রার্থনা ও আরাধনা রূপ উৎকোচ দ্বারা তাঁহাকে ন্যায়-পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছ। উপাসনা আরাধনা করিতে হয়, ক্ষিত্যপ্ তেজঃ অগ্নির কর, অন্যান্য দ্রব্যের কর, তাহারা তোমার কার্য্যে আসিবে ইত্যাদি। ধর্ম্মান্দোলনের বর্ত্তমান অনুকূল সময়ে এই বিকট ধ্বনিতে সাধুহৃদয় অবশ্যই চকিত হইয়া উঠিতেছে। এই অসার মত নিতান্ত নির্ম্মূল ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। "ঈশ্বর ন্যায়বান্," কি বিচারবান্, ক্ষমাবান্, কি দয়াবান্ বা সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা তাঁহাকে কে বলিল? তিনি কি বক্তার কর্ণ আকর্ষণ করিয়া গোপনে বলিয়াছেন, "বাপু, আমার "ন্যায়" ভিন্ন অপর অনন্ত ভাব আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি"। "ন্যায়বান্" শব্দে বিশাল বক্তার বিষম বুদ্ধি যাহা বুঝিয়াছে, তাহা নহে। মনুষ্য "ন্যায়" বলিলে যাহা বুঝে, ঈশ্বর "ন্যায়" অর্থে তাহাই গ্রহণ করেন, তাহা কে বলিল? মনুষ্যের ন্যায় "ন্যায়বান্" হইলে ঈশ্বর বিধি নিষেধের বিচারক মাজিষ্ট্রেট সাহেব হইয়া বসিতেন। তিনি নিয়ম নিষেধের দাস নহেন, কিন্তু নিয়ম নিষেধই তাঁহার অনুল্লঙ্ঘনীয় আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। তাঁহার "ন্যায়" শক্তি অনন্ত ধারায় প্রবাহিত ও জীবের ভাব-প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া ফল বিধান করিয়া থাকে। আমি দুষ্কর্ম্ম করিলে তাঁহার "ন্যায়" শক্তি আমায় শাসন করিবে সন্দেহ নাই। আমি পরক্ষণেই নিজ ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া প্রাণ ভরিয়া ভক্তির সহিত পাপ হইতে অব্যাহতি বা মুক্তির প্রার্থনা করিলাম। "ন্যায়বান্" পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা কি উপেক্ষা করিবেন? তবে তাঁহার ন্যায়পরতা কোথায়? "দুষ্কর্ম্মও" যেমন একটী কার্য্য, তন্মুক্তির "প্রার্থনাও" কি একটী তাদৃশ কার্য্য নহে? যিনি প্রথমটীর ফলবিধানে "ন্যায়বান্", তিনি দ্বিতীয়টীর ফল দান না করিলে কি ন্যায়-পথ-ভ্রষ্ট হইবেন না? আইন-লিপির ন্যায় তাহার "ন্যায়" নহে।

তাঁহার সৃষ্টিসূত্রে "ন্যায়" গাঁথা রহিয়াছে। কুকর্ম্মীর দণ্ড দান যেমন "ন্যায়", উপাসকের কামনা পূর্ণ করাও তেমনই "ন্যায়"। উপাসক উৎকোচ দ্বারা তাঁহাকে ভুলাইতে চাহেন না। কিন্তু নিজ "ভক্তি" শক্তিসংবেগে অনন্ত শক্তির আধার ভূমি হইতে নিজ আবশ্যক শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসেন। ভক্তির ভাষায় ইহারই নাম "ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি"। অভাব ভাবকে আহ্বান করে, পূর্ণতা শূন্য স্থানকে অধিকার করে ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। ঈশ্বর পূর্ণ স্বরূপ, জীব অপূর্ণ—অভাবযুক্ত। যখনই জীব আপনার অভাব বুঝিয়া ভাব রাজ্যকে প্রগাঢ় মনন করিবে, তখনই অল্প তড়িৎ যুক্ত মেঘে অধিক তড়িদ্বান্ মেঘের সন্নিকর্ষ জন্য তড়িৎ-সামঞ্জস্যের ন্যায় সাধকের অভাব পরিপূর্ণ হইবে। ভক্তির ভাষায় ইহারই নাম "ভগবান্ দয়া করিয়া আমার পাপ তাপ দূর করিলেন।" উপাসকের মনোরথ পূর্ণ করিলে "ন্যায়বান্" ন্যায়ভ্রষ্ট হয়েন না। তাঁহার প্রাকৃতিক ন্যায়বিধিই তাহার সাক্ষ্য দান কয়িতেছে।

একটী লোষ্ট্র নিজ গুরুত্ব ও পৃথিবীর আকর্ষণ আদি শক্তি প্রভাবে দুইমাইল উপর হইতে বেগে ভূতলাভিমুখে নামিতেছে, ইহা ঈশ্বরের যেমন "ন্যায়" বিচার, একজন লোক নিজ হস্ত দ্বারা তাহার গতিরোধ করিল, ভূমিতে পড়িতে দিল না, তাহাও তাঁহার তেমনই "ন্যায়" বিচার। যে প্রাকৃতিক নিয়ম-গুণে একটী শক্তি অব্যাহত ভাবে কার্য্য করিতেছে, সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই আবার সেই শক্তি-প্রবাহ অন্য শক্তি দ্বারা প্রতিহত হইতেছে। ঈশ্বরের অনেক "ন্যায়" তোমার চক্ষে "অন্যায়" বোধ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন। অনন্ত শক্তির অনন্ত মহিমা (অনন্ত নাগ সহস্র সহস্র শীর্ষে) ধরা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সময়ে কুজ্ঝটিকা আম্র মুকুল রাশির উৎপত্তির সহায়, আবার অসময়ে সেই কুজ্ঝটিকাই মুকুল রাশির বিনাশক। ইহার উভয়ত্রই "ন্যায়" দণ্ড কার্য্য করি-

অনন্তদেব উৎকোচগ্রাহী ভাবিও না। উপাসনা বা আরাধনা করা যে পাপ মনে করে, সে জ্ঞান-বিজ্ঞান-গম্য ঈশ্বরের শক্তি-তত্ত্ব কিছু মাত্র অবগত নহে।

প্রার্থনা করিলে যদি কামনা পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে বরং "ন্যায়-বান্" নামে কলঙ্ক রটিত। উপাসনা বা আরাধনা উৎকোচ নহে; উহা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ শক্তিজাল আমন্ত্রণের বা আকর্ষণের যন্ত্র স্বরূপ। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যবস্থা লৌকিক রাজ্যের নিয়মাধীন নহে।

উক্ত বিশাল বক্তা আবার ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ আদির উপাসনাও করিতে বলেন। ধন্য তাঁহার বিশাল বুদ্ধি! তিনি 'উপাসনা" কাহাকে বলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঈষৎ উজ্জ্বলতার সহিত মূর্খতা মিশ্রিত হইয়া ঘোর নাস্তিকতা প্রচার করিতে লাগিল! যাঁহারা উপাসনা তত্ত্ব বা আর্য্য শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য সদ্‌গুরুর মুখে শ্রবণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের অনিষ্ট আশঙ্কা দেখিতেছি না, কিন্তু পাছে অল্পবয়স্ক বালক বা শাস্ত্র-জ্ঞানশূন্য লোক সমূহ ঈদৃশ মহাপ্রভুর মায়ায় অচৈতন্য হইয়া পড়েন, ইহাই চিন্তার বিষয়।

ভক্তি, পুপূজিষা, আদি মানবীয় মনোবৃত্তি নিচয় যদি দিন দিন যথোচিত উন্নতি প্রাপ্ত হয়, তবে কি উহা পিতা, মাতা আদি গুরুগণের চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে? যে ভক্তি যে ভাব লোককে লৌকিক জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, সে ভক্তি, সে ভাবের বিশ্রাম-ভূমি কোথায়? প্রাণ মন ঢালিয়া পূজা করিবার ইচ্ছা কি ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ আদিতে চরিতার্থ হইবে? ঈশ্বরের আরাধনার জন্যই এ সকল বৃত্তি মনুষ্য হৃদয়ে ন্যূনাধিক রূপে কার্য্য করিতেছে। দূর হইতে একটী পর্ব্বত দর্শন করিলে বোধ হয় যেন ধূম্রময় একখানি দিগন্তব্যাপী মেঘ উঠিতেছে। দর্শক যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই তাহার মনে

ধূম্ররাশি অপসারিত হয়। সম্পূর্ণ সমীপস্থ হইলে দেখিতে পায়, প্রকাণ্ড দুর্ভেদ্য প্রস্তরস্তূপ গগন স্পর্শ করিয়া অচল—অটল—দণ্ডায়মান। কত তরুলতা গুল্ম তৃণাদি তথায় উৎপন্ন হইতেছে, কত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সরীসৃপ তথায় বাস করিতেছে, কত নদীর উৎস উৎসারিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে, কত প্রবাল রত্ন ঝলকে ঝলকে প্রকৃতিকে হাসাইতেছে, কন্দরে যোগ নিদ্রাবলে কত যোগীর হৃদয় আনন্দসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। মূঢ় জগতের সম্মুখে ভক্তি উপাসনার রাজ্য তাদৃশ ভয়ঙ্কর অন্ধকারময়। গুরুর কৃপায় নিকটস্থ হইতে পারিলে অটল দৃশ্য উপলব্ধি হয়, রত্ন মণি মাণিক্যের ছটা দেখিতে পাওয়া যায়, মধুময়ী প্রেম-ধারায় হৃদয় ধুইয়া যায়। একাগ্র উপাসনা, ঐকান্তিকী ভক্তি মানব-জীবনে অনন্ত সুখ সৌভাগ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়।

—o—

শিব-লিঙ্গ-পূজা।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী। একে ত তাঁহার আকারবিশিষ্ট মুর্ত্তি পূজা করিতেই লোকে অসম্মত, তাহাতে আবার শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাঽপি কর্ত্তনং।
অনভ্যর্চ্চ্য ন ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনং॥
প্রত্যহং পরমেশানি! যাবজ্জীবং ধরাতলে।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং প্রিয়ে॥

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র।

অগ্নিহোত্রস্ত্রিবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
শিবলিঙ্গার্চ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি তে সমাঃ॥
অনেকজন্মসাহস্রং ভ্রাম্যমাণশ্চ যোনিষু।
কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা লিঙ্গার্চ্চনং নরঃ॥
যে বাঞ্ছন্তি মহাভোগান্ রাজ্যং বা ত্রিদশালয়ং।
তেঽর্চ্চয়ন্তু সদাকালং লিঙ্গরূপং মহেশ্বরম্॥

স্কন্দ পুরাণ।

প্রাণ বিনষ্টই হউক বা শিরশ্ছিন্নই হউক, ভগবান্ ত্রিলোচনকে পূজা না করিয়া ভোজন করিবে না। হে প্রিয়ে! হে পরমেশ্বরি! সমস্ত জীবই পরম ভক্তি সহ ব্রহ্মময় শিব লিঙ্গের পূজা করিবে। (শিবোক্তি)।

অগ্নি-হোত্রই কর বা ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদই অধ্যয়ন কর, অথবা বহু-দক্ষিণ যাগযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান কর, এতাবতের দ্বারা শিব লিঙ্গার্চ্চনার কোটী অংশের একাংশ ফলও লব্ধ হয় না।

সহস্র সহস্র বার ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া শিবলিঙ্গ পূজন ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি মুক্তি লাভে সমর্থ হয় ?

যাহারা অতুল সুখভোগ, রাজ্য বা স্বর্গ কামনা করিয়া থাকে, তাহারা সর্ব্বদা লিঙ্গরূপী মহেশ্বরের পূজা করুক।

বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতা-জ্যোতিঃ-সমাকীর্ণ ভারতহৃদয়ে হয়ত উপরোক্ত-শাস্ত্র-বচন-বক্তৃ-বর্গ "অশ্লীলতা নিবারিণী সভার" দণ্ডাধীন বলিয়া প্রতীত হইতে পারেন। মহাদেবও তাঁহাদের মতে অতি অসভ্য পাহাড়ী দেবতা। কেননা মস্তক, চরণ থাকিতে তিনি লিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা অনেক সময়ে অনেক লোকের মুখেই সিদ্ধিদেশ্বর শিবের এই "গর্হিত" অনুষ্ঠানের কথায় আন্দোলন করিতে শুনিয়াছি এবং অনেকে এই সংশয় নিরসনার্থ আমাদিগকে বারংবার অনুরোধও করিয়াছেন। আবশ্যক বোধে সংক্ষেপে এই কথাটীর রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

অনন্ত শক্তি ও অনন্ত মহিমার আধার পরমেশ্বরের গুণ-গরিমা বা পরিচয় জানিতে হইলে আমরা এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডের বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি মুহুর্মুহুঃ প্রণিধান করিতে বাধ্য হই। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র শিল্প-চাতুরী না দেখিতে পাইলে আমাদের চিত্ত তাঁহাকে জানিবার জন্য ধাবিত হইত কি না সন্দেহস্থল। এই মাত্র আকাশে বায়ু স্থির প্রবহমান ছিল, দেখিতে দেখিতে কাহার ইঙ্গিতে প্রচণ্ড পবন বহিতে লাগিল, সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ-মালায় আকুলিত হইয়া উঠিল, মহোচ্চ পর্ব্বত-চূড়া ভগ্ন হইয়া পড়িল, গৃহ অট্টালিকার উচ্চশির খসিয়া ভূমিতে লুটাইল, সারি সারি বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল, সমস্ত জগৎ ভীত, চকিত ও জাগরিত হইল! ইহা দেখিবা মাত্র মন লৌকিক জগৎ অতিক্রম করিয়া ভগ্নিয়ন্তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। এক একটী ব্যাপার দেখিয়া আর কত আশ্চর্য্যান্বিত হইব। সম্পূর্ণ জগতের বিচিত্র

রচনাই তাঁহার গুণ-গরিমা ঘোষণা করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ডের প্রতি মনোযোগ করিলে তাঁহার অপার মহিমা, তাঁহার স্বরূপ ও প্রকৃতি বোধের সুগমতা হইতে পারে। এই ব্রহ্মাণ্ডই প্রকৃতপক্ষে নিরাকার পরমেশ্বরের জ্ঞাপক, বোধক ও স্বরূপ বা লিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বরের মায়া বা প্রকৃতি মধ্যে যদিচ এরূপ ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রের জল-বুদ্বুদের ন্যায় কোটী কোটী উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে ও একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অনন্ত শক্তি ইয়ত্তা করা যায় না, তথাচ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার মহিমার ক্ষুদ্র ইঙ্গিতেই তাঁহার অচিন্তনীয় শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকেন।

লিঙ্গ শব্দে শিবের উপস্থ বা মেঢ্র উপলক্ষিত হয় নাই। লিঙ্গ তাঁহার বিভূতি, চিহ্ন বা মূর্ত্তি বিশেষ মাত্র। যথা—

"লিঙ্গং শিবস্য মূর্ত্তিবিশেষঃ।" ইতি মেদিনী।

"শিবলিঙ্গং শিব এব নতু শিবস্য শিশ্নঃ॥"

"শিবলিঙ্গ" শিবের শিশ্ন নহে—শিবের জ্ঞাপক মূর্ত্তি বিশেষ। এই অখণ্ডরূপী শিব স্বরূপকে (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) ভক্তি ভাব সহ পূজা করিলে জীবের ব্রহ্ম জ্ঞানের উদ্রেক হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ এই ভাবকে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া অন্তরে বাহিরে তাঁহার পূজা করিতেন। কেহ শিলায়, কেহ মৃত্তিকায়, কেহ স্ফটিক আদি মহামূল্য রত্নে শিবলিঙ্গ রচনা করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ এবং গৌরীপট্ট বা বেদিকা ভগবন্মায়া বা প্রকৃতি। এই মায়া হইতে উদ্গত ও মায়ার আশ্রিত অখণ্ড চিহ্নই সাক্ষাৎ দেবাদিদেবকে জানিবার একমাত্র উপায়।

"অলিঙ্গঃ শিব ইত্যুক্তো লিঙ্গং শৈবমিতি স্মৃতং।"

লিঙ্গ পুরাণ।

বিশুদ্ধ পরমাত্মা "লিঙ্গ" নামক কোন শরীর চিহ্ন নহেন। ঈশ্বরের অনন্যাধিক বা বিজ্ঞাপক চিহ্ন অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডই লিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়।

ভগবান্ সাংখ্যসূত্রকারও মহত্তত্ত্ব আদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে "লিঙ্গ" সংজ্ঞা দিয়াছেন, যথা:—

"হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্।"

অ, ১, সূ, ১২।

যাহার কোন কারণ আছে, যাহা অনিত্য, অব্যাপক, ক্রিয়াবান্, অনেক ও অন্যের আশ্রিত, তাহার নাম "লিঙ্গ"।

মান-চিত্রে মুদ্রিত বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা পর্ব্বত, নদী, নগর, মরু আদির জ্ঞান হয়, কেননা সেই গুলি পর্ব্বত নদ্যাদির জ্ঞাপক। স্বরূপতঃ চিহ্ন হইয়াও ঐগুলি অনায়াসে দর্শকের অন্তঃকরণে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গবিশিষ্ট গিরি, প্রবল তরঙ্গায়িত নদী, বহু জনাকীর্ণ জনপদ, সুবিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ মরুভূমির জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। শিবলিঙ্গও ব্রহ্ম-জ্ঞানের তাদৃশ পরিচয়-ভিত্তি-ভূমি। ভূগোল ভিন্ন যেমন মান-চিত্রের চিহ্ন গুলি বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান ভিন্ন শিবলিঙ্গ আদির প্রকৃত তত্ত্বও অবগত হওয়া কঠিন।

উপসংহার কালে আমরা লিঙ্গ পুরাণের উক্তির সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছি যে—

বহুনাত্র কিমুক্তেন চরাচরমিদং জগৎ।
শিবলিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য স্থিতমত্র ন সংশয়ঃ॥

অধিক কি বলিব, সমস্ত জগৎ শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়াই স্থির ভাবে স্থিতি করিতেছে, ইহাতে সংশয় নাই।

নির্জ্জন স্থান।

একদিন সাধু রামানন্দের নিকট দুই জন ধর্ম্মানুরাগী ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পুরুষ গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামানন্দের তপোবন নিতান্ত নির্জ্জন ও রমণীয়। স্থানের দৃশ্য-প্রভাবে মনে সহজেই শান্তি ও ভগবদ্‌ অনুরাগের উদয় হইয়া থাকে। পুরুষদ্বয় তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বনের স্বাভাবিকী শান্তিময়ী শোভায় বিমোহিত হইয়া বলিলেন, স্বামিন্! আমাদিগের কল্যাণার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বোপদেশ দান করুন। সাধু তাঁহাদিগের কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন তোমরা দুইটী বন-কপোত ও দুই খানি ছুরিকা আনয়ন কর। পুরুষদ্বয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে পর সাধু বলিলেন, তোমরা দুইজনে দুই নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া কপোতের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া আন, যেন কেহ তাহা দেখিতে না পায়। দুই জনে দুই দিকে গমন করিলেন। একজন অতি সত্বরেই কপোতের কণ্ঠ কর্ত্তন করিয়া সাধুসমীপে প্রত্যাগত হইলেন। অপর ব্যক্তির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া সাধু বসিয়া থাকিলেন! সমস্ত দিন অতিবাহিত হয় তথাচ তাঁহার দেখা নাই; অবশেষে সেই ব্যক্তি সন্ধ্যাসমাগমে ছুরিকা ও জীবিতাবস্থায় কপোতকে লইয়া ম্লান মুখে সাধু সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, স্বামিন্! আপনার আজ্ঞা-পালনে আমি নিতান্ত অসমর্থ। সাধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এবং অপর ব্যক্তি তাহার বহু পূর্ব্বে যে কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিলে তিনি বলিলেন যে বহু ভ্রমণ ও সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়াও এমন নির্জ্জন স্থান পাইলাম না, যেখানে কেহই দেখিতে পায়না। আমি যেখানেই যাই এবং কপোতের কণ্ঠচ্ছেদে উদ্যত হই, সেই

নির্জ্জন স্থান আমি পাইলাম না এবং আপনার আদেশও প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। এতৎশ্রবণে সাধু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন বৎস, তুমি তত্ত্ব-কথা শুনিবার উপযুক্ত, কেন না, যে সকল ব্যক্তি বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্মার্থগ্রাহী না হইয়া কেবল ভাষার শব্দার্থ ..., তাহাদিগকে সাধুগণ উপদেশ দান করেন না। তাহারা গূঢ় ...ার বিপরীত অর্থ উপলব্ধি করিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর যে সর্ব্বসাক্ষী, কোনমতেই যে কোন বিষয় তাঁহাকে গোপন করা যায় না, তিনি সর্ব্বদা জাগ্রৎ ও সাক্ষী স্বরূপ, ইহাই তোমরা বুঝিয়াছ কিনা দেখিবার জন্য এই পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এ ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া বৃথা একটী প্রাণিহানি করিল, এতাদৃশ পুরুষ তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ শুনিবার অযোগ্য। তুমি সময়ান্তরে আমার সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিও—এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

জীব! তুমি নিজ গুপ্ত দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য কত বার নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিয়া থাক। জগতের কোন লোক সেখানে নাই সত্য, কিন্তু যিনি সমস্ত জগদ্ব্যাপী, তাঁহার বিদ্যমানতা, তাঁহার সর্ব্বদর্শী চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি কি তুমি রোধ করিতে পার? তাঁহাকে লুকাইয়া কার্য্য করিবার কোন উপায়ই নাই, সুতরাং তোমার নির্জ্জন স্থান নাই। পাপ-প্রবৃত্তির সময় সাবধান হইবে।

ভক্ত! জগতের সমস্ত লোকই তোমার বিরোধী। তোমাকে নির্য্যাতন করিতে সকলেই তৎপর! তুমি মনে করিওনা যে তুমি একাকী, তোমার সঙ্গে কেহ নাই ও তুমি সহায়-শূন্য। যাঁহাকে কেহই দেখিতে পায়না সেই ভবভয়হারী তোমার সহচর। যখন সংসারের প্রপীড়নে দুঃসহ বেদনায় কাতর হইয়া তুমি নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুপাত করিবে, তখন দেখিবে তোমার হৃদয়-সখা তোমার অন্তর্বাহ্য বেষ্টন পূর্ব্বক তোমাকে

রক্ষা করিতেছেন। তুমি অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হও, সম ... হইতে নিষ্কাশিত হও, বিজন মরুতে নির্ব্বাসিত হও, তথাচ তুমি একা পারিব

সাধক! তুমি সংসারের কোলাহলে বিরক্ত হ ... পরিত্যাগ করিলে, ভাবিলে নিভৃত নির্ঝর-তটে বসিয়া তুমিই ... ধনা করিবে। তুমি গৃহত্যাগী হইতে পার, তুমি সমাজ কথিত ... হ ... র, তুমি স্বজন পরিজন পরিত্যাগী হইতে পার, তুমি ধন ... প্রদ ত্যাগী হইতে পার, কিন্তু নির্জ্জন স্থান পাইবার উপায় কি? তুমি যেখানেই থাক যতদিন তোমার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল কর্ম্মোদ্যত থাকিবে, তত দিন তোমা অন্তর্গৃহ কোলাহল-পরিশূন্য হইবেনা। যতদিন তোমার মনে বিষয়ের চিন্তা উদয় হইতে থাকিবে, তত দিন তোমার একান্ত-নিবাসের আশা কোথায়?

এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণো
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহন্তপোবনম্॥

মন হইতে বিষয়ানুরাগ বিদূরিত না হইলে বনে গমন করিলেও গৃহাবস্থান জন্য দোষরাশি বিনষ্ট হয় না। আবার গৃহে থাকিয়াও যিনি পঞ্চেন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিতে পারেন, তিনি বনবাস পূর্ব্বক তপস্যার ফলভাগী হইতে পারেন। অনিন্দিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তমান গৃহস্থের গৃহই তপোবন। অতএব সাধক! ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তিশূন্য অবস্থায় অবস্থিতির নাম নির্জ্জন বাস।

যোগীন্দ্র! তুমি সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া, মনের কোলাহল

উপলব্ধির অগম্য। তোমার নিবাসই প্রকৃত নির্জ্জন-বাস। তুমি পরমাত্মার গভীর সত্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখিতে পাইতেছ না। শাস্ত্রে লিখিত আছেঃ—

স্ত্রৈপ্রিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাম্
ক্ষেমস্য সম্যখিম্নষেষু হেতুঃ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি
দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা॥

দেহ মন আদিতে নিরভিমান ও নির্গুণ পরব্রহ্মে ঐকান্তিকী রতিই জীবের পরম কল্যাণ-সাধনানুকূল বৈরাগ্যব্রতের একমাত্র হেতু।

অতএব হে মাহভাগ! তুমি দেহাত্ম-বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক বিজনবাসে সুখে বিহার করিতেছ, তোমার নিকট রূপ রস গন্ধ শব্দাদির কোলাহল নাই, তোমার নিকট উত্তম, অধম, নিকট, দূর, ক্ষুদ্র, বৃহৎ আদি বিরুদ্ধ ভাবের উপদ্রব নাই, তোমার নিকট আত্মীয়, পর, অত্র, তত্র, তৎ, এতৎ, শুভ, অশুভ, অহং, ত্বং, জ্যোতিস্তমঃ আদির পৃথক্ বুদ্ধি নাই। তুমিই একাকী এবং তুমিই নিতান্ত নির্জ্জননিবাসী।

বুঝিলাম নির্ম্মল হৃদয়ই নির্জ্জন স্থান।

—o—

আমার অভিমান।

অভিমান সমস্ত দুঃখের মূল। যখনই কোন কার্য্যের জন্য আমার অভিমানের উদ্রেক হইয়াছে, আমি তাহাতেই দুঃখ পাইয়াছি, ইহা আমার জীবনের পরীক্ষিত ফল। আমাকে কেহ তিরস্কার করিলে আমার নিজ গৌরবের অভিমান আমাকে উদ্বেজিত ও ক্রমে তৎসহ বিবাদে প্রবৃত্ত করে। কেহ আমার নিন্দা করিলে আমার মহত্ত্বের অভিমান আমাকে উত্তপ্ত করে ও অন্যের দোষানুসন্ধানে পরামর্শ দেয়। আমার কার্য্যের অপটুতা দেখিয়া কেহ উপহাস করিলে অভিমান আমাকে নিতান্ত নির্ব্বেদ-গ্রস্ত করে ও আমার হৃদয় নীরবে রোদন করিতে থাকে। আমি বিদ্যাবান্, বিনা আমন্ত্রণে আমি কোন ভদ্র-সমাজে যাইব কেন, এই অভিমান আমার অনেক সময় অনেক সৎ-সমাগম ও জ্ঞানোন্নতি সাধনে বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছে। আমি ধনবান্, অমুক স্থানে গেলে পাছে আমি উচ্চ আসন না পাই, এই অভিমান কত দিন আমাকে কত আশ্চর্য্য প্রদর্শনীর আমোদ-লাভে বঞ্চিত করিয়াছে। কত দিন আমি সরলহৃদয় কৃষক ও ভৃত্যের সহিত অসঙ্কোচে হৃদয় খুলিয়া সদালাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রভুত্বের অভিমান কেশাকর্ষণ করিয়া আমাকে বারণ করিয়াছে। শুনিলাম, অমুকের ভৃত্য আমার ভৃত্যকে কটূক্তি করিয়াছে, অমনি অভিমান ভৃত্যের সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদীর প্রভুর সহিত কলহ-কোলাহলে প্রবৃত্তি দিল। অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ক্রমে আমি নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম। আমি দর্শন-শাস্ত্রে সুনিপুণ পণ্ডিত, যখনই সভা মণ্ডপে অন্য একজন পণ্ডিতকে "ঈশ্বরোঽস্তি", ইত্যাকার প্রতিপাদন করিতে শুনিলাম, অমনি আমার অভিমান আমাকে তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া "ঈশ্বরোনাস্তি" এই পাপপূর্ণ সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্তি

কত সদ্ব্যবস্থাকে অব্যবস্থা করিয়া প্রমাণ করিয়াছি, কত পাপ করিয়া লোকের সমক্ষে সাধুতার পরিচয় দিয়াছি। অভিমানই আমাকে কপট করিয়াছে, অভিমানই আমাকে বিবাদী করিয়াছে, অভিমানই আমাকে ঘোর নরকের কুটিল পথ দেখাইয়া দিয়াছে। হা! অভিমানই আমার পরম শত্রু হইয়া ভক্তের—মহাত্মার চরণ চুম্বন করিতে বাধা দিয়াছে, অভিমানই আমাকে অন্যের সৎকথা শুনিতে নিবৃত্ত করিয়াছে, অধিক কি অভিমানই আমাকে সমস্ত সুখের মূল ধর্ম্মসাধনে বারংবার বারণ করিয়াছে। হা! আজ অভিমান বশতঃই আমি ভাগবতী কথা শুনিতে শুনিতে অশ্রুমোচনে লজ্জা বোধ করিতেছি, অভিমানই আমার সর্ব্বনাশ করিল। অভিমান! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, আমার সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হউক। একবার সর্ব্বত্র সম দর্শনে আমি পরমানন্দরস পান-করিয়া চির দুঃখের প্রবলানল নির্ব্বাণ করি, প্রাণ পরিতৃপ্ত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—o—

রূপমাধুরী।

মনুষ্যের চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির মধ্যে চাক্ষুষী বৃত্তি অতি প্রবল। মনুষ্য এই পাঁচ ইন্দ্রিয় সহযোগে যত কার্য্য করিয়া থাকে তন্মধ্যে শ্রুত, আঘ্রাত, অস্বাদিত ও স্পৃষ্ট বিষয়-গুলি অপেক্ষা দৃষ্ট বিষয়টী বহুদিন স্মরণ থাকে। চক্ষুর সমাচার মন স্বভাবতঃ যত গ্রহণ ও রক্ষা করে, সেরূপ অপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় গুলি করে না। চক্ষু রূপপ্রিয়; এই জন্য মন রূপমাধুরীতে সহজেই বিমোহিত হইয়া থাকে। সুন্দর বস্তু যেমন মনোহর, এমন আর কিছুই নহে। আমরা যখন সংসার-সুখে উন্মত্ত থাকি, তখন একটী মণিমুক্তাজড়িত সুবর্ণপাত্র আমাদের মনোহরণ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল আমাদিগের মনকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না। যখন অনুতাপ ও দুঃখের অশ্রুতে নয়ন ভাসিতে থাকে, তখন ঐ সৌন্দর্য্য আমাদের চিত্ত ক্ষেত্রকে পরিহার করে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা সৌন্দর্য্য-প্রত্যাশায় পরাঙ্মুখ থাকিব না। মনোমোহিনী রূপমাধুরীর অনুগমন করিব এবং শনৈঃ শনৈঃ উহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব।

রূপমাধুরী সর্ব্বত্রই লীলা করিতেছে, ইহাকে অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সময়ে সময়ে ইহা মনোবুদ্ধি কল্পনার অতীত রাজ্যেও পলায়ন করিয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসু সুচতুর হইলে উহার তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন। রূপমাধুরী কুহকিনীর ন্যায় এক স্থানে লীলা করিতে করিতে আবার ক্ষণমধ্যেই অতিদূরে প্রতীয়মান হয়। রূপমাধুরী কখন কুসুমদলে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে, কখন নবীন পল্লবের হরিতবর্ণে মিশিয়া সকলকে মোহিত করিতেছে, কখন একাণ্ড বটবৃক্ষের শীতল-ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে, কখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালায় নৃত্য

করিতেছে, কখন শ্মশানভূমিতে বিচরণ করিয়া সাধকের মন ভুলাইতেছে, কখন যুবতীর হাস্য-বিকসিত বদনে প্রকাশিত হইয়া জীবগণকে মুগ্ধ করিতেছে, কখন শুভ্র মেঘের বসন পরিধান করিয়া জনশূন্য শস্যক্ষেত্রে বিহার করিতেছে, কখন সুগভীর নীল ফেনিল সমুদ্রসলিলে তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গ করিতেছে, কখন পর্ব্বতের সমুচ্চ শিখরে উঠিয়া জগতের চন্দ্ররাশিকে আহ্বান করিতেছে, আবার কখন নব দুর্ব্বাদলশ্যাম অঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে আমোদ প্রমোদ করিতেছে। রূপমাধুরীর মায়ায় বিমোহিত হইয়া জগৎ অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। রূপমাধুরী ধনী ও দরিদ্রকে, মূর্খ ও পণ্ডিতকে, অজ্ঞ ও বিজ্ঞকে, ক্ষীণ ও বলীকে, জড়বুদ্ধি ও চতুরকে, বালক, যুবা ও বৃদ্ধকে, স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীবকে সমভাবে বিমোহিত করিতে পারে। রূপমাধুরী জড়কে কর্ম্মঠ, ধীরকে বিচলিত ও কঠিনকে কোমল করিতে পারে। ধ্রুবের রূপমাধুরী উত্তানপাদ রাজাকে অপমানিত করিল, সীতার রূপমাধুরী দশাননকে স্বগণসহ যমালয়ে প্রেরণ করিল। বারাঙ্গনাগণের রূপমাধুরী শৃঙ্গী ঋষিকে সংসারাসক্ত করিল, মৎস্যগন্ধার রূপমাধুরী পরাশরের গৌরব হানি করিল, অনলের রূপমাধুরী পতঙ্গকে দগ্ধ করিল, সত্যের রূপমাধুরী যুধিষ্ঠিরকে বনবাসী করিল; শুকদেবের প্রকৃতিসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার রূপমাধুরীর নিকট রম্ভার অলৌকিকী রূপমাধুরী পরাভব মানিল। রূপমাধুরী ত্রিজগৎ শাসন করিয়া, দিঙ্মণ্ডল মোহিত করিয়া ও চতুর্দ্দশ ভুবনকে উন্মত্ত করিয়া লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তথাচ কেহ তাহাকে বশীভূত করিতে পারিতেছে না। রূপমাধুরীর মায়ামন্ত্রে মোহিত হইয়া মানব-মণ্ডলী আপনার মন অন্যকে দান করিতেছে, বীরবর্গ বলবীর্য্য বিহীন হইতেছে, পরাক্রমশালী মহাত্মগণ মনুষ্যত্ব হারাইতেছে।

মনুষ্য বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডের রূপমাধুরীতে আসক্ত হইয়াই রূপ মাধুরীর স্মরণ স্বরূপ মহাতীর্থ-সন্দর্শনে যাইতে পারে না। সে তীর্থে অপরূপ

রূপমাধুরী। সেই পরমাশ্চর্য্য রূপমাধুরীর একটু আভাসেই এত রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। আহা! সেই অপরূপ রূপ অবলোকন করিলে কি আর এই সকল রূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়! সেই পরম পবিত্র রূপ-সাগরে একবার অবগাহন করিলে এই "নাম-রূপ" বিশিষ্ট জগৎ অসৎ বোধ হয়; সে রূপের তুলনা নাই। যোগিগণ সেই রূপসাগরের সুশীতল জলে স্নান করিতেছেন বলিয়া আর এই সামান্য রূপ দেখিবার জন্য নয়ন উন্মীলন করেন না। একজন সাধক একটী পরম রূপলাবণ্যবতী যুবতীর বিকশিত বদন কমল দর্শন পূর্ব্বক মোহিত হইয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন, যুবতী তাঁহাকে তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, যে আমি জন্মাবধি তোমার আশ্চর্য্য রূপের ন্যায় কোন রূপ দেখি নাই, কিন্তু তোমার অতুল রূপমাধুরী দেখিয়াই ভাবিলাম যে যিনি এই রূপের রচনা করিয়াছেন, না জানি তাঁহার কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় রূপই হইবে, সেই রূপ-মাধুরী দেখিতে পাইলাম না বলিয়া আমি রোদন করিতেছি!

মানব! তুমি কি সামান্য রূপে বিমুগ্ধ রহিয়াছ, রূপ-মাধুরীর আধারকে স্মরণ কর। অবোধ বালকের ন্যায় সুচিত্র কন্দুক লইয়া আর কত দিন ভুলিয়া থাকিবে? এই যৎসামান্য রূপ-মাধুরীর লোভ ত্যাগ কর, তোমার জন্য আশ্চর্য্য রূপের ভাণ্ডার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। একবার সজলনেত্রে বালকবৎ সরল চিত্তে জগন্মাতার প্রেমাঞ্চল ধরিয়া প্রার্থনা কর, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। তুমি তাঁহার কনিষ্ঠ * সন্তান, তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবে না। একবার চক্ষুরুন্মীলন কর, অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরীর আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে।

* সমস্ত জীবসৃষ্টির পর মনুষ্যসৃষ্টি।

—o—

শরদুৎসব।

কালের বিশালবক্ষে নৃত্য করিতে করিতে, ভারতের মহা মহোৎসবের দিন অগ্রসর হইতেছে। বর্ষা নিদাঘকালীন প্রভাকরের প্রখর কিরণের দর্প চূর্ণ করিয়া, তটিনী তড়াগ আদি ভাসাইয়া, ভগ্ন গৃহ গুলিকে ভূমি-সাৎ করিয়া ঘোর রোলে দিগ্দিগন্তবাসীকে ত্রস্ত করিয়া, মণ্ডুকাদির হর্ষোৎপাদন করিয়া, ধীরে ধীরে ভারত রঙ্গভূমি হইতে অবসর লইল। সম্মুখে শরৎকাল; প্রকৃতির মূর্ত্তি অতি মনোহর হইয়া উঠিতেছে। বর্ষা আসিয়া তরুলতাগুলির গাত্রের ধূসর ধূলিরাশি ধৌত করিয়া, মলিন মুখ মার্জ্জনা করিয়া, পত্র পল্লব পুঞ্জকে সতেজ করিয়া তাহাদিগকে শরদে ভারতের উৎসব-ক্ষেত্রে অভিনয় করিবার উপযোগী করিয়া, কালের গভীর গর্ভে লুকায়িত হইল। নিশার শিশির রাশি ললিত তৃণ গুলির উপর পড়িয়া অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, যেন শারদীয়োৎসবের জন্য প্রকৃতি মণিমুক্তাখচিত আস্তরণ বিস্তার করিয়া রাখিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতার পাতায় পাতায় শিশির পড়িয়া মুক্তার ন্যায় ঝুলিতেছে, যেন শারদীয়োৎসব দেখিবার জন্য অগণ্য পুরবালিকা আসিয়াছে। তাহাদের নাসিকায় একটী একটী মুক্তার শোভা হইয়াছে। সূর্য্য প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন; মধ্যে মধ্যে মেঘমালা আসিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিতেছে। দিবাতে বৃক্ষের ছায়ার দিকে দৃষ্টি করিলে, নয়ন সুশীতল হয়। রাত্রির তুলনা নাই। সুনীল আকাশে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র মণ্ডল বিকশিত হইয়া যেন একখানি নীল চন্দ্রাতপ উজ্জ্বল মণিমালায় খচিত করিয়া তুলিতেছে। শরদাগমে সুধাকরের আহ্লাদের সীমা নাই, হাসিতে হাসিতে তারাগণের সঙ্গে অনন্ত আকাশে লীলায় প্রবৃত্ত; নীরব রজনীতে শারদিন্দুর এই প্রসন্ন প্রত্যক্ষ ও তাঁহার সুচারু হাস্য বিকশিত বদন বিলোকন করিয়া

কুমুদিনী আর চুপকরিয়া থাকিতে পারে না! অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া যেন মৃদু মধুর হাস্তে তাঁহার সম্ভাষণ করিতেছে এবং হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সরসীর বায়ু বিতাড়িত চঞ্চল বারির সঙ্গে মিলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রকৃতির মুখে আর হাসি ধরে না। বিশাল নীল গগনে নক্ষত্রমালা হাস্ত করিতেছে। ভুমিতে যূথী, জাতি, মালতী, মল্লিকা, শেফালিকা, রজনীগন্ধা আদি তরুলতা প্রফুল্ল কুসুমদামে বিভূষিত হইয়া হাস্ত করিতেছে, কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে সরসীর জলে ঢলিয়া পড়িতেছে, সমস্ত জগতই আজ হাসিমাখা। নক্ষত্র গুলি হাসিতে হাসিতে এক একবার বারিদবসনে মুখ ঢাকিয়া লজ্জা সম্বরণ করিতেছে। আবার এদিকে পবনদেবও আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন। তিনি আহ্লাদে মত্ত হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া বেড়াইতেছেন। পিতার ন্যায় স্নেহভরে একবার এফুলটির মুখ একবার ওফুলটির মুখ চুম্বন করিয়া যেন তনয়গণকে আদর করিতেছেন। এক একবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু লতাগুলিকে আদর সহ ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন; ফুলগুলির পরিমল লইয়া ভারত আমোদিত করিতেছেন। প্রকৃতির আনন্দ দেখিয়া কেহই স্থির নহে, সকলের মনেই আনন্দের নদী উথলিয়া উঠিল। তরঙ্গিণীগণ তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে, নির্ম্মল চন্দ্রিকাজাল লহরীমালায় সুস্নিগ্ধ ভাবে ক্রীড়া করিতেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যও যেমন সুন্দর, শরদের উৎসবও তেমনই মনোহর।

লোকে বলিতে পারে, এই দুঃখের দিনে আবার উৎসব কেন! দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বহুবৃষ্টি, সংক্রামক পীড়া, রাজবিগ্রহ, সমাজবিপ্লব আদি ভারতকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে; ভারতের নিশ্চিন্ত হইয়া একটী নিশ্বাসও ফেলিবার অবকাশ নাই; ইহাতেও উৎসব? আমরা বলি, ভারত এই উৎসব ভুলিতে পারিবে না। ভারতের শরীরে যত দিন শোণিত প্রবাহিত থাকিবে ও যত দিন ভারতের স্মৃতিশক্তি বিলপ্ত না

হইবে, তত দিন এ উৎসব ভারত ভুলিতে পারিবে না ; বাস্তবিকও এ উৎসব চিরানুষ্ঠানের যোগ্য। এই উৎসব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা, দুর্ব্বলের বলবিধান, নিরাশ্রয়ের সহায়তা, নির্ব্বীর্য্যের তেজ উদ্দীপনা, মূঢ়ের জ্ঞান সঞ্চার, দুঃখীর দুঃখাপনোদন করিবার আশাস্থল। এই উৎসব নিঃস্বকে ধনী করিবার, অহঙ্কারীর দর্পচূর্ণ করিবার, ভক্তকে সুখী করিবার, গুণবান্‌কে পুরস্কার দান করিবার, দোষীকে দণ্ড দিবার, পতিতকে উদ্ধার করিবার ও দুঃসাধ্য সাধন করিবার মহামন্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকে। এ উৎসব তামাসা নহে, ইহা আমাদিগের জীবনের উৎসব। এই উৎসবই ভাবী ভারতের ভরসাস্থল। এ উৎসব বাহিরের—বঙ্গ ভূমির উৎসব নহে, ইহা পুণ্যক্ষেত্র আর্য্যভূমির উৎসব, আমাদিগের সমস্ত ভারতের—হৃদয়ের মহা মহোৎসব!!

রামলীলা।

অচেতন ভারতে চেতনাসঞ্চার করিবার ইহা অপেক্ষা আর উৎসাহকর লীলা আমাদিগের ভারতে নাই। ভারত যেরূপ নিস্তব্ধ, নির্ব্বীর্য্য ও নিদ্রিতপ্রায়, রামলীলা তাহারই মহৌষধ। ইহাতে উত্তেজনা, বিক্রম ও উৎসাহের উদ্দীপনা করিয়া দেয়। রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাস্ত্রে তাড়কা বধ করিলেন, তখন আমরা বুঝিলাম যে, ব্রহ্মানুভব ও বিজ্ঞান-শাস্ত্র-শিক্ষায় আর্য্যগণ ভারত হইতে অনার্য্যগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। যখন লীলাক্ষেত্রে জনক রাজার সভায় সীতার স্বয়ম্বর সময়ে "নির্ব্বীর-মুর্ব্বীতলং" এই হৃদ্বিদারক ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, অমনি হৃদয় চমকিয়া উঠে, চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর জিতেন্দ্রিয় সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণের সুচারু চরণ চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে তখন কোন্ ভগ্ন হৃদয়ে উত্তেজনার সহিত শিরায় শিরায় সমুষ্ণ শোণিত বহিতে না থাকে! অহো! উক্ত তিরস্কার বর্ত্তমান ভারতের সম্পূর্ণ উপযোগী। যখন গম্ভীরমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকে বীরদর্পে হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিতে দেখি, তখন আমা-দিগের আশার সঞ্চার হয় এবং বিক্রমবলেই আর্য্যগণ যে ভারতলক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন, ইহা প্রতীত হইতে থাকে। যখন দেখি অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অকলঙ্ক শ্রীরামচন্দ্র অধিরোহণ করিতে গিয়া বনবাসী হইলেন, হা! তখন কোন্ পাষাণহৃদয় গলিয়া না যায়! কোন্ মনুষ্যের চক্ষু অশ্রু বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে! কোন্ কঠোরচিত্ত রত্নমূর্ত্তিকে বনে পাঠাইতে পরামর্শ দেয়! হা! উপযুক্ত পাত্রে রাজ্যভার সমর্পণ করিতে—যাঁহার রাজ্যশাসনকালে প্রজাগণ নিরুপদ্রব থাকিবে তাঁহাকে

সমর্থ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা! কোথায় আর্য্যগণ মহাসুখে ভারত-লক্ষ্মী ভোগ করিবেন, না, কালচক্র সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চনা করিবার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিল। যখন লীলা-ক্ষেত্রে মায়ামারীচের অভিনয় দর্শন করি, তখন বিজাতীয়দিগের চাতুরীপূর্ণ বাণীতে বিশ্বাস করত পরিণাম-বিচারে অসমর্থ হইয়া আর্য্যজাতি কিরূপে পতনোন্মুখ হইলেন, তাহা বুঝিতে পারি। রঙ্গ-ভূমিতে দুরাচার দশানন আসিয়া, রাক্ষসী মায়া বিস্তার পূর্ব্বক জানকীর কেশাকর্ষণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গেল, উঃ! কি দুর্দ্দিন! কি দুর্ঘটনা! ভাবিলে, স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আজ আর্য্যজাতি ভারত-লক্ষ্মী হারাইলেন! সীতার সহিত লক্ষ্মণের ভেদ, গৃহ-বিচ্ছেদই এই দুর্ঘটনার মূল! কি কুক্ষণেই যে ভারত-লক্ষ্মী পূর্ণেন্দুকে কালরাহু গ্রাস করিল আর মুক্ত হইল না। অহো! ভারতবাসিন্! একবার রঙ্গভূমিতে সমাগত হও, একবার দেখিয়া যাও, তোমাদের পিতৃগণের রোপিত সুখতরুর উচ্ছেদ হইতেছে। মারীচী মায়া তোমাদের চির দুর্দ্দশার ভিত্তি স্থাপন করিল। পঞ্চবটীবন (ভারতবর্ষ) অন্ধকার করিয়া সীতা সমুদ্র-পারে নীত হইলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপিণী সীতার অভাবে ভারত আজ অরণ্যানী হইল। এক্ষণে উপায় কি! দেখ দেখ লীলাক্ষেত্রে অতঃপর সীতা উদ্ধারের কি কৌশল বিস্তার করা হইতেছে। শ্রীরাম তপস্বী বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া সুগ্রীব সহ সখ্য স্থাপন করিলেন। বনের পশু, পক্ষীও তাঁহার প্রতি রাবণের অত্যাচার দেখিয়া রোদন করিল ও তাঁহার সহায়তার জন্য মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। তাঁহার বালযোগী বেশ, সৌজন্য ও উৎসাহ সকলকেই মোহিত করিয়া ফেলিল; হনুমান সাগর পার হইয়া গিয়া লঙ্কা হইতে সীতার তত্ত্ব আনিলেন, লঙ্কাতে নিজ বীরত্বের চিহ্ন চিত্রিত করিয়া আসিলেন। নীল, নল, গয়, গবাক্ষ, সুষেণ আদি সকলে শ্রীরামের সহযোগিতা করিতে একত্র হইলেন। সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ

হইল, দাশরথি সমরনীতি অনুসারে যুদ্ধ সজ্জা করিলেন। সমুদ্রকূলে মহাবিক্রমশালী বীরবর্গের শিবির সন্নিবেশিত হইল। রাম রাবণের ঘোর সমর! ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাদ্যে বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় বীরগণের বিক্রম-গর্জ্জন অভ্রভেদ করিয়া দেবলোক পর্য্যন্ত চকিত করিয়া তুলিল। যুদ্ধাস্ত্র সকল সুশাণিত ও বহির্ম্মুখ হইল। ভারতবাসিন্! এস মনোযোগ পূর্ব্বক এই লীলা দর্শন করি। ভারত-লক্ষ্মীকে হারাইয়াছি। আলস্যের সহ মিত্রতা করিতে, ভগবদুপাসনা, সৌজন্য ও উৎসাহকে আশ্রয় করিতে হইবে, পৃথিবীর দিগ্দিগন্তের মহামনস্বিগণ আমাদের দুঃখের বার্ত্তা শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, আমাদিগের স্বাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহারা যথোচিত সাহায্য করিবেন। বাণিজ্য, বিজ্ঞান বলে, সমুদ্রের দুই পার এক করিতে এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, বিজ্ঞানাদিরূপ সুশাণিতাস্ত্রে পরপারবর্ত্তিগণকে পরাভব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। পরস্পর দ্বেষ, হিংসা পরিহার করিয়া ভারতের আভ্যন্তরিক উন্নতিসাধন জন্য, সকলে প্রেমালিঙ্গন কর। শ্রীরামচন্দ্র সীতার জন্য অতি নীচকেও আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আজ রামচন্দ্রের গুণে বশীভূত হইয়া রাবণানুজ বিভীষণ, তৎসহ মিত্রতা করিবার জন্য অভিনয়ক্ষেত্রে সমাগত; ইনিই রাবণ বিজয়ের প্রধান সহায়, ইনিই সীতা উদ্ধারের প্রকৃত উপায় শিক্ষা দেন, ইঁহাকেই ভারতের ভাবী রাজচক্রবর্ত্তিচূড়ামণি পরম মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভারত! ইউরোপীয়দিগের সহিত মিলনই আমাদিগের বিভীষণের সম্মিলন বলিতে হইবে। ইঁহাদিগের কৃপায় আমরা অনেক শিক্ষা করিয়াছি। যে দিন হইতে ভারত-লক্ষ্মী আর্য্যগণের অঙ্কপাশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আমরা মূর্চ্ছিত—মৃতপ্রায়; ইঁহাদের একত্রবাসে ইঁহাদিগের শিক্ষা প্রভাবে, আমাদিগের নিজ সম্পত্তি ভোগ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে, এবং ইঁহারা অধিকার পুনর্লাভের উপায়, ইতিহাস ও রাজনীতি দ্বারা শিক্ষা

দিতেছেন। দেখ দেখ! লীলাক্ষেত্রে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া সুমিত্রা-কুমার মহাবীর মেঘনাদকে নিপাত করিতেছেন! আহা! এটী কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! চতুর্দ্দশ বর্ষ অনাহারে ও অনিদ্রায় বীরবরের শ্রীরাম-সেবার ফল দর্শন কর। বীর-কেশরী অক্ষুব্ধসাগর-বিক্রমে তপস্তেজকে সহায় করিয়া বাসববিজয়ী দশানন-সুতের চিরসঞ্চিত বীরদর্প দলন করিলেন। অহো! বুঝিল্লাম, তপস্তেজের নিকট সূর্য্যসমীপে খদ্যোতিকার ন্যায় সমস্ত তেজই মলিন হইয়া যায়। উঃ! ও আবার কি! ত্রিভুবন ভস্মীকরণপারদর্শী ভস্মলোচন কৌশলজালে জড়ীভূত হইয়া, স্বয়ং ভস্ম হইয়া গেল। ভারত! যে অগ্নি সমস্ত জগৎকে ভস্ম করিতে পারে, সেও স্বয়ং ভস্ম হইয়া যায়। কালচক্র মহাবীরকে মশকবৎ সংহার করে। সম্মুখে ভস্ম-লোচনকে দেখিয়া ভয় করিও না। দেখ দেখ কি ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি! দিগ্দশ অন্ধকার করিয়া কুম্ভকর্ণ আজ অভিনয়ক্ষেত্রকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে, দেব, দানব, মানব, নাগ, সকলেই কম্পমান। ভুবনগ্রাসকের হুঙ্কারে সকলে হতচেতন। দেখিতে দেখিতে শ্রীরামের তীক্ষ্ণবাণে এই মহাকায় অকাল নিদ্রাভঙ্গ জন্য, মহানিদ্রাবেশে চিরদিনের জন্য ধরণীশয্যায় শয়ন করিল। একে একে অতিকায় প্রভৃতি বীরবর্গ সমর-শয্যায় মরণ-মূর্চ্ছাকে আলিঙ্গন করিলেন। অহো ভারতবাসিন্! শুন শুন, কুম্ভকর্ণ বজ্রনিনাদে কি বলিয়া গেল। "মনুষ্য! যত দিন পর্য্যন্ত তোমার উপযুক্ত বল, বীর্য্য, সহায়, সম্পত্তির আয়োজন ও পরদর্প-দলন-পারগতা প্রকৃতিগত না হইবে, তত দিন অকালে শান্তিভঙ্গ করিও না; অকালে শান্তি (নিদ্রা) ভঙ্গ হইলে, সমরসাগরে বৈরবীর্য্য-বাড়বানলে বিদগ্ধ হইয়া যাইবে।" এক্ষণে ভয়ঙ্কর লীলার ভয়ঙ্কর পরিচ্ছেদ অভিনীত হইতে চলিল। দশানন বংশক্ষয় দেখিয়া, বিংশতিলোচন রক্তবর্ণ করিয়া, বিংশতি হস্তে প্রখর বাণ লইয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত। এই যুদ্ধে দিগ্দশ কাঁপিয়া উঠিল, দেবগণ রাবণবিনাশী বীজমন্ত্র জপ করিতেছেন; শ্রীরামের সমস্ত বাণ ক্ষয় হইতে

লাগিল। লঙ্কাধীশের দশ মস্তক বিনষ্ট হয় না। শ্রীরামচন্দ্র সহস্র কমলে মহামায়ার আরাধনা করিলেন। রাবণের মৃত্যুবাণ হস্তগত হইল। ক্রমে ক্রমে শমনদমন দশানন শমন-সদনে গমন করিল। রক্ষসকুল নির্ম্মূল হইল। সীতার উদ্ধার হইল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাবণ দশমুখে বলিয়া গেল "পরস্বাপহরণ করিও না, অহঙ্কার পরিত্যাগ কর; আজ গৃহভেদীই আমার মর্ম্মভেদী হইল।"

ভারতবাসিন্! সীতার উদ্ধার, ভরতমিলন, রামের রাজসিংহাসনাধিরোহণ—এতাবৎ কি তুমি দেখিতে চাও না! এই লীলাভিনয় ভাল করিয়া দর্শন কর, তোমার দুর্দ্দশাবসান হইবে। অহো! ভরত যখন মঙ্গল বাদ্য, বসন, ভূষণ, সেনা, সামন্ত, হয়, হস্তী, বিবিধ যান, বন্ধু, বান্ধব ও অগণ্য জনগণ সহ হনূমানপ্রমুখ-সেনাগণ-পরিবেষ্টিত সীতা লক্ষ্মণ সহ রাবণবিজয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন দূর হইতে শ্রীরামকে দেখিয়া, ভরত, শত্রুঘ্ন যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সাশ্রুলোচনে শ্রীরাম জানকী চরণে প্রণাম করিলেন, রাম লক্ষ্মণ যখন সমাগত ভ্রাতৃদ্বয়কে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন, জয় রাম, জয় রাম, জয় জয় রাম ধ্বনিতে গগনমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিল। অযোধ্যাপুরী যেন মরুভূমিতে মহাসাগর-সমাগমে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গমালায় ভাসিয়া গেল। এই জয় জয় শব্দের মধ্য দিয়া শ্রীরামচন্দ্র ইঙ্গিতে বলিলেন, অহো মনুষ্য! যদি দানবকুল নির্ম্মূল করিতে চাও, কেবল নিজ চেষ্টা, বা অহংকারাদি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হও, যোগ শিক্ষা কর, সহস্রারারবিন্দে ঐশী শক্তির আরাধনা কর। নিরাপদ হইবে, ভারতে সৌভাগ্যলক্ষ্মী পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

এই লীলাই আমাদের অনুকরণীয়, ইহাই আমাদের আশার ভিত্তি

উপযোগী। ভারতবাসিন্! রামলীলাভিনয়ে ধন, মন, প্রাণ উৎসর্গ কর। এই লীলাই অধ্যাত্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছে। জীবাত্মা (রাম) সদ্‌গুরুর (বিশ্বামিত্রের) নিকট ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রহ্মাস্ত্র) লাভ করিয়া মমতা (তাড়কা) নাশ করিবেন। জনকপুরে (হৃদয়ে) হরধনু (তমঃ) নষ্ট করিয়া সীতা (আত্মজ্ঞান-বিদ্যা) লাভ করিতে হইবে। রাজা না হইয়া বনে (বৈরাগ্য জন্য বিজন বাসে) গমন পূর্ব্বক তপস্যা করিবে; তথায় মারীচ (ভ্রম) অনুগমন করিলে, সীতাকে (বিদ্যাকে) রাবণ (অহঙ্কার) হরণ করিয়া লইয়া যায়। আবার বিবেক, বৈরাগ্য শম দমাদির (সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান্, সুষেণ আদির) সাহায্যে মায়া (সমুদ্র) লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ অহঙ্কার প্রমুখ কাম, ক্রোধাদি দুর্বৃত্ত দানবদল দমন করিয়া, সীতা উদ্ধার করিতে হইবে।

—o—

দুর্গোৎসব।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণ সংহার জন্য, অকালে বোধন করিয়া, এই দশভূজার পূজা করিয়াছিলেন। দশানন রাবণ, অহঙ্কারেরই (দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহে অহং মমেতি জ্ঞানের) প্রতিরূপ। কাম (মেঘনাদ), ক্রোধ (ভস্মলোচন), লোভ (অতিকায়), মোহ (কুম্ভকর্ণ), মদ (মহিরাবণ), মাৎসর্য্য (অহিরাবণ), ভ্রমদৃষ্টি (মারীচ), দুশ্চেষ্টা (সূর্পণখা) ইত্যাদি দানব দানবীগণের একমাত্র অধীশ্বর। অহং মমেতি বিনষ্ট না হইলে জীব কখনই আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা (সীতা) লাভে সমর্থ হয় না। অহঙ্কার নির্মূল করিতে হইলে, জ্ঞানের আরাধনা করিতে হয়। (রামলীলার মর্ম্মানুসারেও বুঝিতে হইবে যে মনুষ্য যতক্ষণ "আমি" ও "আমার" প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, ততক্ষণ সমরাঙ্গনে অগ্রসর হইবার অনুপযুক্ত, যখনই সে আত্মস্বার্থ জীবন-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারিবে, যখনই তাহার শক্তিবলে সংসার-সম্বন্ধ-চ্ছেদন-সামর্থ্য জন্মিবে, তখনই সে সমর-বিজয়ের আশা করিতে পারিবে)। জীব আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর মরণের ভয় করে না; কেননা আত্মা অবিনাশী; দেহ-বিচ্ছেদে তাহার ভয়ই বা কি, তার ভাবনাই বা কি। দেহনাশে জীবের ক্ষোভ বা ক্লেশ অনুভব হয় না, এই জন্য দুর্জ্জয় রাবণ নিধন করিতে গেলে ভারতে আত্মজ্ঞান-সাধনের প্রচার হওয়া সম্পূর্ণ আবশ্যক। আত্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য (স্বার্থনাশে অক্ষুব্ধতা) যুক্ত পুরুষবর্গ ভিন্ন ভারত উদ্ধারে অন্য কেহ সমর্থ হইবে না। বেদ বেদান্তাদির ধর্ম্ম যত দিন অতি বেগে ভারতে আধিপত্য করিতেছিল, তত দিন ভারত স্বাধীন ও উন্নত ছিল। সেই ধর্ম্মের বহুল প্রচারাভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতা ও হীন দশা ভারতের পার্শ্ব বিলাসিনী হইয়াছে। যে জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীব-ত্যাগোদ্যত ভগ্নোৎসাহ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষকে

ক্ষীণ করিয়াছিলেন, ভারতে সেই জ্ঞান প্রচারিত না হইলে আমাদের এ দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে না। পাণ্ডবগণ ঐ জ্ঞানকে সহায় করিয়াই আপনাদিগের হৃত-সর্ব্বস্ব পুনর্লাভ করিয়াছিলেন। শারদীয় উৎসব তাহারই (সেই জ্ঞানোপদেশেরই) প্রতিকৃতি মাত্র। যিনি এই দশভুজার প্রকৃতরূপে পূজা করিবেন, তিনিই ভারতের বিজয়-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ।"

ঐ দেখ, দশভুজা (আত্ম-তত্ত্ব বিদ্যা) জগন্মনোমোহিনীরূপে উপাসকের হৃদয়মন্দির আলোকিত করিতেছেন এবং আত্মমন্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। বৎস! আমার এ অপূর্ব্বরূপ ভক্তি পূর্ব্বক আরাধনা করিলে জীবের বন্ধন মোচন হইয়া থাকে। যিনি মুক্ত হইতে প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে আমার দশভুজারূপ ধ্যান করিতে হইবে, অর্থাৎ দশদিক্ রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধি, বল, অস্ত্র, শস্ত্র সঞ্চয় করিতে হইবে। তিন নেত্র অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী হইতে, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিবেচনা করিতে অর্থাৎ গত সময়ের ইতিহাস পাঠ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পতন ও উন্নতির আলোচনা করিতে হইবে, উপযুক্ত মন্ত্রিগণ সহ পরিণাম বিচার করিতে হইবে, এবং বর্ত্তমান দেশ, কাল, পাত্রের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। সিংহ ও সর্প অর্থাৎ ধর্ম্ম ও কালের সহায়তা লইতে হইবে। বিদ্যা (স্বরস্বতী), ঐশ্বর্য্য (লক্ষ্মী)—এ উভয়কে যত্নসহ সংগ্রহ করিতে হইবে। কার্ত্তিকেয়ের (জিতেন্দ্রিয় সেনানীর) সাদরে সৎকার করিতে হইবে। মূষিকবাহন গণেশের পূজা অগ্রে আবশ্যক, অর্থাৎ এরূপ বুদ্ধিমান্ পুরুষ চাই, মূষিক যেমন গ্রন্থিজাল ছেদ করিতে, বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে, তদ্রূপ তিনি বিপক্ষপক্ষের কৌশলজাল ও সন্ধিভেদ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে বিঘ্নবিনাশন বিপুল বিঘ্নবিপত্তি বিনষ্ট করিবেন। বৎস! এরূপ না হইলে অসুর বিনাশ করা যায় না। ভারতবাসিন্! ভবভাবিনী ভবানীর ভবভারহারিণী বাণী শ্রবণ কর। প্রতি

ভবনে ভক্তিসহ ভাবময়ীর ভজনা কর। ভয়, ভাবনা বিদুরিত হইবে। নির্ব্বাপিত ভাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, মরুভূমিতে পূর্ণ সরোবর দৃষ্ট হইবে, অচেতন ভারতের চেতনা সঞ্চার হইবে।

এই শারদীয় উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদেশ আনন্দে হাসিতেছে। এই উৎসবে গৃহ আদি পরিমার্জ্জিত হইবে, সকলে নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, দিগ্দেশ হইতে প্রবাসী গৃহে সমাগত হইবে, আত্মীয় বন্ধু সকলে একত্র হইবে, স্বামী স্ত্রীমুখ অবলোকন করিয়া, পুত্র পিতা মাতাকে দর্শন করিয়া, পিতা মাতা সন্তানকে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে থাকিবেন। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দীন দরিদ্রগণ বিষয়িগণের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন, আহ্লাদের সীমা নাই। স্ত্রীগণ—কাহার স্বামী কি নূতন অলঙ্কার দিলেন, বালকগণ কাহার পিতা কিরূপ পরিচ্ছদ দিল,সাধারণ জনগণ—কাহার গৃহে কিরূপ প্রতিমা হইল এই আন্দোলনে ব্যস্ত। এই উৎসব জন্য বঙ্গদেশের বিষয়-কার্য্যালয় সকল বন্ধ, সকলের মন উৎসবানন্দে মত্ত। যে সকল লোক সম্বৎসর বিদেশে ছিলেন, এ অবকাশে সকলে একত্র। আমাদের দেশে এরূপ আনন্দের দিন হয় না। বঙ্গবাসী অনেক দিন দেশ বিদেশে রহিয়াছেন, বিষয়কার্য্য উপলক্ষে বিদেশে থাকা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, জন্মভূমির প্রতি আস্থা হ্রাস হইয়াছে। বিদেশে সভা করিয়া, বক্তৃতা করিয়া ও শুনিয়া দেশীয় ভাবে উত্তেজিত হইয়া কত দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন; সেইরূপ একবার নিজ নিজ গ্রামাদিতে করুন। সমস্ত দেশীয় বন্ধু বান্ধব একত্র সদ্ভাবে মিলিত হউন, কেবল আমোদ প্রমোদ গল্প করিয়া সময়াতিপাত করিবেন না। এরূপ দিন আবার জীবনে ঘটিবে কি না, তাহা কে জানে! জন্মভূমির হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হউন। শত শত লোকের একত্র সাক্ষাৎ হওয়া সময়ান্তরে অসম্ভব। যাহাতে স্বদেশের কল্যাণ সাধিত হয় তাহারই পরামর্শ করুন। যাহাতে বিদ্যালয় গুলি উত্তম রূপ চলে, তাহার সদ্বিধান করুন। বালকগণ বিদ্যাশিক্ষার

সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নীতি শিক্ষা করিতে পারে, অসচ্চরিত্র না হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন। যাহাতে দলাদলি ও পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করুন, যাহাতে স্ত্রী পুরুষাদির প্রকৃতি ধর্ম্মানুগত হয় তাহার উপায় করুন। বঙ্গবাসী এই মহোৎসবে চিরকল্যাণ-পথের সূত্রপাত করুন। এই উৎসবই সকলের মন সরল ও নির্ম্মল করিয়া দেয়। বিজয়ার দিনটী মনে করুন। কি অপূর্ব্ব ভাব! লোক সকল ভক্তি-ভাজন-গণকে প্রণাম করিতেছে, সকলে সকলের গৃহে যাইতেছেন, তাঁহারা তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন, পরস্পরে প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন, সকলে সকলের কুশল চাহিতেছেন, শান্তিজল গ্রহণ করিতেছেন, মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন। অহো! এ দিনে যেন ভারতে শোক, তাপ, দুঃখ নাই। ভারত আনন্দ-নিকেতন! আশ্চর্য্য উৎসব! আজ লোকে চিরবৈরীর সহিতও প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। ঐ দেখ যাহাকে সম্বৎসর ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার পাদদেশে প্রণত। যে শত্রুতা সাধন করিতেছিল, আজ সে তাহার কল্যাণ কামনা করিতেছে।

ভগবান্ করুন, এই উৎসব গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইতে থাকুক, ভারত আনন্দে সদাই বিহ্বল থাকিবে, ভারতের গৃহ-বিচ্ছেদ দূর হইবে, সুখ, শান্তি, বিদ্যা, সদ্ভাব, একতা, ভারতের অঙ্গাভরণ হইবে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

দক্ষযজ্ঞ।

(গৃহস্থদিগের প্রতি উপদেশ)

মহোদয়গণ! এই সভামণ্ডপের দক্ষিণ ভিত্তিতে যে একখানি চিত্র-ফলক রহিয়াছে, একবার ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, একজন সৌম্যমূর্ত্তি শান্ত যোগিপুরুষ দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বাম স্কন্ধে একি বরণীয়া রমণীর মৃতদেহ লইয়া দণ্ডায়মান। অদ্য ইহার প্রকৃত রহস্য শ্রবণ করুন।

সৃষ্টিকুশল পিতামহ জীব প্রবাহ বৃদ্ধি জন্য প্রথমতঃ যে কয়জন প্রজাপতি সৃষ্টি করেন মহারাজ দক্ষ তন্মধ্যে অতীব প্রসিদ্ধ ও প্রবল-প্রতাপ ছিলেন। মায়াপুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। কাল সহকারে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ ত্রিভুবনে বিস্তৃত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এক নলিনীনায়ক চন্দ্রকেই তিনি সপ্তবিংশতি কন্যা সম্প্রদান করেন; অতঃ-পর ভুজঙ্গভূষণ দেবাদিদেব মহাদেবের মহেশ্বরত্বে বিমোহিত হইয়া কনিষ্ঠা কন্যা সতীকে তৎসহ পরিণয় দিয়া শিবকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

কোন সময়ে দক্ষ বৃন্দারক বৃন্দপূর্ণ পিতামহের সভায় উপস্থিত হইলে তাবদ্দেবতাই তাঁহার সমাগমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার সম্মাননা ও অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু সর্ব্বত্র সমদর্শী সদানন্দ মহাদেবের যোগাধিগম্য পরমাত্মার পরমতত্ত্বজ্ঞান লাভে মান অপমান বুদ্ধির অভাব হেতু তিনি সাধারণ রীতির বশবর্ত্তী হইয়া দক্ষের অভ্যর্থনা করিলেন না। দক্ষ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ "জামাতা যজ্ঞের অগ্রভাগ লাভে গর্ব্বিত হইয়া আমাকে তাচ্ছীল্য করিল" এই বিবেচনায় মহাক্রোধে জামাতাকে অযথা তিরস্কার পূর্ব্বক সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাহাতেও মহাদেব নির্ব্বেদগ্রস্ত হইলেন না। দেবর্ষি নারদ দেখিলেন যে তমো-

গুণের আধিক্যে জীবের বন্ধন হয় ও অহঙ্কার ক্ষয়ে তাহার কল্যাণ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। প্রজাপতি দক্ষ অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া শিবাবমাননা করিয়াছেন। এই অহঙ্কার বিনষ্ট না হইলে প্রজাপতির মঙ্গল নাই, এবং সর্ব্ব সংহারকর্ত্তা মহাকাল ভিন্নই বা কে এই দুরপনেয় মলিনতা মার্জ্জনা করিবেন, ইহা বিচার করিয়া দক্ষদর্পদলনের উপায় স্থির করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক দক্ষকে এক মহাযজ্ঞারম্ভের পরামর্শ দিলেন। আশুতোষকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করাই এই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রধান অভিপ্রায়। পৃথিবীতে শিবহীন যজ্ঞের সূত্রপাত করিবার জন্যই দক্ষ এই যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। অবশেষে এই বিষম যজ্ঞরাহুই দক্ষ প্রজাপতির অতুল তেজোরাশি গ্রাস করিল।

দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদি ত্রিলোকবাসী সকলেই নিমন্ত্রিত হইল; কেবল ত্রিলোচনের নিমন্ত্রণ হইল না। নারদ সঙ্কল্প সাধনের জন্য সাক্ষাৎ মহাতেজঃ স্বরূপ রুদ্র সমীপে গোপনে এই সংবাদ দান করিলেন; কিন্তু সদাশিবের নিজাপমান বুদ্ধি নাই জানিয়া সতী সমীপে এই অশ্রুতপূর্ব্ব প্রলয় যজ্ঞের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই সমাচারই দক্ষদর্পহারী ভাবী ভয়ানক ভব কোপানল প্রজ্বলনের ইন্ধন স্বরূপ হইল।

সতী প্রজাপতির কনিষ্ঠা কন্যা, ভাবিলেন বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃভবনে যাইবার কোন নিষেধ নাই, এবং তথায় উপস্থিত হইলে পিতা স্নেহ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইবেন, তখন তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে পতির মর্য্যাদা প্রাপ্তিরও উপায় বিধান করিবেন। বহুযত্নে শিবের অনুমতি লইয়া সতী দক্ষরাজ নিকেতনে গমন করিলেন। সতী সমাগমে প্রসূতির আনন্দের সীমা রহিল না। সতী অবিলম্বে যজ্ঞস্থলে পিতৃ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সভায় ত্রিলোক একত্র হইয়াছে, কেবল নীলকণ্ঠ উপস্থিত নাই। সতীর সমক্ষে এই শশাঙ্কশেখর শূন্য সভামণ্ডপ লক্ষ

লক্ষ নক্ষত্রপূর্ণ শশাঙ্ক-শূন্য অমানিশির আকাশের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি পিতাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও বাহ্যবিষয় জ্ঞানরহিত সদাশিবের কৃত অপমান বিস্মৃত হইয়া তৎপ্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করিতে বারংবার বিনয় বিনম্রবচনে যাচ্ঞা করিলেন। দক্ষ অনিমন্ত্রিতা সতীকে সম্মুখে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কুপিতভাবে তিরস্কার ও গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সতী অভিমানে বাষ্পাকুল-লোচন হইলেন। বোধ হইল যেন দক্ষদাহের ইন্ধনরাশি ধূম্রায়িত হইতে লাগিল। অবশেষে যখন বিবিধ কুৎসাকীর্ত্তন পূর্ব্বক দক্ষ আস্ফালন সহ শিবনিন্দা করিলেন, তখন সতী জীবের গতি প্রাণপতি পশুপতির নিন্দা আকর্ণন করিয়া আপনার দেহকে অপবিত্র স্থির করিলেন এবং যজ্ঞস্থলেই সমাধিতে সমাসীন হইয়া সর্ব্বসমক্ষে তনুত্যাগ করিলেন।

বায়ুবেগে এই অশুভ সমাচার ধ্যানস্তিমিতনেত্র-শূলধারী রুদ্রদেবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পতিনিন্দা-শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ মহাকালের কালস্বরূপ হইল। দক্ষদর্পদলনার্থ দেবাদিদেবের ললাটফলক ভেদ করিয়া রুদ্রতেজ বিনির্গত হইতে লাগিল, ত্রিনেত্র কালানল উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিল, ব্যোমকেশের পিঙ্গল জটাকলাপ আকাশমার্গে উন্নীত হইল, ত্রিভুবনবিনাশসমর্থ হরকোপানল অবিলম্বে বীরভদ্র নামক অসুর সৃষ্টি করিল, ত্রিলোক কাঁপিয়া উঠিল, ধরাতল রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। দক্ষসহ দিগ্দশ দাহ করিবার জন্যই যেন রুদ্রতেজে বীরভদ্রের আবির্ভাব হইল। দুর্ব্বুদ্ধিদর্পিত দক্ষকে দগ্ধ করিবার জন্য দেবর্ষিসূচিত প্রচণ্ড কালানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ধূর্জ্জটির আদেশমাত্রেই বীরভদ্র পিশাচ প্রেতমণ্ডলী সহ দক্ষযজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইল। দুর্লক্ষণ দর্শনে সভাস্থ দেবগণ মহারুদ্রের স্তুতিগান করিতে লাগিলেন, দানব মানব আদি ভয়ে পলায়ন করিল; ভূতগণ প্রেতগণ মহা কুতূহলে যজ্ঞভূমি উপদ্রবপূর্ণ করিয়া তুলিল; যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি লণ্ড

ভঙ্গ করিল; সভাস্থ কাহাকেও পদাঘাত, কাহাকেও চপেটাঘাত, কাহাকেও দংশন করিতে লাগিল; দলে দলে প্রেতগণ প্রস্রাব করিয়া যজ্ঞকুণ্ড পূর্ণ করিয়া দিল; অন্তঃপুরে প্রেতগণ প্রবেশ করিয়া পাকশালার সমস্ত দ্রব্যই নষ্ট করিল; কুলাঙ্গনাগণকে পদাঘাত ও বলপূর্ব্বক নাসাভরণ, কণ্ঠাভরণ, কর্ণাভরণাদি বিমোচনে অশেষ ক্লেশ দিতে লাগিল; দক্ষনিকেতনে প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বীরভদ্র, দর্পিত-দক্ষের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক "রে পামর! তুই সামান্য প্রাজাপত্যে অহঙ্কৃত হইয়া শিবনিন্দা করিয়াছিস্; যে দেহ সতীর জন্মদাতা, তুই শিবনিন্দা করিয়া সেই অপূর্ব্ব দেহ কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিয়াছিস্; অতএব তোর যে বদন পঞ্চবদনের নিন্দা করিয়াছে, এই দেখ্ তোর সেই মুণ্ড তোর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করি" বলিয়া দক্ষের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। মহাদেব যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষস্কন্ধে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া দিলেন। দক্ষ রুদ্র তেজস্পর্শে দিব্য বুদ্ধি লাভ করিয়া অজমুণ্ডে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব সতীর মৃত-দেহ স্কন্ধে করিয়া ভীমরবে হুঙ্কার পূর্ব্বক ত্রিভুবন কাঁপাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই লীলার ইঙ্গিতে কি গূঢ় কথা বলিতেছেন তদ্বিষয়ে প্রণিধান করা যাউক।

মহাদেব "জ্ঞানস্বরূপ" ঈশ্বর; সতী "শক্তি"; এবং প্রজাপতি দক্ষ "গৃহাশ্রমী মনুষ্য"। প্রাচীন আর্য্য গৃহবাসিগণ ভগবদ্ভাবে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদের তাবৎশক্তিই ঈশ্বরে সমাধান করিতেন। তাঁহাদের জন্ম, জীবন, দেহ, মনঃপ্রাণাদি সমস্তই ঈশ্বরের জন্য, ইহাই উক্ত মহাত্মগণের ধারণা ছিল। ক্রমে প্রাকৃতিক নিয়মে মানবের সরল মন মলিন হইতে লাগিল; ধন, মান, সম্পদমদে মনুষ্য মত্ত হইয়া উঠিল; এমন কি এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিও ঘটিল যে "জ্ঞান" তাহার "বিষয় ক্ষুদ্র" সেবা বা মর্য্যাদা রক্ষা করে স্পষ্টাক্ষরে এ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিল। শুদ্ধসত্ত্ব

"জ্ঞান" তাহার আশা পূর্ণ করিলেন না। মনুষ্য অজ্ঞানান্ধ হইয়া ক্রমে নিরীশ্বরবাদে মত্ত হইতে লাগিল। নারদ অর্থাৎ সদ্‌গুরু মূঢ় মনুষ্যের কল্যাণ জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় যাগ যজ্ঞাদির উপদেশ দিলেন। প্রথমতঃ মনুষ্যগণ যাহা কিছু কর্ম্ম করিতেন, তাবতের মূলেই ভগবদ্দর্শন করিতেন, প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ও সায়াহ্ন হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহারা ধর্ম্মভাবে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা উত্থানে, উপবেশনে ও শয়নে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেন; ভোজনকালে, যাত্রাকালে, আদান প্রদানকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেন; ঔষধ সেবনে, লিপি লিখনে, বিবাহ করণে, পুত্রোৎপাদনে ও জীবন মরণে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেন; অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যের (যজ্ঞের) অগ্রভাগ ঈশ্বর লাভ করিতেন। কলিতে মনুষ্যের তমোগুণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে দক্ষরাজার মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের সূচনা হইয়া গিয়াছে। "শিবরহিত" যজ্ঞ এখন গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইতে চলিল। ঈশ্বর দৃষ্টি অতিশয় মলিন হইয়া গিয়াছে। স্বার্থ সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইয়াছে। বর্ষারম্ভে উদ্যানের প্রথম ফলটী প্রাচীন মহাত্মগণ ঈশ্বরকে নিবেদন করিতেন, এক্ষণে মনুষ্য স্বয়ংই ভোজন করে। এক্ষণকার কর্ম্মমধ্যে ভগবদ্ভাব প্রায় ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ধর্ম্মার্থে ভার্য্যা গৃহীত হইত; এক্ষণে বিলাসভোগার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কোন বহু ব্যয় সাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে ইদানীং আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, মান্য, গণ্য, ধনী, রাজা ও রাজোপাধিধারী সকলেই সমাদরে গৃহীত (ত্রিলোক নিমন্ত্রিত) হইয়া থাকেন, কেবল মহাদেবের বা ঈশ্বরের (নিমন্ত্রণ) স্মরণ বা পূজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য বলি বর্ত্তমান ভারতের প্রত্যেক কার্য্য "শিব রহিত-দক্ষযজ্ঞ" বিশেষ। এই বর্ত্তমান রীতির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বা দক্ষযজ্ঞ কখন শুভ ফল প্রসব করিবে না। "জীবনীশক্তি" (সতী) জীবকে বারংবার ঈশ্বর স্মরণার্থ সঙ্কেত করিল, তমোগুণী মনুষ্য

তাহা শুনিল না। মনুষ্য (দক্ষ) যত ধর্ম্ম বিরোধ (শিবনিন্দা) করিতেছে, ততই "শক্তি" নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন আর্য্যদিগের ন্যায় আমাদিগের শারীরিক শক্তি নাই, বুদ্ধি শক্তি নাই, বিচার শক্তি নাই, ধারণা শক্তি নাই, স্মৃতি শক্তি নাই, অথবা সকল শক্তিই দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। অতি স্বল্পকালের মধ্যেই এখনও যাহা কিছু শক্তি আছে, তাহাও বিনষ্ট হইবে। সতী পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিবেন। ভ্রষ্টাচারপূর্ণ আমাদের গার্হস্থ্য কার্য্যকলাপ অবশেষে অশুভ ফল প্রসব করিবে। বারংবার জন্ম, জরা, আধি, ব্যাধি, শোক, তাপাদি ক্লেশ পরম্পরা ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া আমাদের কর্ম্মক্ষয় হইতে না হইতেই ভূত প্রেতাদির ন্যায় ভোগ সুখব্যাপার লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিবে। প্রসন্ন বদনের পরিবর্ত্তে ছাগমুণ্ড (অধোগতি) হইবে।

মানব! মহাদেবের সঙ্কেত বাক্যে সাবধান হও। শিবরহিত যজ্ঞ পরিত্যাগ কর। ভগবান্‌কে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারই প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিতে থাক। তাঁহাকে সর্ব্বার্থ সিদ্ধির মূল জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবা করিতে থাক। ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তির তাবৎ কার্য্যানুষ্ঠান "দক্ষযজ্ঞ" জানিয়া এরূপ শিবহীন যজ্ঞে ব্রতী হইও না। তাহা হইলে মৃত্যু (বীরভদ্র) তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করিবে। পক্ষান্তরে রুদ্রতেজে অজ্ঞানতার (যে মুখ শিবনিন্দা অর্থাৎ যে বুদ্ধি অধর্ম্মাচার করিতেছে তাহার) ধ্বংস হইবে। অতঃপর ভগবান্ নিজ কৃপাবলে "অজমুণ্ড" (অজ বা যাহার জন্ম বা আদি নাই অথবা নিত্য ব্রহ্মজ্ঞান) প্রদান করিবেন। মানব! তুমি শিবের স্তুতিবাদ করিতে করিতে অক্ষয় লোকে গমন করিবে।

—o—

শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কনক-লঙ্কার দুর্দ্ধর্ষ বীর দশাননকে সবংশে বিনিপাতিত করিয়া রাবণাপহৃতা নিজ বনিতা সীতাকে উদ্ধার করিলেন। বিশ্ব-বিজয়ী বীর অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য করিতে করিতে রাজনৈতিক নিয়মের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত গর্ভবতী জনকতনয়াকে বনবাসিনী করিতে বাধ্য হইলেন। রাজশ্রী ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম তেজস্বিতা, বীরপ্রতাপ, বিপুল বিক্রম প্রভৃতি গুণরাশি তাঁহাকে 'অশ্বমেধ' মহাযজ্ঞে ব্রতী করিল। যজ্ঞানুষ্ঠানের অবশ্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সম্ভার আদি তাবদ্বিষয়েরই আহরণ হইল। যজ্ঞীয় অশ্বকে ধনুর্ব্বাণ, ধ্বজা আদি দিগ্বিজয় চিহ্নে চিহ্নিত ও তাহার ললাট ফলকে 'বিজয় পত্র' আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অশ্ব স্বাধীন ভাবে দিগ্দেশ পর্য্যটনে গমন করিল এবং দুর্জ্জয় বীর সুমিত্রাকুমার তাহার রক্ষক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব গ্রহণ করিবার জন্য দর্শকমাত্রেরই স্পৃহা জন্মিতে লাগিল; কিন্তু যখন অশ্বের ললাট ফলকে আবদ্ধ বিজয়পত্র পাঠে বিদিত হইলেন যে যদি কেহ এই যজ্ঞীয় তুরঙ্গ ধারণ করেন অথবা ইহার গতিরোধ করেন, তবে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী শ্রীরামচন্দ্র সহ তাঁহাকে সম্মুখ সমরসমুদ্রে অবগাহন করিতে হইবে, তখন যাঁহারা অপ্রমত্ত-হৃদয় ও নিজ নিজ ক্ষুদ্র বল বিক্রম বিদিত ছিলেন, তাঁহারা এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অশ্ব অনিবার্য্যবেগে নানা দেশ, প্রদেশ, বন, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে বাল্মীকির তপোবনে আসিয়া প্রবেশ করিল। লব কুশ বালস্বভাব প্রযুক্ত সুন্দর অশ্ব ধারণ করিলেন; নিজ ভুজবীর্য্যে ত্রিভুবন পরাজয় করিতে পারি এইরূপ স্থির জ্ঞানে অশ্বারোহণে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীরামসেনা সহ মহাসমর

আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে সসৈন্য রামানুজত্রয় সরমশায়ী হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং নিজপুত্র বোধে অনেক বুঝাইয়াও তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার মরণ মূর্চ্ছায় মহারণের অবসান হইল। লব কুশ রক্তাক্ত গাত্রে প্রফুল্লচিত্তে অশ্ব ও সমরাঙ্গনে-নিহত-রামাজ্ঞাকারী হনুমান্‌কে লইয়া জননী সমীপে গমন করিলেন। সীতা তদ্দর্শনে কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে লব কুশকে পিতৃহন্তা আদি বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বাল্মীকি আসিয়া সসৈন্য শ্রীরাম আদির চৈতন্য সঞ্চার করিলেন। লব কুশ পিতৃপরিচয় পাইয়া ভক্তিসহ তৎপদে প্রণাম করিলেন। যজ্ঞীয় তুরঙ্গ সহ রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অশ্বের মেধ দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন করিলেন।

আদি কবি বাল্মীকির লিপিনৈপুণ্য, রস, মাধুর্য্য ও কবিত্ব কুসুম সৌরভ বিষয়ী মুমুক্ষু ও মুক্ত এতত্রিবিধ শ্রেণীর লোককেই বহুদিন হইতে বিমোহিত করিয়া আসিতেছে। বাল্মীকি মহারামায়ণ গ্রন্থে কেবল বিষয়ীদিগের চিত্ত বিনোদনের জন্য লৌকিক রামচরিত্র লিখিয়াই পরিতৃপ্ত হন নাই। মুমুক্ষু ও মুক্ত মণ্ডলীর গ্রহণোপযোগী উপচারেরও ইহাতে অভাব নাই। ইহা দ্বারা অস্মাদৃশ মূঢ় এবং অন্যান্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাত্মগণকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়। অদ্য এই রামায়ণোক্ত বিবরণটীর নিগূঢ় রহস্য ভেদে প্রবৃত্ত হইলাম।

যিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা অভিরমণ করিয়া থাকেন তিনিই রামচন্দ্র; যুদ্ধ বিগ্রহ শূন্য অথবা নির্দ্বন্দ্ব পুরী বা আনন্দধামই তাঁহার রাজধানী অযোধ্যা। ভগবান্ স্বীয় শুদ্ধ সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশরূপ এক মহা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। অশ্ব এই যজ্ঞের প্রাণ। অহঙ্কারই অশ্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, অহঙ্কারেই জগতের সৃষ্টি এবং অহং বিনষ্ট হইলেই তাহার মেধ বা তৎসারভূত আত্মজ্ঞান

উদয় হয় এবং তদ্দ্বারাই যজ্ঞ পূর্ণ বা সৃষ্টি-প্রলয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-রূপ সংসার নিবৃত্ত হইয়া যায়। অহঙ্কার বিজয়পত্র ললাটে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে অথবা অহঙ্কারী লোকে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া বিশ্বাস করে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেকাদি কেহই অহঙ্কারকে স্পর্শ করিল না। "আমি আত্মা নহি" এই ভ্রম জ্ঞানকে লব বলা হইয়াছে। লব আপনাকে শ্রীরামাত্মজ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। "দেহাত্ম-জ্ঞানই" কুশ। এতাদৃশ লবকুশে একাবয়বিকত্বও আছে। ইহারা দুই যমজ ভ্রাতা। এই দুইটাই জীবের পরিচায়ক; অর্থাৎ মূঢ়জীব অহঙ্কারকে হৃদয়ে রক্ষা করিল। যে অশ্ব ধারণ করিল তাহাকে শ্রীরাম সহ সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইল। পক্ষান্তরে অহঙ্কার বশতঃ জীব ঈশ্বর বিরোধী বা অধর্ম্মাচারী মহাপাষণ্ড হইয়া উঠিল। রামের দুর্নিবার সৈন্যগণ বিপক্ষ পক্ষ দলন করিতে লাগিল অর্থাৎ ভগবৎ পরাঙ্মুখ জীবকে শোক, রোগ, তাপ, বেদনা, ক্লেশ, বিঘ্ন, বিপত্তি আদি সদাই পীড়ন করিতে লাগিল, কিন্তু সীতার আশীর্ব্বাদে (প্রকৃতির নিয়মে) লব কুশ (জীব) বিজয় লাভ করিল, অর্থাৎ "ঈশ্বর নাই" অহঙ্কারী জীবের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। অতঃপর জীব, প্রকৃতি জাত প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড় জগতে (জগৎ প্রসূতি সীতার কুটীরে) অশ্ব (অহঙ্কার) ও হনূমান্ (আত্মানাত্ম বিচার) লইয়া গমন করিলেন। প্রকৃতি নিজ পুত্র জীবকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে দেখিয়া কাতর স্বরে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, কার্য্য, কারণ ঘটনা আদি এক এক অশ্রু বিন্দু বিসর্জ্জন করিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, রে জীব! তুই অবোধ শিশু, না জানিয়া না বুঝিয়া আজ পিতৃবধ করিলি, তোর এই রণবিজয় যে জীবনের এক মহাকলঙ্ক হইয়া উঠিল! তুই যে মাতার বরে বিজয়ী হইলি, আজ তোর সেই মাতাও পাতিব্রত্য নিবন্ধন ভর্ত্তৃচিতানলে প্রাণত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্তা না থাকিলে জগতের সত্তা থাকিতে পারে না, প্রকৃতি কাঁদিতে কাঁদিতে

কাতর স্বরে জীবকে এইরূপ বুঝাইয়া দিলেন। অথবা জড় জগতের অস্তিত্বই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয়। এইরূপে জীবপ্রকৃতি প্রবুদ্ধ হইয়া পশ্চাত্তাপগ্রস্থ হইলে সদ্গুরু (বাল্মীকি) জ্ঞানোপদেশ (অমৃতাভিষেক) দ্বারা জীবের সমক্ষে ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তা দেখাইয়া দেন। তখন জীবও ঈশ্বরের পদে ভক্তিবিনম্র চিত্তে প্রণাম করিয়া অহঙ্কার (যজ্ঞীয় অশ্ব) পরিহার করিয়া থাকে। ভগবান্ অহঙ্কারকে সংহার করিলেই এই সংসার প্রলয় সাগরে ডুবিয়া যায় এবং অশ্বের মেধ বা অহঙ্কারের সারভূত আত্ম সত্তা দ্বারা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি বা সংসারের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে।

আমরা সকলেই লব কুশের ন্যায় না বুঝিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ করিয়াছি, এই জন্যই শোক, রোগ, তাপাদি ভগবানের তীব্রবাণে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। যতক্ষণ না অশ্ব ছাড়িয়া দিব ততক্ষণ এই দুর্ব্বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ নাই। যদি কেহ নিজ গৃহে অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়া থাকেন (যদি গৃহাদি আমার বলিয়া বোধ থাকে) তবে এখনই উহা পরিত্যাগ করুন; যদি কেহ উদ্যানে তুরঙ্গ বাঁধিয়া থাকেন (যদি উদ্যানাদি সম্পত্তিতে মমতা থাকে) তবে এখনই উহা পরিত্যাগ করুন; যদি অন্তঃপুর মধ্যে কেহ উক্ত তুরঙ্গ লুকাইয়া রাখিয়া থাকেন (যদি স্ত্রী-পুত্রাদিতে মমতা থাকে) তবে এখনই উহা পরিত্যাগ করুন; যদি কেহ হস্তে উহার বল্গাও ধারণ করিয়া থাকেন (যদি শরীরাদিতে অহং বুদ্ধি থাকে) তবে উহা এখনই পরিত্যাগ করুন; যদি কেহ মনেও উহাকে স্থান দিয়া থাকেন (যদি অভিমানাদি থাকে) তবে এই মুহূর্ত্তেই উহা পরিত্যাগ করুন। উহাকে স্পর্শ করিবেন না, উহার নিকট যাইবেন না, উহার সঙ্কল্প করিবেন না। রাম সহ মহারণে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব জীবনকে কলঙ্কিত ও দুরাগ্রহযুক্ত করিবেন না। ভগবানের মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে পরিসমাপ্ত হউক।

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল।

মানবের মন যখন দুর্ব্বল থাকে তখন কৌতুক ও তামাসা প্রভৃতি দেখিতে অভিলাষ করে। মন গভীর বিষয় চিন্তা দ্বারা বলবান্ হইলে সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। যত প্রকার কৌতুকাবহ কার্য্য আমাদের মনোরঞ্জন করে তন্মধ্যে ইন্দ্রজাল বিদ্যাই প্রধান। যখন লোকসমাজের মনের ভাব অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া পড়ে তখনই বিদ্যাবিশারদ এবং দ্রব্যের গুণ ও অবস্থাবিৎ মহাত্মগণ ইন্দ্রজাল বিদ্যা আবিষ্কার দ্বারা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ চিন্তাশীল মানব সকলকে আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্যতর ও অদ্ভুত বিষয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মনকে প্রশস্ত, উদার ও উচ্চ করিয়া দেন। তখন তাহারা তাহাদিগের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির অনন্ত আকাশে অনন্ত ইন্দ্রজাল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায়। একখানি খাপরা হইতে টাকা হইল দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য মনে করে, কিন্তু একটী সামান্য বীজ হইতে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের উৎপত্তি হওয়া কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল নহে? ঐন্দ্রজালিক শূন্যমার্গে দ্রব্যাদি রক্ষা করে। এই প্রকাণ্ড জগৎ, যাহা চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদিতে পরিপূর্ণ, ইহা যে শূন্যমার্গে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে ইহা কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল নহে? দেখিতে দেখিতে সমস্ত জগৎ ঘোর অন্ধকার পূর্ণ, আবার কোথা হইতে এক জলদালোক-পিণ্ড মার্ত্তণ্ড উদয় হইয়া দশদিক উদ্ভাসিত করিতেছে, ইহা কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল নহে? ইন্দ্রজাল মায়ায় মোহিত হইয়া কেহ জাগ্রৎ, কেহ সুপ্ত, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন হইতেছে; কেহ হত, কেহ হন্তা, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ, কেহ গুরু, কেহ শিষ্য, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। কেহ পুত্রবান্ হইয়া হাসিতেছে, কেহ পুত্রহীন হইয়া কাঁদিতেছে, এই অদ্ভুত ইন্দ্রজাল কে বুঝিবে! কে যে এই ইন্দ্রজাল করিতেছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ইন্দ্রজালে

মোহিত হইয়া ইহার তত্ত্ব কেহ জানিতে পারিতেছে না। যিনি ইন্দ্রজাল করেন তিনি না বুঝাইয়া দিলে কেহই বুঝিতে পারে না। তাই বলি যদি ইন্দ্রজাল জানিতে চাহ, তাহা হইলে ঐন্দ্রজালিকের নিকটে যাও, তাঁহার উপাসনা কর, তিনি বুঝাইয়া দিবেন। তখন দেখিবে সকলই মিথ্যা, সকলই মায়া, জগৎ একটী অদ্ভুত ইন্দ্রজালের ব্যাপার। যদি তাঁহাকে জানিতে চাও তবে যাও; যাও, যেখানে এই ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়া যোগিগণ ধ্যাননিমীলিত নেত্রে সেই পুরাণ পুরুষের অদ্ভুত সত্তায় নিমগ্ন, তথায় যাও এই ইন্দ্রজালের ভেদ বুঝিতে পারিবে। তখন জগৎকে দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিবে কি "অদ্ভুত ইন্দ্রজাল!"

সামান্য ইন্দ্রজাল-বিদ্যা মানবকে ক্রমে প্রশস্ত, উন্নত ও আশ্চর্য্য ভাব সাগরে ডুবাইয়া এই অদ্ভুত ইন্দ্রজালের শিক্ষা প্রদান করে। প্রত্যেক জীবই এক একটী ইন্দ্রজালের পুত্তলি; সকলেই এই মায়াময় জগতে আসিয়া অভিনয় করিতেছে। রাম তুমি বড়লোকই হও, আর শ্যাম সামান্য লোকই হউক, উভয়েই ইন্দ্রজালের পুত্তলি; রাম তুমি কখনও মনে করিও না শ্যাম তোমা অপেক্ষা সামান্য; তুমি, ধনে, মানে, জ্ঞানে শ্যাম অপেক্ষা বড় হইতে পার সত্য; কিন্তু শ্যাম ঐ সকলে বঞ্চিত বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করিতে পার না, কেন না বস্তুতঃ উভয়েই এক। সকলেই পুত্তলি, আপন অভিনয় করিয়া চল, বাজিকরের প্রশংসা ভিন্ন তোমার প্রশংসা নাই। ইন্দ্রজালে জগতের বিকাশ, ইন্দ্রজালে জগতের অভ্যুদয়, ইন্দ্রজালেই জগতের লয় হইবে। এই আছি, এই নাই, এই ছিল, কোথা গেল, কি হইল, ইহাই "অদ্ভুত ইন্দ্রজাল"!

সঙ্কেত।

শুনিলাম ভারতক্ষেত্র পুণ্যভূমি, ভারতভূমি আর্য্যদিগের আবাস স্থান; শুনিলাম ভারতের জ্ঞান, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের রীতি প্রণালী অতি পুরাতন কাল হইতে ভূমণ্ডল-ব্যাপী হইয়াছিল; শুনিলাম যখন ইহুদিগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ দেশে দেশে পর্য্যটন করে, অসভ্য বলিয়া সকলের ঘৃণিত, তখন ভারতভূমি জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প আদিতে পৃথিবীর সভ্যসমাজের শিরোভূষণ। শুনিলাম মিশর, পারস্য, গ্রীস, ইটালী ভারতের ধনে ধনী, ভারতের জ্ঞানে জ্ঞানী, ভারতের গুণে গুণী, ভারতের ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইয়াছিল; মানিলাম বেথলিহেমের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে প্রথম ত্রিশ বৎসর খ্রীষ্টীয়সমাজে অপরিস্ফুটিত, সেই ত্রিশ বৎসর তিনি পারস্যে ও মিশরে ভারত হইতে প্রাপ্ত উজ্জ্বল জ্ঞান কিরণে নিজ জীবনকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন; মানিলাম ভারতভূমি সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার আদর্শস্থল, সামাজিক রীতি নীতির ভিত্তিভূমি; মানিলাম সমস্ত পৃথিবী ভারত ভূমির নিকট চিরঋণী; মানিলাম ভারতীয় রাজগণ দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া আমেরিকাকে পর্য্যন্ত আপনাদিগের অস্ত্রশস্ত্রের প্রভাব দেখাইয়াছিলেন; মানিলাম আর্য্যদিগের আদরের সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার উৎকৃষ্ট শব্দ সমূহের প্রসূতি। ইন্দ্রপ্রস্থ সভা দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী দেখিয়া, রামচন্দ্রের অযোধ্যানগরী দেখিয়া, রাবণের স্বর্ণাট্টালিকা দেখিয়া মানিলাম ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে শিল্পনৈপুণ্যের প্রকাশ; শ্রীরাম রাবণের সমরাঙ্গনে ও শম্ব কৃষ্ণের যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্বীকার করিলাম ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে কেবল ধনুর্ব্বাণ নহে, শতঘ্নী (তোপ) ও ব্যবহৃত হইত; নারদের পার্শ্বে বসিয়া, মহাদেবকে দর্শন করিয়া, সরস্বতীর পূজা করিয়া, লবকুশের সহিত আলাপ করিয়া, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া স্বীকার করিলাম,

ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা; অযোধ্যাপতির অন্তঃপুরে লক্ষ্মণ সহ শ্রীরাম জানকীর সম্মুখে তাঁহাদিগের বিবাহ সভার চিত্রপট দেখিয়া বিশ্বাস করিলাম ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে চিত্র বিদ্যার উন্নতি। কিন্তু এক্ষণে দেখিলাম কি? যাহা শুনিলাম, যাহা মানিলাম, যাহা স্বীকার করিলাম, যাহা বিশ্বাস করিলাম তাহা আর এক্ষণে দেখিলাম না; যাহা জগৎকে দেখাইয়া ভারতের যশোঘোষণা পূর্ব্বক সুখী হইব মনে করিয়াছিলাম তাহা দেখিলাম না, যাহা দেখিলে জগৎ মোহিত হইত, যাহা দেখিলে বর্ত্তমান সুসভ্যদেশ সকল অবনত মস্তক হইত তাহা দেখিলাম না; যাহা দেখিলে বর্ত্তমান বিদ্যা, জ্ঞান, বীরত্ব, সভ্যতার অভিমানে অভিভূত জাতিবর্গের অহঙ্কার চূর্ণ হইত তাহা আর দেখিলাম না! সকলই বিপরীত দেখিলাম, ভারত আর সে ভারত নাই, আর্য্যভূমি অনার্য্য আচারে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল তাঁহাদিগের পবিত্র নাম, আমাদিগের হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছে মাত্র। যে দিন তাহাও বিস্মৃত হইব সে দিন আমরা নিশ্চয়ই ঘোর নরকে পতিত হইব।

আমরা ক্রমে দুর্ব্বল, সাহসহীন, নির্ধন, নির্ব্বীর্য্য, ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িলাম, যাহারা ভারতের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে, আমরা এক্ষণে তাহাদিগের প্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলিয়া স্বীকার করিতেছি। আর আমাদিগের দুর্দ্দশার অবশিষ্ট কি রহিল! ভারত নির্জীব প্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় না, সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হয় না। ভারতের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে! ভারতের শৌর্য্যবীর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে! মুমূর্ষু ভারত এক্ষণে ভীষ্মের ন্যায় শর-শয্যাশায়ী। এখনও শ্বাস বহিতেছে। এখন আর শুধু "ভারত! ভারত!" বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে! দুই একটি পুরাতন কথা জিজ্ঞাসা করি। ভারতের শেষ শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এখনও

ধর্ম্মতেজের প্রতীতি হইতেছে বটে, কিন্তু সে তেজও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। হে ভারত! যে ধর্ম্ম তোমাকে এক দিন জগৎপূজ্য ও সমাজ গুরু করিয়া দিয়াছিল, বর্ত্তমান প্রচলিত ধর্ম্ম কি সেই ধর্ম্ম? যে ধর্ম্ম তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সমুচ্চ শৈলশিখরে লইয়া গিয়া জগৎকে জলাঞ্জলি দিতে সাহসী করিয়াছিল, আজ কালের প্রচলিত ধর্ম্ম কি সেই ধর্ম্ম? যে ধর্ম্ম তোমার "ধর্ম্মমত" রূপ অগ্নিজ্বালা শীতল করিবার জন্য "ধর্ম্মভাব"রূপ সুস্নিগ্ধ গভীর সাগরে তোমায় অবগাহন করাইয়াছিল, যে ধর্ম্ম তোমাকে স্বাধীনতার ভাব শিক্ষা দিয়াছিল, যে ধর্ম্ম তোমাকে যোগ সমাধির গুপ্ত নিকেতনে লইয়া গিয়া সুখ-বিশ্রাম উপভোগ করিতে বলিয়াছিল, এই কি সেই ধর্ম্ম? যে ধর্ম্ম জনককে গৃহসন্ন্যাসী, শুকদেবকে উদাসী ও ভীষ্মকে ঊর্দ্ধরেতা করিয়াছিল এ কি সেই ধর্ম্ম? যে ধর্ম্ম লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্রের, অর্জ্জুনাদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়কে যুধিষ্ঠিরের বনবাসে অনুগামী করিয়াছিল, যে ধর্ম্ম পরীক্ষিতকে প্রায়োপবেশন করিতে উপদেশ করিয়াছিল এ কি সেই ধর্ম্ম? যে ধর্ম্ম আর্য্যগণকে ধৃতি, ক্ষমা, দম আদি গুণে অলঙ্কৃত করিত, যে ধর্ম্ম শীল, দয়া, দাক্ষিণ্য, মিত্রতা, অনুরাগ, প্রেম শিক্ষা দিত, যে ধর্ম্ম রাবণের সুবর্ণ পুরী ভস্মাবশেষ করিল, দুর্য্যোধনকে তৎসহকারিগণ সহ যমালয়ে প্রেরণ করিল, দময়ন্তীর সতীত্ব রক্ষা করিল, একি সেই ধর্ম্ম? হা ধর্ম্ম তুমি কোথায়! তুমি আর্য্যদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহাদিগকে তেজস্বী, যশস্বী, শৌর্য্য-বীর্য্য শালী, বিনয়ী, স্বাধীন, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় করিয়াছিলে, এক্ষণে লোক সমাজ তোমার সেই কৃপা হইতে বঞ্চিত হইল কেন? বুঝিলাম তুমি লোকসমাজে আপনার ছায়ামাত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং পর্ব্বত গুহায়, নিবিড় বনে, নির্জ্জন নদীতটে, ধ্যাননিমীলিতনেত্রে সাধুহৃদয়ের সুশীতল কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ। এখানে তামসী শ্রদ্ধা বিকট ভঙ্গী করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবে বলিয়া অনেক অন্বেষণ

করিতেছিল, সেই ভয়ে কি তুমি পলায়ন করিয়াছ? তোমাকে দেখিতে না পাইয়া ঐ কুলটা তোমার ছায়াকে বরণ করিয়াছে এবং জনসমাজকে মোহিত করিয়া সাধারণের হৃদয় রাজ্যে একাধিপত্য করিতেছে। কেবল শাস্ত্র, তীর্থ আদি তোমার কথা সকলের নিকট ঘোষণা করিতেছে। শাস্ত্র মধ্যে তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে সত্য, কিন্তু ব্যাখ্যাতৃবর্গের দোষে তুমি বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। তীর্থসমূহ তোমার কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছিল, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি লোকের কোলাহলে তাহাদিগের মধুরধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না। আমরা তোমার চিরশরণাগত এজন্য তোমার অন্বেষণ করিতেছি। অবনতশিরে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে তোমার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—

ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মঃ ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ (সত্যবিক্রম)॥

যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরোধী, তাহা ধর্ম্ম নহে, কুধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্মান্তরের বিরোধী নহে তাহাই সত্যধর্ম্ম।—মনু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, বৎস!

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শুদ্ধবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।—শাস্ত্রকে সংসার পারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম, শুনিলাম,—

ন তপাংসি ন শাস্ত্রাণি ন তীর্থানি জয়ন্তি নঃ।
সংসারসাগরোত্তারে সজ্জনাসেবনং বিনা॥

সংসার সাগর পার হইতে হইলে, সাধুসেবা ভিন্ন তপস্যা, শাস্ত্র,

বা তীর্থপর্য্যটনাদি দ্বারা ফল লাভ হয় না। কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, তীর্থরাজ প্রয়াগ, তীর্থগুরু পুষ্কর আদি পর্য্যটন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রসাদ প্রার্থনা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, বৎস! তুমি অনেক দিন অনেক পর্য্যটন করিয়া আমাদের সেবা করিলে, তোমার মঙ্গল হউক! তুমি গিরিজাপতির নিকট গমন কর, তীর্থমহিমা শুনিতে পাইবে। শিব বলিলেন,—

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং সিদ্ধি র্বরাননে॥

তমোগুণী লোক সকল এ তীর্থ ও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়, আত্মা রূপ তীর্থকে বিদিত না হইলে কোথা হইতে সিদ্ধি লাভ হইবে?

গঙ্গা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরীতে অবগাহন করিয়া করযোড়ে পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতীগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি পবিত্র হইলাম ত? জাহ্নবী শ্রীকৃষ্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন।

আত্মা নদী সংযমপুণ্যতোয়া
সত্যাবহা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাবগাহং কুরু পাণ্ডুপুত্র
ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥

শীলরূপ তট, সংযম ও পুণ্যরূপ জলে দয়ারূপ তরঙ্গ, সত্যরূপ প্রবাহ বিশিষ্ট আত্মা রূপ নদীতে অবগাহন কর, কেবল জলদ্বারা অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না।

গঙ্গাদেবীকে পৃথক জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মাতঃ! তুমি পতিত-পাবনী। আর কোথায় অবগাহন করিলে সমস্ত ফল লাভ হইবে?

তিনি বলিলেন ইহার উত্তর ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ তোমাকে বলিয়া দিবেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেন,—

যঃ স্নাতঃ শীতসীতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥

যিনি সাধুসঙ্গরূপ সুশীতল সুরসরিতে স্নান করিয়াছেন, তাঁহার দানে প্রয়োজন কি, তীর্থভ্রমণেই বা প্রয়োজন কি, কঠোর তপস্যাচারেই বা প্রয়োজন কি, আর যাগ যজ্ঞেই বা প্রয়োজন কি!—দেবতাদিগকে অনেক উপাসনা করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি এক্ষণে কাহার পূজা করিব? তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ ও উমাপতিকে জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ দিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ গম্ভীর-শব্দে বলিলেন—

সংত্যজ্য হৃদ্গৃহেশানং দেবমন্যং প্রয়ান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্ত্বা হস্তস্থকৌস্তুভং॥

নিজ হৃদয় দেবতাকে (আত্মা) পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে হস্তস্থ কৌস্তুভ মণি ত্যাগ করিয়া সামান্য রত্ন বাঞ্ছা করে বলিতে হইবে। ভবানীপতি বলেন—

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিঃস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থপিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া॥

অন্তরের শিবরূপ আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া যে বাহিরের বস্তু পূজা করে সে হস্তস্থ অন্নপিণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া বেড়ায় মাত্র।

শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমনি প্রতিধ্বনি হইল—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবিদিবি
ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতো মে হৃদয়ে সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।

যিনি সামান্যরূপ ও বিশেষরূপে সমুদয় বস্তু জানিতেছেন, দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাঁহার এই মহিমা, সেই আত্মাই ব্রহ্মপুরী হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি মনোময় ও প্রাণশরীরের নেতা এবং মনকে হৃদয়ে সংস্থাপন করতঃ শরীরেতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধীর ব্যক্তিরা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

সঙ্কেতে সাধনা পথের বৃত্তান্ত সকলের গোচর হইল। পাঠক মহোদয়গণ! আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে আমরা কয়জন সেরূপ করি? আমরা দেব-পূজা তীর্থসেবা পুস্তক পাঠ যাহা কিছু করি না কেন, যেন আর্য্যদিগের ন্যায় আদর্শ উচ্চ থাকে। আমাদিগের মধ্যে যিনি যে অবস্থায় আছেন তিনি তাহাকেই ধর্ম্মের চূড়ান্ত সীমা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, ইহাই আমাদিগের অধঃপতনের প্রধান হেতু। অবশ্য দেশ কাল পাত্র বিশেষে ও অধিকার অনুসারে সকলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধর্ম্ম আচরণ করিবেন, কিন্তু সকলকেই সেই আর্য্যদিগের যোগসমাধি ও আত্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিয়া স্থির থাকিলে চলিবে না। যদি কখন আমরা আদর্শস্থলে পৌঁছিতে পারি, তবে আমরা পূর্ব্বে যাহা স্বীকার করিয়াছি, যাহা মানিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, তাহাই দেখিতে পাইব। অলমতি বিস্তারেণ।

—o—

চতুর কে!

অদূরে জাহ্নবীতীরে বালুকার উপরে একটী আলোক জ্বলিতেছে। বিস্তীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপে একটী সুবৃহৎ উজ্জ্বল রত্নস্তূপের ন্যায় দেখিয়া হয়ত অনেকে সুখলাভ করিতেছেন। কিন্তু উহার নিকট গমন করিলে কি সে ভাব মনে থাকে? কখনই না। উহা একটী চিতা; উহাতে মনুষ্যের দেহপিঞ্জর ভস্মাবশেষ হইতেছে। নিকটে গেলে মন চকিত, এবং ভোগ বিলাস-বাসনা দূরীভূত হয়। ঔদাস্য, বৈরাগ্য আদির উদ্রেক হইয়া জীবনের নশ্বরত্ব উপলব্ধি হয়। একজন বিষয়াসক্ত পুরুষের মন বিকটরূপধারী মৃত্যুকে সম্মুখে নৃত্য করিতে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে; রোগীর মৃত্যুযন্ত্রণা তাহার স্মরণ পথে উদিত হয়, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আদি স্নেহ মমতার সামগ্রীগুলি কি প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, এইরূপ নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া তাহাকে আকুলিত করিয়া তুলে। সুচতুরের মনে কি এ সকল ভাবের উদয় হয়! চিতানল দর্শন তাঁহার চিন্তানল নির্ব্বাণের সুশীতল জল, এস্থান তাঁহার মনের পবিত্র বিলাস ক্ষেত্র। চতুর পুরুষ মৃত্যু ভয়ে ভীত নহেন; তিনি সিদ্ধ কৌশল ক্রমে মৃত্যুকে সহাস্যবদনে প্রেমালিঙ্গন করিয়া থাকেন। আজকাল যে ব্যক্তি সাংসারিকী চেষ্টায় সুনিপুণ, যে ধূর্ত্ততা বা শঠতা দ্বারা অন্যের ধনে ধনী হইতে পারে, যে ব্যক্তি অন্যের চক্ষে ধূলি দিয়া আপনার স্বার্থ সাধন করিতে পারে, জগতের লোক তাহাকেই সুচতুর বলিয়া থাকে। কি শোচনীয় অবস্থা! মনুষ্যের ক্ষুদ্র মন চতুরতার প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না। দিন দিন জগতের ভৌতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মানবহৃদয় সঙ্কুচিত ও দূষিত হইয়া আসিয়াছে। মানব! তুমি কিসের অহঙ্কার করিতেছ? তুমি জগতে আসিয়া সাংসারিক কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কি আপনাকে চতুর মনে করিতেছ? উহা চতুরতা নহে,

ধূর্ত্ততা। চতুরতা কাহাকে বলে তুমি কি জান? জগতের চক্ষে ধূলি প্রদান করা সহজ ব্যাপার, কিন্তু আপনার মনকে কিরূপে প্রবোধ দিবে? যদি তোমার দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পার, যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ইত্যাদি শত্রুগণের চক্রে না পড়িয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি জালভেদ করিতে পার, যদি তাহাদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে পার, তাহা হইলেই জানিব তুমি চতুর, নচেৎ তোমার চতুরতা কোথায়? রিপুগণ ষড়যন্ত্র করিয়া হৃদয়ের রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে, আর তুমি বাহিরে কি চতুরতা প্রদর্শন করিতেছ? চতুর হও ত প্রথমে তাহাদিগকে বশীভূত কর; ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখ, তাহা হইলে জগতে তোমার কেহই শত্রু থাকিবে না, সকলেই তোমার মিত্র হইবে! যদি চতুরতা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মহর্ষি জনকের নিকট যাও। তিনি এই দুঃখাগার সংসারে থাকিয়া চতুরের ন্যায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই ভোগ বিলাস সঙ্কুল সংসারে থাকিয়া তিনি আপনার দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়দিগকে দমনপূর্ব্বক স্বাত্মানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। জলে তৈলের ন্যায় যিনি সংসার মধ্যে থাকিয়াও উদাসীন হইয়া কার্য্য করেন, যিনি পরিবারাদি পরিবৃত হইয়াও আপনার কার্য্য বিস্মৃত হন না, এবং ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চতুর; যিনি ইহ পারলৌকিকী সদ্গতি লাভ করিতে পারেন তিনিই সুচতুর; যিনি ভগবান্‌কে প্রেম করিয়া, তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সমস্ত সুখদুঃখের ভার অর্পণ পূর্ব্বক অবকাশ অথবা মুক্তিলাভ করেন, তিনিই প্রকৃত চতুর। যিনি জন্ম, মরণ রূপ জগদ্‌যন্ত্রণাকে অতিক্রম করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই চতুর, যিনি লোক প্রকৃতি জানিয়া যথা তথা প্রণয়ে আবদ্ধ হন না, যিনি বিশুদ্ধ প্রেমজালে সকল জীবের মনকে আকর্ষণ করিতে পারেন, যিনি জগতে থাকিয়া জগৎকে মিথ্যা বোধ করিতে পারেন তিনিই চতুর; যিনি প্রকৃতি গুণে প্রকাশিত

হইয়া প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন, যিনি আপনার (আত্মার) ভিন্ন অন্যের (জগতের) সমাচার রাখেন না, তিনিই চতুর। যিনি ডুবিলেন (ভগবৎ প্রেমসাগরে) আর ভাসিলেন না, যিনি গমন করিলেন, আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না, যিনি নিদ্রিত হইলেন (সমাধি যোগে মগ্ন) আর জাগিলেন না, তিনিই চতুর। যিনি চরমে পরম পদ লাভ জন্য চিত্তচাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া চিদালোকে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তিনিই চতুর চূড়ামণি।

মোহমুদ্গার।

(১)

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাম্
কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥

হে মূঢ়! ধনাগম-তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর, শরীরে, বুদ্ধিতে ও মনে তৃষ্ণাবেশ লেশপরিশূন্য কর; নিজ পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মফলে যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতেই মনকে সন্তুষ্ট কর।

বিষয়ী বা মূঢ়, মুমুক্ষু ও মুক্ত এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই সংসারে বিদ্যমান। মুক্ত পুরুষগণ বিষয়াতীত ব্রহ্মসত্তায় বিলীনচিত্ত, সুতরাং তাঁহাদিগের ধনাকাঙ্ক্ষার আশঙ্কা নাই। মুমুক্ষু বা মুক্তীচ্ছু মানববর্গ সহজেই বিষয়-ত্যাগী, তাঁহারাও ধন সঞ্চয়ে প্রলুব্ধ হয়েন না, এই জন্য আচার্য্য বিবেকবর্জ্জিত বিষয়বিমুগ্ধচেতাগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই "মূঢ়" শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারেই যে জীবের এই দেহ লাভ, এই সুখ দুঃখ ভোগ, নানাপ্রকার ক্ষতি ও উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ়গণ জানে না এবং এই জন্যই তাহারা বিপুল বিষয়সুখ ভোগ বাসনায় বিত্তার্জ্জন বৃত্তির বশীভূত ও ব্যাকুল হইয়া থাকে। নিজ প্রারব্ধে যাহা পাইবার তাহা তুমি পাইবেই, কেহই তাহার বাধা জন্মাইতে পারিবে না; আর যাহা তোমার প্রারব্ধে নাই, তজ্জন্য তুমি শত চেষ্টা করিলেও পাইবে না, বহু চেষ্টায় তাহা হয় হয় হইয়াও হইবে না। আচার্য্য ধনোপার্জ্জন জন্য পরিশ্রম বা বিহিত চেষ্টা করিতে নিষেধ করেন নাই, কিন্তু ধনাগমের "তৃষ্ণাকে" বিসর্জ্জন করিতে

উপদেশ দিয়াছেন। ধন মহালক্ষ্মীর কৃপাসম্ভূত, উহা বিহিত উপায়ে উপার্জ্জিত, বিহিত কার্য্যে ব্যয়িত বা বিসৃষ্ট হইলে মানবের কল্যাণপ্রদ হয়।

বরং দারিদ্র্যমন্যায়প্রভবাদ্বিভবাদপি।
ক্ষীণতাপি বরং দেহে পীনতা নতু রোগজা ॥

অন্যায়-প্রভব ধনে (অত্যাচার, চৌর্য্য, জুয়াচুরি, উৎকোচ গ্রহণাদি দ্বারা) ধনী হওয়া অপেক্ষা বরং দরিদ্র হইয়া থাকা ভাল, কেননা রোগে ফুলিয়া পীন (স্থূল) কলেবর হওয়া অপেক্ষা কৃশ দেহে সুস্থ থাকা উত্তম।

অনেক সময় তোমার নিজ গৃহে কোন উৎসব কালে তোমার বন্ধুকে সপরিবারে সমাগত হইবার জন্য তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া থাক। এরূপ স্থলে সৎ পাত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া যদি কুলনারীগণকে শিবিকাদি উত্তম সুরক্ষিত বাহনে গৃহে আনয়ন কর, তাঁহাদিগকে উত্তম স্থানে বসিতে ও বিশ্রাম করিতে দাও, তাঁহাদিগকে সমাদর ও যত্ন সহ উত্তম রূপে ভোজন করাও, ভোজনান্তে তাঁহাদের অভিমত কালে সুরক্ষিত যানে আরোহণ করাইয়া তত্তৎপতি সদনে পাঠাইয়া দাও, তবে আবার কখন কার্য্যোপলক্ষে আমন্ত্রণ করিলে কুলবতীগণ তোমার গৃহে উৎসাহপূর্ব্বক আগমন করেন। আর যদি নিমন্ত্রণ করিয়া অসম্মান প্রকাশক যানে আনাইয়া তাঁহাদের মর্য্যাদানুরূপ আসন, বিশ্রাম স্থানাদির ব্যবস্থা না কর, যদি তাঁহাদের প্রতি অশিষ্টাচার পূর্ব্বক অবমাননা সহ বিদায় দাও, তবে সময়ান্তরে তুমি মাথা কুটিয়া মরিলেও আর তাঁহারা তোমার গৃহে কখন আসিতে ইচ্ছা করেন না। তোমার যখনই কার্য্য পড়ে, তখনই তোমার (জীবের) পরমবন্ধু ভগবান্কে তাঁহার প্রিয়া (লক্ষ্মী) সহ নিমন্ত্রণ না করিলে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হয় না। অতএব মা লক্ষ্মীকে সসম্ভ্রমে

ধর্ম্মরীতিতে আমন্ত্রণ কর, পবিত্রভাবে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ কর, নিজ পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি পরিপালনে, অতিথি,অভ্যাগত, সাধু,ব্রাহ্মণ, দীন, দুঃখী, অনাথজন ভরণপোষণে, শুভকর কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠানে, যাগ যজ্ঞ পূজা পাঠ ব্রতোপকরণে ধনের ব্যয়, বিসর্জ্জন কর, তাহা হইলেই ধন (লক্ষ্মী) যেখান (ভগবদ্‌ভবন) হইতে আসিয়াছিলেন, আবার সেইখানে (ভগবৎ-সকাশে) পৌঁছিবেন, লীলাময়ী তোমার শিষ্টাচার ও সব্যবহারে প্রসন্না হইবেন, আবার যখনই তুমি আহ্বান করিবে, ভগবান্ লক্ষ্মীকে তোমার গৃহে তখনই প্রেরণ করিবেন। আর যদি তুমি অসদুপায়ে ধনার্জ্জন কর, সুরাপান, বেশ্যাগমন ও পরোৎপীড়নে ধনের অযথা ব্যয়—বিদায় কর, তবে সে ধনের স্বধামে পৌঁছিতে বড় ক্লেশ হইবে, এবং সময়ান্তরে তুমি কাতর প্রাণে কাঁদিয়া মরিলেও আর ভগবান্ ও মহালক্ষ্মীর দয়ালাভ করিতে পারিবে না।

সদুপায়ে ধনোপার্জ্জন ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিতান্ত অনুকূল। যোগী-জ্ঞানী-দিগের বৈরাগ্যপূর্ণ সাধন ক্ষেত্রে ধন ত্যাগযোগ্য হইলেও চতুরাশ্রমিবর্গের পালনকর্ত্তা গৃহস্থের পক্ষে ধনোপার্জ্জন নিতান্ত আবশ্যক ও শাস্ত্রবিহিত। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন :—

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে।
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে॥
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ।
তস্মাদর্থমুপার্জ্জনং কুরু সখে চার্থেন সর্ব্বে বশাঃ॥

তুমি বিদ্যাবান্ হও, বুদ্ধিমান্ হও বা বিচারবান্ হও না কেন, যদি অর্থার্জ্জনে অসমর্থ হও, তবে তোমার মাতা এ বাড়ী ও বাড়ীতে তোমার অপযশ গান করিবেন, তুমি নির্ধন হইলে পিতা তোমাকে আদর অভি-

ভৃত্যকে ডাকিলে সে বিরক্ত হইবে, তুমি নির্ধন, কিছু দিতে পার না বলিয়া তোমার পুত্রও তোমার কাছে আসিবে না, তুমি বসন ভূষণ দানে অসমর্থ সুতরাং তোমার ভার্য্যাও তোমাকে প্রেমালিঙ্গন দানে পরাঙ্মুখ হইবেন। যদি বল, ইহারা পোষ্যবর্গ, ইহারা ধনের আশা করিয়া থাকে, ধন না দিলে ইহারা অসন্তুষ্ট হইবারই কথা, কিন্তু যাহারা আমার নিকট ধনের আশা করে না, আমি না হয় সেই বন্ধু বান্ধববর্গের সহবাসে সুখে থাকিব। কিন্তু তাহা ত তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে না। কেননা বন্ধু যদিও তোমার নিকট ধন প্রাপ্তির আশা করেন না সত্য, কিন্তু পাছে নির্ধনতা বশতঃ তুমিই তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা কর, তাই ভয়ে সুহৃজ্জন তোমার সহিত কথাও কহিতে অগ্রসর হইবেন না। অতএব হে সখে! এই সকল চিন্তা করিয়া অর্থোপার্জ্জন কর, ধন হইলে সকলেই তোমার অনুগত হইবে।

আচার্য্য ধনার্জ্জন পরাঙ্মুখ হইতে কাহাকেও উপদেশ করেন নাই, তবে "ধনাগম তৃষ্ণার" পরিপীড়িত হইয়া পাছে জীবের অন্তঃকরণ সদা ব্যথিত হয়, সেই জন্য দয়া করিয়া "তৃষ্ণা" নিবারণার্থই সতর্ক ও সাবধান করিতেছেন। কেননা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বসংসারদুঃখানাং * তৃষ্ণৈকা দীর্ঘদুঃখদা।
অন্তঃপুরস্থমপি যা যোজয়ত্যতিসঙ্কটে॥

১৭শ সর্গ, যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্য-প্রকরণ।

সংসারে যত প্রকার দুঃখ আছে তন্মধ্যে তৃষ্ণাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখপ্রদা। যে অন্তঃপুর হইতেও কখনও বাহিরে যায় না তৃষ্ণা তাহাকেও মহাসঙ্কটে ফেলিয়া থাকে।

* দোষাণাং ইতি বা পাঠঃ।

হার্দ্দান্ধকার-শর্ব্বর্য্যা তৃষ্ণয়েহ দুরন্তয়া।
স্ফুরন্তি চেতনাকাশে দোষাঃ কৌশিকপঙ্‌ক্তয়ঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্য-প্রকরণ ১৭শ সর্গ, ১ম শ্লোক।

তৃষ্ণার উচ্ছেদ সাধন দুষ্কর। এই তৃষ্ণা আত্মতত্ত্ব বিকাশের পক্ষে অন্ধকার রজনী সদৃশী। রাগ দ্বেষাদি পেচকবৃন্দ এই রজনীতেই জীব-গগনে বিচরণ করিয়া থাকে।

অলমন্তর্ভ্রমায়ৈব তৃষ্ণাতরলিতাশয়া।
আয়াতা বিষমোল্লাসমূর্ম্মিরম্বুনিধাবিব॥

যেমন তরঙ্গ সমুদ্রগর্ভ আলোড়িত করিয়া অতিশয় আবর্ত্তের সৃষ্টির জন্যই বিকটভাবে সঞ্চরণ করে, তদ্রূপ তৃষ্ণা মনের বিক্ষোভ সম্পাদনপূর্ব্বক অধিকতর আন্তরিক ভ্রমোৎপাদনার্থ উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকে।

যাং যামহমতীবাস্থাং সংশ্রয়ামি গুণশ্রিয়াম্।
তাং তাং কৃন্ততি মে তৃষ্ণা তন্ত্রীমিব কুমূষিকা॥

আমি বিবেক বৈরাগ্যাদি গুণসম্পত্তি বিষয়ে যে যে আস্থা স্থাপন করি, দুষ্ট মূষিক যেমন তন্ত্রীচ্ছেদন করে তদ্বৎ তৃষ্ণাও আমার সেই অবস্থা করিয়া দেয়।

ভীষয়ত্যপি ধীরং মাং অন্ধয়ত্যপি সেক্ষণম্।
খেদয়ত্যপি সানন্দং তৃষ্ণা কৃষ্ণেব শর্ব্বরী॥

যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্য-প্রকরণ ১৭শ সর্গ, ১৬।

তৃষ্ণা ঘোরান্ধকারা কাল নিশার ন্যায় ধীরকেও ভীত করে, চক্ষুষ্মান্‌কেও (জ্ঞান দৃষ্টি থাকিলেও) অন্ধ করে এবং শান্ত পুরুষকেও খেদযুক্ত করিয়া দেয়।

পদং করোত্যলঙ্ঘ্যেঽপি তৃপ্তাপি ফলমীহতে।
চিরং তিষ্ঠতি নৈকত্র তৃষ্ণা চপলমর্কটী ॥২৯॥

যোগঃ বাঃ, বৈরাগ্য ১৭শ সর্গ।

তৃষ্ণা চপল মর্কটীর ন্যায় যেস্থান লঙ্ঘন করা অনুচিত সেস্থানেও গমন করে, একবার পরিতৃপ্ত হইলেও পুনঃ ফলাকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হয়, দীর্ঘকাল কোন একস্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। তৃষ্ণা তৃপ্ত হইয়াও সন্তৃপ্ত হয় না। অর্থাৎ তৃষ্ণা দুষ্প্রাপ্য বস্তুতে আসক্তি বৃদ্ধি করায় অভাব না থাকিলেও আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করে, এবং জীবকে সর্ব্বদা চঞ্চল করে।

সর্ব্বেষাং জন্তুজাতানাং সংসার ব্যবহারিণাম্।
পরিপ্রোতমনোমালা তৃষ্ণা বন্ধনরজ্জুবৎ ॥

ঐ ঐ—৩৪।

যেমন বহু পশুর কণ্ঠবদ্ধ রজ্জু এক সুদীর্ঘ বন্ধন রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখে, তৃষ্ণা সংসার ব্যবহারকালে সেইরূপে জীবসকলকে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যাতি নভস্তলম্।
ক্ষণং ভ্রমতি দিক্কুঞ্জে তৃষ্ণা হৃৎপদ্মষট্‌পদী ॥

ভ্রমরী যেমন কখন ঊর্দ্ধ আকাশে, কখন নিম্নদেশে, কখন বা নানা দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তৃষ্ণাও তদ্রূপ মানবকে আকাশ পাতাল ঘুরাইয়া মধুকরীর ন্যায় হৃৎকমলের সুধা পান করে ও হৃদয়কে বিশুষ্ক করিয়া ফেলে।

অশনির্গুণশস্যানাং ফলিতা শরদাপদাম্।
হিমং সংবিৎসরোজানাং তমসাং দীর্ঘযামিনী ॥

ঐ ঐ ৩৬ শ্লোক।

এই তৃষ্ণা, বিবেকাদি গুণগ্রামের বজ্রপাত তুল্য, আর্পৎরূপ শস্ত ফলনে শরৎকাল সদৃশ। তৃষ্ণাই জ্ঞানরূপ কমলের পক্ষে তুষারপাতের সমান, অজ্ঞানান্ধকারের সুদীর্ঘ হেমন্ত-রজনী স্বরূপা।

গচ্ছত্যুপশমং তৃষ্ণা কায়-ব্যায়াম-শান্তয়ে।
তমী ঘনতমঃ কৃষ্ণা যথা রক্ষো নিবৃত্তয়ে ॥৪১॥
তাবন্মুহ্যত্যয়ং মূকো লোকো বিলুলিতাশয়ঃ।
যাবদেবানুসন্ধত্তে তৃষ্ণা বিষ-বিসূচিকা ॥৩২॥
লোকোঽয়মখিলং দুঃখং চিন্তয়োজ্‌ঝিতয়োজ্ঝতি।
তৃষ্ণা বিসূচিকা মন্ত্রশ্চিন্তাত্যাগো হি কথ্যতে ॥২॥

যেমন মেঘান্ধকার সমাচ্ছন্না রজনীর অবসান হইলে রাক্ষসগণ অর্থাৎ নিশাচরগণ দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ তৃষ্ণার উপশম হইলে দেহক্লান্তির শান্তি হয়। বিষ বিশেষ দূষিত বিসূচিকার যাবৎ বিরাম না হয়, তাবৎ রোগী রুদ্ধকণ্ঠ ও মূর্চ্ছিত থাকে, তদ্রূপ তৃষ্ণার উপশম না হইলে সংসারী জীব অধ্যাত্ম শাস্ত্রালাপনে অপটু ও বিমোহিতচিত্ত ও মোহগ্রস্ত থাকে। চিন্তা ত্যাগই তৃষ্ণারূপ বিসূচিকার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র মহামন্ত্র।

এইজন্য ধন সংগ্রহে দুশ্চিন্তা-দূষিত বিষয় তৃষ্ণা বিসর্জ্জন করাই ধীরগণের অনুমোদিত।

মানবগণ মধ্যে কেহ কেহ পুষ্টি বা পূর্ত্তি এবং কেহ কেহ তুষ্টি বা তৃপ্তির অনুসরণ করিয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি লোকে যখন যাহাতে তৃষ্ণা হয় তখন তাহারই পোষণ বা পূর্ত্তি করিয়া সুখী হইতে চায়, কেননা তৃষ্ণাকে যতই পূর্ণ করনা কেন, ক্ষণ বিলম্বেই তৃষ্ণা আবার লোল রসনা বিস্তার করিয়া থাকে। শান্তিশতকে লিখিত আছে—

নিস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ,
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনর্নরেন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কো গতঃ॥

যাহার কিছু নাই সে ভাবে আমি শত মুদ্রা পাইলেই সন্তুষ্ট হইব, শত মুদ্রা পাইলে সহস্র টাকা পাইবার আকাঙ্ক্ষা হয়, সহস্র টাকা হস্তগত হইলে লক্ষপতি হইতে ইচ্ছা হয়, লক্ষেশ্বর রাজ্যেশ্বর হইবার কামনা করে, পৃথিবীর অধিকার পাইলে স্বর্গের রাজত্ব লাভে ইচ্ছা হয়, সুরপতির আবার ব্রহ্মপদে বাসনা হয়, ব্রহ্মার বিষ্ণুপদে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপ তৃষ্ণার বার বার পূর্ত্তি হইলেও উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আশার শেষ সীমায় কেহই যাইতে পারে না

বস্তুতঃ তৃষ্ণার যতই পুষ্টি বা পূর্ত্তি করিতে যাইবে, ততই অগ্নিতে আহুতি দানে অগ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে। এইজন্যই সাধুগণ বিষয় ভোগাশয়ে তৃষ্ণার পূর্ত্তি করিতে না গিয়া আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণার ত্যাগ দ্বারাই তুষ্টি বা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ।"

যত ভোগই করি না কেন, তৃষ্ণা জীর্ণ হইল না, আমরাই জীর্ণ হইলাম। তৃষ্ণার সেবন করিয়া যখন আশা পূর্ণ না হয়, তখন আক্ষেপ করিয়া জীব বলিতে থাকে,

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো,
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতি নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।

মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ,
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাং॥

বৈরাগ্য শতক, ৪র্থ শ্লোক।

গুপ্তধন বা মণিমাণিক্যাদি লাভাশয়ে ভূতলখনি খনন করিলাম, পর্ব্বতের ধাতুরাশি দগ্ধ করিলাম, দুর্লঙ্ঘ্য পয়োনিধির পরপারে গমন করিলাম। কত যত্ন সহকারে রাজন্যবর্গের চিত্ত বিনোদন করিলাম, প্রাণ ভয় বিসর্জ্জন দিয়া নির্জ্জন শ্মশানে মন্ত্র সাধন জন্য কত নিশাই যাপন করিলাম, কিন্তু তথাপি এক কাণা কড়িও প্রাপ্ত হইলাম না। অতএব হে তৃষ্ণে! এখন তুমি আমাকে ত্যাগ কর।

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ
নিগৃহ্যান্তর্ব্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা।
কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে মোঘাশে কিমু পরমতো নর্ত্তয়সি মাম্॥

ঐ ৫ম।

ধনতৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া দুর্জ্জনগণেরও আরাধনায় তৎপর হইয়াছি, তাহাদের কত দুর্ব্বাক্যই সহিয়াছি। ভিতরে মনঃ প্রাণ কাঁদিতে থাকিলেও তাহাদের চিত্ত বিনোদনার্থ বাহিরে হাস্য পরিহাস করিয়াছি, তাহাদের মনস্তোষের জন্য কত অযোগ্য স্তুতিবাদই করিয়াছি। কিন্তু হে আশে! ইহাতেও তুমি তৃপ্ত হইলে না। তুমি আমাকে আর কত নাচাইবে?

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে নিরন্তর বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হইতে হয় বলিয়া আচার্য্য ধনাগম তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে বলিলেন, এবং ইহাও বলিলেন যে পাছে আবার তৃষ্ণার সঞ্চার হয়, এজন্য শরীর, বুদ্ধি ও মনে যাহাতে তাহাদের কোনরূপ চেষ্টা না হয়, তাহার প্রযত্ন কর। যদি বল ধন ব্যতীত আমার

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে ? তাই কথিত হইল, তোমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম যদ্দ্বারা তুমি সুখ দুঃখ ভোগের জন্য এই ভোগায়তন দেহ লাভ করিয়াছ, সেই কর্ম্ম দ্বারাই তোমার ভোগার্থ ধন তুমি প্রাপ্ত হইবে। যত্ন চেষ্টা যতই কর না কেন, প্রারব্ধাধীন ধন ব্যতীত অধিক ধন কিছুতেই পাইবেনা, কেন না কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী।

নমস্যামো দেবান্নন্নু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ,
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥

শান্তিশতক, ১ম শ্লোক।

তত্ত্বজ্ঞ শ্রীমৎ শিহ্লন মিশ্র শুভফলাকাঙ্ক্ষায় কাহাকে স্তুতি প্রণতি করা বিধেয় বিবেচনায় প্রথমে দেবতাগণকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখিলেন যে,দেবতাগণ বিধাতার বশীভূত। এইজন্য দেবগণকে প্রণাম না করিয়া বিধাতাকে নমস্কার করিতে গেলেন, কিন্তু দেখিলেন বিধাতা স্বয়ং ফলদানে সমর্থ নহেন, তিনি কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়াই শুভাশুভ বিধান করিয়া থাকেন; তখন ভাবিলেন, তবে কর্ম্ম ফলকেই নমস্কার করি, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলেন যে ফলও ত কর্ম্মাধীন, তখন কর্ম্মকেই নমস্কার করা স্থির করিলেন, বিধাতাও কর্ম্মের গতি খণ্ডন করিতে অসমর্থ। অতএব কর্ম্মের গতিই বলবতী।

রাম ঝরোখা বৈঠ্‌কে সবকা মজুরা লেয়।
জ্যায়সী জিসকী করণী ওঁয়সীহী উসকো দেয় ॥

ঘরের উচ্চস্থানে বাতায়নে বসিলে যেমন তুমি বাহিরের সকলকে দেখিতে পাও, কিন্তু তোমায় বাহিরের কেহ দেখিতে পায় না, সেইরূপ

ভগবান্ নিজে নিভৃত নিকেতনের ঊর্দ্ধ স্থানের ঝরোখা (গবাক্ষ) দ্বারে বিরাজমান থাকিয়া সকল জীবের কার্য্যাকার্য্যের সেবা গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার করিতেছেন, যাহার যেমন কর্ম্ম তাহাকে তেমনি সুখ দুঃখ ভোগাভোগ রূপ পারিশ্রমিক দান করিতেছেন।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষম্ ।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মসূত্রেই জীবের সুখ দুঃখ লাভালাভরূপ ফল হইয়া থাকে। বিদ্যা বা পৌরুষ সুখ দুঃখাদি ভোগের হেতু নহে। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে—

পুরাধীতা চ যা বিদ্যা পুরা দত্তঞ্চ যদ্ধনম্ ।
পুরা কৃতানি কর্ম্মাণি অগ্রে ধাবতি ধাবতঃ ॥

পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিতা বিদ্যা, পূর্ব্ব জন্মে প্রদত্ত ধন, পূর্ব্ব-জন্মানুষ্ঠিত কর্ম্ম-রাশি মানবের জীবন পথের অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়।

অতএব কর্ম্মলব্ধ ধনেই সন্তুষ্ট হও, বৃথা আশা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া ব্যথিত হইও না।

যত্র মৃত্যুর্যতো হন্তা যত্র শ্রীর্যত্র সম্পদঃ ।
তত্র তত্র স্বয়ং যাতি প্রেষ্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥

মনুষ্য জন্মার্জ্জিত কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া যেখানে মৃত্যু, যেখানে হন্তা, যেখানে ধন, যেখানে সম্পদ্ সেস্থানে সে স্বয়ংই গমন করে।

ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি ।
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ॥

যেমন সহস্র সহস্র গাভীর মধ্যে বৎস আপনার জননীকে চিনিয়া

লইতে পারে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম আপনা হইতেই কর্ত্তাকে প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মাণ্যত্র-প্রধানানি সম্যগৃক্ষে শুভগ্রহে।
বশিষ্ঠদত্তে লগ্নেঽপি জানকী দুঃখভাজনম্‌॥

সংসারে সুখ দুঃখাদি সমস্তই কর্ম্ম-সুলভ। শুভ নক্ষত্রে, শুভ গ্রহে ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় মহাপুরুষের স্থিরীকৃত শুভলগ্নে বিবাহ হইলেও রাজ-দুহিতা ও রাজবনিতা সীতাকে চিরদিন কেবল কষ্টই ভোগ করিতে হইল।

ন পিতুঃ কর্ম্মণা পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকর্ম্মণা।
স্বয়ংকৃতেন গচ্ছন্তি স্বয়ংবদ্ধাঃ স্বকর্ম্মণা॥

পুত্র পিতার অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা অথবা পিতা পুত্রকৃত কর্ম্মপাশ দ্বারা আবদ্ধ হয় না, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হইয়া সংসার হইতে চলিয়া যায়।

কর্ম্মজন্যশরীরেষু রোগাঃ শারীরমানসাঃ।
শরা ইব পতন্তীহ বিমুক্তা দৃঢ়ধন্বিভিঃ॥

যেমন স্থিরহস্ত ধনুর্দ্ধারী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য স্থানে নিশ্চিত পতিত হয়, সেইরূপ কর্ম্মকার্ম্মুক নির্ম্মুক্ত ফল স্বরূপ রোগ ও শোক শরের ন্যায় শরীর ও মনে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

ন চান্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে
ন পর্ব্বতানাং শিবরপ্রদেশে।
ন মাতৃমূর্দ্ধ্নি প্রধৃতস্তথাঙ্কে
ত্যক্তুং ক্ষমং কর্ম্ম কৃতং নরো হি

মনুষ্য যদি আকাশ মার্গে উড়িয়া যায় বা সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন থাকে, কিম্বা গিরিবিবরে লুকাইয়া নিভৃত বাস করে, অথবা মায়ের মস্তকে বা ক্রোড়ে অতি সন্তর্পণে ও যত্নে রক্ষিত হয়, তথাপি সে ব্যক্তি কর্ম্মের হাত হইতে কোন মতেই এড়াইতে পারে না।

অন্যথা শাস্ত্রগর্ভিণ্যা ধিয়া ধীরোঽর্থমীহতে।
স্বামিবৎ প্রাক্তনং কর্ম্ম বিদধাতি তদন্যথা॥

বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানের অনুগত যুক্তি দ্বারা উপায় স্থির করিয়া অর্থাগমের চেষ্টা করেন, কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম, প্রভুর ন্যায়, তাঁহার সেই উপায়কে অন্যপ্রকারে পরিণত করে।

অতএব কর্ম্মলব্ধ ধনেই সন্তুষ্ট হও, বৃথা আশা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া ব্যথিত হইও না। এই অবধারণ করিয়া তৃপ্ত হও যে—

প্রাপ্তব্যমর্থং * লভতে মনুষ্যো
দৈবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখা † ন পুনঃ প্রয়াতি॥

মানবের পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যে অর্থ প্রাপ্তব্য তাহা সে অবশ্যই পাইবে, দৈবও তাহাতে বাধা দিতে পারেন না। বহু পরিশ্রম ও বহু যত্ন চেষ্টা করিয়াও যদি আমি অধিক ধন না পাই তজ্জন্য আমার পরিতাপ নাই, আর যদি বিনা আয়াসে ও বিনা প্রয়াসে অকস্মাৎ বিপুল ঐশ্বর্য্য পাই, তাহাতেও আমি বিস্ময়াপন্ন হই না, কেননা ললাট লিপির কোন মতেই খণ্ডন হয় না।

* লব্ধব্যমর্থমিতি বা পাঠঃ। † লেখো ইতি বা পাঠঃ।

(২)

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥

অর্থকে সর্ব্বদাই অনিষ্টের মূল বলিয়া জানিবে। বস্তুতঃই তাহাতে সুখের লেশ মাত্রও নাই। ধনবান্ ব্যক্তি পুত্র হইতেও ভয় পাইয়া থাকে, সর্ব্বত্রই এইরূপ নীতি উক্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রে যাহা "অর্থ" বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাকে আচার্য্য অনর্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন কেন? দুগ্ধ সুস্থ শরীরে অমৃত তুল্য উপকারী ও উপাদেয় হইলেও বিসূচিকা রোগাধিকারে উহা যেমন বিষের ন্যায় ফল দান করে, ছুরিকা যেমন বুদ্ধিমানের হাতে নানা আবশ্যক কার্য্যে ব্যবহৃত হইলেও অবোধ শিশুর নিকট অঙ্গে আঘাত লাগিবারই কারণ হয়, সেইরূপ অর্থ বিষয়-বিতৃষ্ণ অনাসক্ত ব্যক্তির কোন হানি করিতে পারে না বটে, কিন্তু লুব্ধচিত্ত বিষয় বিমূঢ়গণের বিশেষ রূপ বিঘ্ন করিয়া থাকে। নীতি শাস্ত্রেও লিখিত হইয়াছে—

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্॥

যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা ইহার মধ্যে এক একটী হইতেই অনর্থপাত হয়, আর যদি চারিটি একত্র হয় তবে ত অনর্থের সীমাই থাকে না। ধনগর্ব্বে অন্ধীভূত হইয়া কত ধনী ব্যক্তি কত দীন দুঃখীর প্রতি যে অত্যাচার করে, তাহা কাহার অবিদিত আছে?

অধিক কি, লিখিত আছে—

শেষে ধরা-ভরাক্রান্তে নিদ্রিতো জলশায়িনঃ।
লক্ষ্মীবন্তো ন পশ্যন্তি দুঃসহাং পরবেদনাম্॥

সংসারের প্রলয়ান্তে ভগবান্ অনন্তনাগ শয্যায় বিশ্রাম করেন, লক্ষ্মী তাঁহার পদ সেবা করিতে থাকেন। তাই কবি বলিয়াছেন যে ভগবান্ নিজে পরম দয়ালু, তথাচ শেষ নাগকে ধরাধারণে অতি ভারাক্রান্ত জানিয়াও তাহারই উপর আপনার বিশ্রাম শয্যা করিলেন; কেননা লক্ষ্মী যাঁহার নিকটে থাকেন, সে ব্যক্তি পরের দুঃসহ দুঃখ দেখিয়াও দেখে না। অতএব ধনবান্ মানব অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি!

অর্থ লোভে কত যুবতী পতি-প্রীতি ছাড়িয়া উপপতি পার্শ্বে উপনীত হইতেছে, অর্থ পুরস্কার পাইবে বলিয়া কত পাষণ্ড কত ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদ পর্য্যন্ত করিতেছে তাহা কেনা জানে? অনেকের মনে মনে দুরভিসন্ধি থাকিলেও অর্থাভাবে তাহা সাধন করিতে পারে না। কিন্তু অর্থবানের মনে কুকর্ম্মের বাসনা হইলে তখনই সে তাহা সম্পাদন করে ও পরিণামে ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তির অর্থ অসৎ কার্য্যেই অপব্যয়িত হয়। ধনৈশ্বর্য্যই রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ বিস্তার করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণীর হানি করিয়া থাকে; ধনের মত্ততা, মদিরা পানোন্মত্ততা অপেক্ষাও বিষময় ফল প্রসব করে। এইজন্য অর্থ অতি অনর্থকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধনে কখনই যে সুখলাভ হয় না, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য, কেন না—

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥

অর্থের উপার্জ্জন করিতে হইলে বিদেশ বাস, ভূগর্ভ খনন, শ্বাপদ

সমাকুল অরণ্যে বিচরণ, দুরারোহ পর্ব্বত লঙ্ঘন, পরপদ সেবন, শীতোত্তাপ তিরস্কারাদি সহন, গুরুভার বহনাদিতে কতই দুঃখ যাতনা পাইতে হয়। যদিও কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জিত হইল, চৌরাদি হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কতই যত্ন ও দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং দস্যুগণ কেবল ধন লইয়াই ক্ষান্ত হয় না। গৃহের কোন্ গুপ্ত স্থানে ধন লুক্কায়িত আছে তাহা জানিবার জন্য অথবা পাছে তাহাদের চৌর্য্য ব্যাপার প্রকাশিত হয়, এজন্য ধনাধিকারী ও ধনরক্ষাকারী আদি কত লোকের প্রতি পীড়ন, কত লোকের প্রাণ নাশও করিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য রক্ষার জন্যই রাজদ্বারে অভিযোগাদি করিতে ও ধর্ম্মাধিকরণে জয় লাভ জন্য কত কূট উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কত লোকের অযথা স্তুতি মিনতিও করিতে হয়। যদি জল বা অগ্নি বা চোরের দ্বারা এই ধন বিনষ্ট হয়, তবে মনস্তাপের সীমা থাকে না, তাহার পুনরুদ্ধার করা অতীব ক্লেশসাধ্য। যদি নিজ কার্য্যেই ব্যয় হইয়া যায়, তাহাতেও দুঃখ, কেননা উহা থাকিলে সুদের সুদ আসিত। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে অর্থ আসিলে দুঃখ, থাকিলে দুঃখ ও গেলেও দুঃখ হইয়া থাকে। ধন কোনও কালেও সুখদায়ী নহে।

ধর্ম্মতঃ পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন,—

ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমং।
ভজেরন্ পৈত্রিকং রিকৃথমনীশাস্তে হি জীবতোঃ॥

মনু।

পিতা ও মাতার দেহান্ত হইলে ভ্রাতৃগণ একত্র মিলিত হইয়া পিতৃধন ও মাতৃধন সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবে, কেন না পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনে তাঁহার জীবদ্দশায় পুত্রগণের কিছুমাত্র অধিকার নাই।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন,—

বিভাগশ্চেৎ পিতা কুর্য্যাদিচ্ছয়া বিভজেৎ সুতান্।
জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন সর্ব্বে বা স্যুঃ সমাংশিনঃ॥

পিতার মরণোত্তর কালে পুত্রগণ ত পিতৃধনে অধিকারী হইবেই, কিন্তু পাছে পুত্রগণ ধন বিভাগে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিপদগ্রস্ত হয়, এইজন্য পিতা স্বয়ংই জীবিত থাকিতে স্বোপার্জ্জিত ধন ইচ্ছামত বিভাগ করিয়া দিতে পারিবেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল ধনের প্রধান ভাগী অথবা সকল পুত্রকেই সমাংশভাগী করিয়া দিবেন।

এই ধনভাগী পুত্রগণ অনেক সময়ে শীঘ্র শীঘ্র ধন ভোগ বাসনায় পিতাকে হত্যা করিতেও ক্রটী করে না। সম্রাট অরঙ্গজেব নিজ পিতা সাজাহানকে কারাবরুদ্ধ রাখিয়া রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন। অর্থ এমনই সামগ্রী যে ইহার জন্য রাজা চৌরাদি হইতে ত ভয় হইয়াই থাকে, প্রাণের অন্তরঙ্গ প্রিয় পুত্র হইতেও নির্ভয় থাকা কঠিন।

—o—

(৩)

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব-বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥৩॥

স্ত্রী তোমার কে? পুত্রই বা তোমার কে? এই সংসার অতি বিচিত্র। তুমিই বা কার, কোথা হইতেই বা তুমি আসিয়াছ, হে ভ্রাতঃ! এই তত্ত্ব এখন চিন্তা কর।

যে স্ত্রীকে তুমি অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী জীবনের চিরসঙ্গিনী বলিয়া ভাল বাসিয়াছ, যে স্ত্রীকে ক্ষণার্দ্ধ না দেখিতে পাইলে ত্রিজগৎ শূন্য দেখ, সে স্ত্রী তোমার বস্তুতঃ কে? যে স্ত্রীকে বসন ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া তোমার আহ্লাদের সীমা থাকে না, যে স্ত্রীকে প্রাণ-প্রণয়িনী বোধে, তাহার প্রীতি সাধনার্থ আপনার প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছ, যাহার মন যোগাইতে গিয়া সময়ে সময়ে আত্মহারা হইয়া যাও, সেই স্ত্রীর সহিত তোমার বস্তুতঃ কতদূর সম্বন্ধ, তাহা কি একান্তে বসিয়া একবারও ভাবিয়াছ? মনের আবেগে রূপজ মোহে বিমোহিত হইয়া স্মর-শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ইন্দ্রজাল-মন্ত্রমুগ্ধবৎ অচেতন হইয়া তুমি যে ভাবে নিজ কামিনীর কুহকময়ী মমতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছ, তাহাই কি সুবুদ্ধি-বিচার প্রণোদিত? মানিলাম ভার্য্যা তোমার শাস্ত্রানুসারে পরিগৃহীতা, বুঝিলাম তোমার কান্তা পুত্র-প্রসূতি হইয়া পিতৃ পিণ্ডোদকের ব্যবস্থা করিয়া দিবে, স্বীকার করি স্ত্রী পরিগ্রহ না করিলে তোমার আশ্রম ধর্ম্মের অনেক কার্য্যই অসম্পূর্ণ থাকিত, তাই বলিয়াই তুমি যে "প্রাণপ্রিয়া" বলিয়া অজ্ঞান হইবে, ইহাই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? স্ত্রীকে ভোগানুসারিণী না করিয়া যোগানু-গামিনী করিয়া লও, রূপে মোহিত না হইয়া ভক্তি, সেবা, স্নেহ, করুণা আদি সতী বনিতার গুণরাশির সাহায্য গ্রহণ কর। কাম কার্ম্মুক শরে অভিভূত হইয়া স্ত্রী জাতির যৌবন জলদজালে বিদ্যুদ্বিকাশ তুল্য ক্ষণ ভঙ্গুর রূপ লাবণ্যে দিশাহারা হইও না। ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

মাংস পাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্র-লোলেঽঙ্গপঞ্জরে।
স্নায়্বস্থি-গ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্ ॥১॥
ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনম্।
সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি ॥২॥

ইতঃ কেশা ইতো রক্তমিতীয়ং প্রমদাতনুঃ।
কিমেতয়া নিন্দিতয়া করোতি বিপুলাশয়ঃ ॥৩॥

যোগাবশিষ্ঠ, বৈরাগ্যপ্রকঃ, ২১শ সর্গ।

[স্নায়ু অস্থি গ্রন্থিশালিনী মাংসপুত্তলী রমণীর যন্ত্রবৎ চঞ্চল অঙ্গ সমূহে প্রকৃত পক্ষে শোভার সামগ্রী কি আছে? হে মানব! সেই হরিণ-লোচনার কটাক্ষপূর্ণ চক্ষু, ত্বক্, মাংস, রক্ত, বাষ্প ও জল এই সকল পৃথক্ করিয়া দেখ; তখন যদি ইহা রমণীয় বলিয়া বোধ হয় ত আসক্ত হইও, নচেৎ বৃথা মুগ্ধ হইতেছ কেন? এখানে কেশ, ওখানে শোণিত এই সব লইয়াই ত রমণীর কলেবর। মহামতি ব্যক্তিগণ এই নিন্দিত নারীদেহ লইয়া কি করিবেন?

তাই শুকদেব বলিয়াছিলেন,—

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে,
স্বভাব দুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষ-ভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

যোগোপনিষৎ।

এই যে কলেবর ইহা অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ ও কৃমিজাল-সংকুল, এই দেহ স্বভাবতঃ দুর্গন্ধযুক্ত ও মূত্র-পুরীষাদিতে পূর্ণ। এই নিন্দিত দেহে মূর্খগণই ভোগের লালসা করিয়া থাকে কিন্তু বিবেকী পণ্ডিতগণ ইহাতে বিরতই হইয়া থাকেন।

যে যুবতীর মুখপদ্ম দেখিয়া কত কামান্ধ ব্যক্তিগণ উন্মত্তের ন্যায় তাহার পশ্চাতে বিচরণ করিত, আজ সেই রমণীর মুখপদ্ম মাথার খুলিতে পরিণত হইয়া শ্মশানের একপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে। দন্তগুলি বাহির

হইয়া পড়িয়াছে। সেই মুখপদ্ম এখন কোথায়? সেই অধর মধুই বা এখন কোথায়? অধরের হাসি কোথায় লুকাইয়াছে! সেই চঞ্চল চক্ষুর কুটিল কটাক্ষ, অপূর্ব্ব ভ্রূ-বিলাস এখন কোথায় গেল? এই মহামোহের ফাঁদে পড়িয়া কত লোক মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়াছে। কত লোক পাগল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু করাল কালের কবলে সেই সৌন্দর্য্য আজ বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

এইজন্য ধীমান্ পুরুষগণ এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহে, বিদ্যুদ্বৎ ক্ষণস্থায়ী রূপলাবণ্যে বা কতিপয়-দিবস-স্থায়িনী যৌবন-শ্রীতে কখন মুগ্ধ বা আত্মহারা হন না।

"ভোগাস্তরঙ্গতুল্যতরলাঃ"—ভোগসকল তরঙ্গ তুল্য ক্ষণস্থায়ী; স্ত্রী বল, পুত্র বল, ধন বল, ঐশ্বর্য্য বল—কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এই জন্য বিচারশীল বিবেকী পুরুষগণ ভোগে মুগ্ধ না হইয়া পরমার্থ তত্ত্বানুসন্ধানে রত হন। কিন্তু বিচার বিমূঢ় ব্যক্তিগণ অনিত্য ভোগ্য বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া অবশভাবে কাল-সাগরে প্রবাহিত হইতেছে। স্ত্রী, পুত্র, কুটুম্ব, ঐশ্বর্য্য, অর্থাদিতে যিনি আসক্ত ও মুগ্ধ হন তিনি কখন কল্যাণ ও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে সমর্থ হন না। পঙ্কে পতিত হস্তীর ন্যায় তিনি দুঃখ ও দুর্দ্দশাই ভোগ করিতে থাকেন।

ইহলোকে মানবগণের শত শত স্ত্রী ও পুত্রাদি সমুৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই। পথে গমন করিবার সময় যেমন অন্যান্য পথিকগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইহলোকে জীব স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবাদির সহিত মিলিত হইয়া থাকে। কিয়দ্দিন পরে আবার তাহাদের সহিত বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। তাহাদিগকে প্রতিপালন করা, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু দেখিও যেন তাহাদের মোহে মুগ্ধ হইয়া অকার্য্য কুকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত

হইও না। তাহাদের মোহে মুগ্ধ হইয়া যেন জ্ঞানহারা হইও না; জীবনের অন্যান্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইও না। মনে রাখিও, স্ত্রী আত্মীয় স্বজন তোমার কুকার্য্যের ফল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার কর্ম্মফল তোমাকেই ভুগিতে হইবে। ধর্ম্মানুসারে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা লালনপালন করিবে বটে, কিন্তু তাহাতেই অন্ধ হইয়া যেন পরমার্থ হইতে বিমুখ হইও না। কি জন্য তুমি জগতে আসিয়াছ, এখানে আসিয়া কি কার্য্য করিলে, তাহা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে ভুলিও না।

দেহ ফেনের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, জীবন স্বল্পকালস্থায়ী ও প্রতিমুহূর্ত্তে লোকের আয়ু ক্ষয় হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া জীবের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কোন্ সময়ে মৃত্যু আসিবে তাহা কেহ জানে না এবং মনুষ্যজীবন অতি দুর্লভ, ইহা স্মরণ করিয়া তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া জীবনের প্রভূত কল্যাণ সাধনে রত হও। তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কেন আসিয়াছ ও কি করিতে আসিয়াছ তাহা একবার চিন্তা কর। সুদুর্লভ মনুষ্যজীবন প্রাপ্ত হইয়া যিনি তত্ত্ব-বিচারে মনোনিবেশ করেন, যিনি পরম পদার্থ ব্রহ্মে নিমগ্ন হন তাঁহারই জীবন সার্থক। যিনি এই মরীচিকা সদৃশ মায়াময় ভোগ্য পদার্থে ও প্রপঞ্চ দৃশ্য জালে মুগ্ধ না হইয়া পরমার্থে রত হন, তাঁহার জীবনই ধন্য, তাঁহারই জীবন সফল। যিনি এই চঞ্চল নশ্বর পদার্থে লিপ্ত না হইয়া অনন্ত শান্তিসাগর ব্রহ্মে নিমগ্ন হন তিনিই জীবনের সফলতা লাভ করেন; তিনি চিরতৃপ্তি ও শাশ্বতী শান্তিতে অবস্থিত হন।] *

ওঁ

* বন্ধনীস্থ অংশ সংযোজিত—সম্পাদক।

হিন্দু-বিধবা।

পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া সাধুচিত কার্য্য। অন্যের মলিন মুখে অশ্রু-ধারা বহিতে দেখিলে, অন্যের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে হৃদয়বান্ পুরুষের মনঃ-প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পরের দুঃখ মোচনে উদ্যত হওয়া হৃদয়-বানের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু দুঃখাপনোদনের প্রকৃত উপায় উদ্ভাবন করা নির্ম্মল মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। আজ কাল হিন্দু বিধবাদিগের মলিন বেশ, মলিন মুখ ও নানাপ্রকার সামাজিক কষ্ট দেখিয়া অনেক হৃদয়বানের প্রাণ মন ব্যাকুল হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদিগের দুঃখ মোচনের জন্য সম্বাদ পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ ও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদির দ্বারা চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সহৃদয়তাকে আমি সাধুবাদ দান করি। কিন্তু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ রূপ তাহাদের কষ্ট মোচনের যে এক মাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে পারি না। বিধবাদিগের যে সকল ক্লেশ উল্লেখ করিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহার সকলগুলি না হউক কোন কোনটী নিতান্ত দুঃসহ তাহাতে সন্দেহ নাই। বিধবাদিগের দুঃখ দেখিলে বস্তুতঃ মনে মনে অনেক সময়ে হিন্দু সমাজের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। বৃথাভিমানী পণ্ডিত সমাজের, জ্ঞান সাধন বর্জ্জিত গুরুকুলের, শাস্ত্রার্থ বোধ বিহীন পুরোহিত পুঞ্জের দুরবস্থা দেখিয়াও তৎপ্রতিবিধান জন্য যে সমাজ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, মদিরা পানাসক্ত, যবনীগামী অপ্রায়শ্চিত্তার্হ ক্রিয়াতে অনুরক্ত ব্যক্তিগণও যে সমাজে সাদরে গৃহীত হইতেছে সেই হিন্দু-সমাজের মধ্যে যে বিধবাগণ অতি ক্লেশে কাল কাটাইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি। যে সমাজ কদাচারকে শাসন করিতে অপ্রবৃত্ত, যে সমাজ পবিত্রতার মঙ্গলময়ী মর্য্যাদা লঙ্ঘনে অকুণ্ঠিত, বিধবাগণের

অশ্রুবারিতে সে সমাজ ভাসিতে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! আমি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী না হইয়াও বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখী। আমি হিন্দু বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়াও হিন্দু সমাজের অবৈধ ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমান হিন্দু সমাজকে নিন্দিত মনে করি। যে সকল ব্যক্তি হিন্দু-বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতি ও উদ্যোগি-গণের নিন্দা বা যুক্তি খণ্ডন করিয়াই হিন্দুকুলের মত সমর্থন করিলেন মনে করেন, আমি তাঁহাদিগকেও মনের সহিত প্রশংসা করিতে পারি না। যাঁহারা বিধবা কুলের দুঃখ মোচনার্থ উদ্যোগী, তাঁহারা আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আবার যাঁহারা বিধবার চিরব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া হিন্দু কুলের পবিত্রতা রক্ষা করিতে চান, তাঁহারাও আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ। যাঁহারা পুনর্ব্বিবাহ দ্বারা বিধবার দুঃখ দূর করিবেন মনে করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি হৃদয়বান্ বলিতে পারি কিন্তু বুদ্ধিমান্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না এবং তাঁহারা যে বিধবাদিগের প্রকৃত বন্ধু নহেন ইহাও বলিতে আমি পশ্চাৎপদ হই না। এ দিকে যাঁহারা বিধবা বিবাহের বিরোধে যুক্তি ও মত খণ্ডন করিয়া হিন্দু বিধবাদিগকে এই বর্ত্তমান অবস্থাতেই রাখিতে চাহেন আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান্ বলি বটে কিন্তু হৃদয়বান্ বলিতে পারি না এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহা অবশ্যই বলিব, যে তাঁহারা হিন্দুকুল-গৌরব রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন।

যে পতি সাধ্বী সতীর প্রাণ সেই পতির বিয়োগে পৃথিবীর কোন্ বস্তু সতীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে? সেই সতীর কি অন্য পতিতে উপগত হওয়া সম্ভব? সেই সতীকে অন্য পতি জুটাইয়া দিলে কি তাহার দগ্ধ প্রাণ শীতল হইবে? আমি বলি কখনই নহে। সতী স্বর্গগত পতির দিকে তাকাইয়া চিরদিন স্বর্গের দিকে যাইবার পথ পরিষ্কার করিবে। প্রাণপতির স্বর্গীয় মর্য্যাদা, স্বর্গীয় দৃশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের পথ দিয়া স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইবে। সতীর সমক্ষে এক

বই পতি নাই, সতীর সমক্ষে বৈধব্য কালে জগৎপতি ভিন্ন আর কেহই পতিপদে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। বুঝিলাম, সতীর দ্বিতীয় পতির আবশ্যকতা নাই।

দেখিয়াছি সাধারণ কুলললনাগণ অল্প বয়সে বিধবা হইলে সকল গৃহে না হউক, কোন কোন গৃহে যাতনা পাইয়া থাকেন এবং নির্জ্জনে রোদন করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি ক্লেশ পতির অভাব জনিত, কতকগুলি সমাজের দুর্ব্বৃত্ত ও মনুষ্যত্ববিহীন ব্যক্তিগণের নিমিত্ত। একাদশীতে উপবাস, একাহার, অঙ্গরাগ ও আভরণ পরিত্যাগ, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ সুখের অভাব ইত্যাদি ক্লেশ বিধবাগণের পতি বিয়োগ জনিত। শ্বশুরগৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে থাকিয়া দাসীর ন্যায় কার্য্য করা, বিবাহাদি মঙ্গলানুষ্ঠানে পূর্ণ সহযোগিতার অধিকার না পাওয়া ইত্যাদি ক্লেশ সামাজিক বর্গের অসদ্ব্যবহার জনিত।

আমাদের বিশ্বাস যে, গার্হস্থ্য আশ্রম ভোগ করিবার জন্য নহে, বিলাসে মজিবার জন্য নহে, ইন্দ্রিয় সুখাশয়ে ডুবিবার জন্য নহে, আমোদ করিয়া বেড়াইবার জন্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মার্থ কার্য্য করিবার জন্য, বিলাস ভোগ ত্যাগ শিক্ষা করিবার জন্য, বৈরাগ্যের বলবৎ ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্য, মুক্তি দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য, ইন্দ্রিয় সংগ্রামে বিজয়ী হইবার জন্যই গার্হস্থ্য আশ্রম। যদি কেহ গার্হস্থ্য আশ্রমের উদ্দেশ্যগুলি সহজে সাধন করিতে না পারে, তবে তাহাকে কৌশলে বা বলে বা সদুপদেশে তাহার কার্য্য সিদ্ধির সহায়তা করিতে হইবে। ঔষধ কটু হউক, তিক্ত হউক, অরুচিকর হউক, দয়ালু চিকিৎসক, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পিতা মাতা, হিতার্থী বন্ধু বান্ধব তাহা রোগীকে সেবন করাইবেন। রোগীর চীৎকার ইত্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না, ইহা সাধু হৃদয়ের মত। রোগী যাহা খাইলে সন্তুষ্ট হয় তাহাই খাইতে দেওয়া বুদ্ধিমান্ উচিত মনে করেন না, কিন্তু যাহাতে পীড়া আরোগ্য হয় সেই দিকেই বুদ্ধিমানের

দৃষ্টি। রোগী আরোগ্য হইলেই কটু-কষায় ঔষধদাতাগণেরই চরণ রেণু মস্তকে ধারণ করিবে, তখন সে বুঝিবে যে রোগশয্যায় যাহা যাহা খাইতে চাহিয়াছিলাম তাহা হয় ত তখন আমার মিষ্ট লাগিত বটে কিন্তু মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। বিধবাগণও দুঃখ-রোগে আক্রান্ত। এই রোগ বিমোচনের ব্যবস্থা কি? তাহাকে পুনর্ভোগের পথ দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য অথবা ভোগ নিবৃত্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া বিহিত? যদি ভোগার্থই তাহাকে একটী পতি দেওয়া যায়, তবে সেই পতিই যে চিরজীব হইবে তাহা কে বলিল? ভোগীর ভোগ-সুখ-বাসনা বাঁচিয়া থাকিতে নিবৃত্ত হয় না, সুতরাং হয় ত তাহার গণ্ডায় গণ্ডায় পতি প্রয়োজন হইবে। একে ভারতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক। প্রত্যেক কুমারীর বিবাহ হওয়াই দায়, তাহাতে এক একটি নারী গণ্ডায় গণ্ডায় পতি গ্রহণ করিলে এত পতিই বা জুটিবে কোথা হইতে? তবে কি কুমারীগণই চিরকৌমার্য্যে ব্রহ্মচর্য্যে কালাতিপাত করিবে? আমি মনে করি যাহাতে জীবের ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হয়, তাহারই দিকে মনোযোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। একাদশী ব্রতে শারীর রসোচ্ছ্বাসের হ্রাস, দুর্ব্বৃত্ত মনোবৃত্তির দুর্ব্বলতা, পবিত্রতার বৃদ্ধি, স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার এবং স্বাত্মানুরাগের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য; ইহাতে বিধবার ক্লেশ হয় স্বীকার করি না। বিধবা সামর্থ্যানুসারে নিরম্বু উপবাস বা গঙ্গাজল সেবন কিম্বা দুগ্ধ জল সেবন অথবা ফলমূলাদি ভোজন করিয়া আপনার ব্রত সমাপন করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু বিধবাগণ সকলেই পূর্ণ মাত্রায় পুণ্যপ্রার্থী বলিয়া নিরম্বু উপবাসই করিয়া থাকেন, সে জন্য অন্যে দায়ী নহে। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে একবার মাত্র ভোজন করিলে শরীর যেরূপ তৃপ্ত ও মন যেরূপ স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে, তাহা গণ্ডপিণ্ড ভোজিগণ দুইবার তিনবার খাইয়াও কখন অনুভব করিতে পারেন না; সুতরাং একাহার ক্লেশদায়ক

নহে, বরং স্বাস্থ্যকর ও মঙ্গলদায়ক। বেশ বিন্যাস ত্যাগ সম্বন্ধে, সমাজ! আমি তোমাকে বলিব না। বিধবাকে ডাকিয়া বলি, দেবি! পতি বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াছ, তুমি মনুষ্য সমাজের অতীত ব্রহ্মচারিণীর স্বর্গীয় বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়াছ, আলুলায়িত রুক্ষ কেশে সন্ন্যাসিনীর বেশে গৈরিক বসনে তুমি মনুষ্যগণের আরাধ্যার আসন অলঙ্কৃত করিয়াছ। দেবি! তোমার যে চরণে শত শত বীরের, শত শত ধনীর, শত শত বিদ্যাবানের মস্তক প্রণত হইতেছে, সে পবিত্র চরণে কি আর রৌপ্যের অলঙ্কার শোভা পায়? দেবি! তোমার যে হস্তে দেবদুর্লভ ভগবানের নাম জপ করিবার জন্য রুদ্রাক্ষ বা তুলসীর মালা ধারণ করিয়াছ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ীর বিলাস-ক্ষেত্রে স্বর্ণাভরণ পরিয়া কি সেই হস্ত কলঙ্কিত করিতে চাও? তোমার যে কণ্ঠে ত্রিলোকের আধার ব্রহ্মাণ্ডপতির পবিত্র গুণগীতি উচ্চারিত হইতেছে, যে নামে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট সাম্রাজ্য ত্যাগ করে, সাধক ত্রিলোকের সম্পদ তুচ্ছ বোধ করেন, সেই অমিয় ভরা নাম করিতে করিতে তোমার কণ্ঠ কি সোণার কণ্ঠ মালায়, মতির মালায় আপনাকে লোক সমাজে ঘৃণিত করিতে চায়? বিধবা! তুমি আপনার মর্য্যাদা বুঝিয়া দেখিলে স্বর্ণাভরণ, বেশবিন্যাস তোমার শোভা নহে।

ভূষণের অভাব কি আছে মা, তুমি জগচ্চন্দ্র হার পরেছ।
কর্ণের ভূষণ তব সে নাম শ্রবণ,
কণ্ঠের ভূষণ তব সে নাম কীর্ত্তন,
হৃদয় ভূষণ তব সে রূপ চিন্তন,
করের ভূষণ তব সে পদ সেবন। ভূষণের অভাব কি আছে মা!
তুমি চিন্তামণি হার পরেছ!

দেবি! বিবাহাদি মঙ্গলানুষ্ঠানে তোমাকে কেহ কিছু স্পর্শ করিতে দেয় না। মূর্খ গৃহস্থেরা ভাবে যে এই মাঙ্গলিক কার্য্যে বিধবার প্রবেশ

অমাঙ্গলিক। ভ্রমের বশীভূত হইয়া মূঢ়গণ তোমাকে অনেক সময়ে অবমাননা ও অশ্রদ্ধা করে। তাহারা ভ্রান্ত! কিন্তু দেবি! আমিও বলি তুমি ঐ সাংসারিক কার্য্যে হাত দিওনা। শাস্ত্রও বলিতেছেন তুমি স্পর্শও করিও না, কেননা যে পবিত্র হস্ত দেবসেবার জন্য নিযুক্ত সে হস্ত কি সংসারের সেবা করিবে? সংসারের মলিন বিষয় পঙ্কে কি সে হস্ত কলঙ্কিত করিবে? গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের যে কোন কার্য্যে দেখিবে যে তোমার প্রবেশ নিষেধ, সেখানে দুঃখিত হইও না, সেখানে ভাবিয়া দেখিও তোমারই পদগৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, তোমারই পবিত্রতার প্রতাপে ভীত হইয়া সংসার সংকুচিত হইতেছে। তোমার তপোগ্নিময় হস্তের উত্তাপ কি শুষ্ক তৃণ রূপ সংসার সহ্য করিতে পারে? তোমাকে রন্ধনশালায় অধিষ্ঠাত্রী করিয়াছে বলিয়া, তোমাকে শিশুগণকে ক্রোড়ে লইতে দেয় বলিয়া তুমি কি তোমাকে দাসী মনে কর? তুমি দাসী নও, তুমি দেবী, তাই রন্ধন শালায় অধিষ্ঠান তোমার, তাই শিশুগণের প্রতিপালিকা তুমি। তোমার ইন্দ্রিয়সংযম, তোমার তপঃব্রত, তোমার ইষ্টনিষ্ঠা, তোমার দেবসেবা ও পবিত্র চিন্তা তোমার প্রকৃতিকে পরম পবিত্র ও তেজস্বিনী করিয়াছে। গৃহস্থগণ যাহা ভোজন করে, সেই অন্নে পাচক বা পাচিকার প্রকৃতির শক্তি প্রবেশ করিয়া থাকে। এই জন্য একজন ইন্দ্রিয় সেবাপরায়ণ পাচকের এবং ভোগবিলাসিনী পাচিকার প্রস্তুত অন্ন অপেক্ষা তোমার অন্ন পবিত্র, পুষ্টিপ্রদ ও জীবন সঞ্চারী। তাই তুমি রন্ধন শালায়—তুমি রন্ধন শালায় অন্নপূর্ণা। শিশুগণ নীচ প্রকৃতি দাসীর ক্রোড়ে থাকিলে নীচভাব ও কদর্য্য শক্তি দ্বারা অভিভূত হয়, তাই শিশুর পিতা তোমার ক্রোড়ে রাখিয়া শিশু পবিত্র শক্তিবিশিষ্ট হইবে, দীর্ঘজীবী হইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তোমার যত্নে, তোমার স্নেহে শিশু সুস্থকায় ও মহানুভব হইবে। তুমি শিশুর ষষ্ঠী ঠাকুরাণী।

হিন্দুসমাজ! তোমার নিজ পাপে তুমি নিজে ডুবিতেছ। ব্রহ্মচারিণীকে—সন্ন্যাসিনীকে তুমি আপনার দাসী মনে কর! আশ্চর্য্য তোমার স্পর্দ্ধা! দেবসেবার পরিবর্ত্তে তোমার বিধবা কন্যাকে, তোমার বিধবা ভগিনীকে, তোমার রাত্রিতে শুইবার শয্যা প্রস্তুত করিতে দাও! বিধবার সেবা করা, তপস্বিনীর সেবা করা, তুমি আপনার গুরুতর কার্য্য মনে না করিয়া তুমি আপনার জীবনের সার কার্য্য—সর্ব্বস্ব সম্বল মনে না করিয়া অপব্যয় মনে করিয়া থাক! সতী ব্রহ্মচারিণী গৃহে থাকা আর জীবন্ত জগদ্ধাত্রী গৃহে থাকা একই কথা। বিধবার আশীর্ব্বাদে, বিধবার ব্রত সমাপনে তোমার কুল ধন্য হইবে, কিন্তু স্মরণ রাখিও তোমার দোষে তপস্বিনীর একবিন্দু অশ্রুপাত হইলে তোমার কুল কালার্ণবে ভাসিয়া যাইবে।

উপসংহার কালে বিধবা বিবাহের প্রধান উদ্যোগিগণকে দুই একটী কথা বলিব। ইন্দ্রিয় সেবার বেগ হিন্দুসমাজের দোষে হউক বা গুণে হউক বিধবাগণ ক্রমে ক্রমে সম্বরণ করিতে শিখিতেছে। তোমরা আর তাহার উত্তেজনা করিও না, আর নরকাগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিও না। একটী পুরুষ ২।৩ বার বিবাহ করে বলিয়া স্ত্রীগণেরও সেইরূপ অধিকার দিতে চাও, ইহা বহু বিবাহের প্রশ্নে সমাধান হইবার যোগ্য, এ জন্য এখানে তাহার সমালোচনা করিতে চাহি না। কিন্তু বিবাহ না করিয়াও যে ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে কত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, কত সন্ন্যাসী বিচরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা কি একবারও নেত্রপাত করিয়া দেখ না? পুরুষগণ ভোগী আর স্ত্রীগণকে তাহারা ভোগ বিমুখ রাখিতে চায় একথা তোমাদের বলিতে লজ্জা বোধ হয় না? হিন্দু পুরুষদিগের ন্যায় ভোগ ত্যাগী, বিলাস বিমুখ আর কোন্ জাতির পুরুষ শ্রেণীতে দেখিতে পাও? নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ বা সন্ন্যাসিগণ সকলেই স্বভাবজাত বৈরাগ্যের জন্য ভোগ ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তন্মধ্যে অনেকেই শিক্ষা ও সংযমের

গুণে প্রব্রজ্যার পন্থা অবলম্বন করিয়া সুখী হইয়াছেন। শিক্ষা ও সংযমের গুণেই হিন্দু বিধবাগণ চিরব্রহ্মচারিণী থাকিতে পারিবেন। বিনয় করিয়া বলি, সকলে একত্র হইয়া সুশিক্ষা ও সাধু ভাব বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর। বৃথা বিবাহ বিবাহ করিয়া বিধবাগণকে নাচাইয়া তুলিও না ও সমাজকে কাঁপাইও না। বিবাহই সমস্ত দুঃখ নাশের মূল কে বলিল? বিবাহিতা সকল স্ত্রীই কি সুখী? সার্ব্বাঙ্গিক সুখ কি সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? বিবাহের মধ্যেও লক্ষ লক্ষ দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরমাত্মায় আত্ম সমাধান ভিন্ন সমস্ত দুঃখ মোচনের আর কোন সদুপায়ই নাই। ব্রহ্মচর্য্যের যতই বল বৃদ্ধি হয় ভারতে তাহারই উপায় বিধান কর। অলমতি বিস্তারেণ।

শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব।

জড়তত্ত্ববাদের বহুল প্রচারে, ক্রমশঃ আমাদের আত্মবিচারণা-শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। একে আমরা অল্পবুদ্ধি, তাহাতে ধর্ম্মের দিকে—ঈশ্বরের দিকে মতি গতি অতি অল্প, আবার বিজাতীয় কুজ্ঞানজড়িত শিক্ষার অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালে বিমোহিত, সুতরাং শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানাদিকে "মরা গরুর ঘাস কাটা" ভিন্ন আর কি বলিতে পারি! ধীমান্‌গণ, তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের উপদেশ বা আদেশের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিলেও, তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু দেখা যায় যে, শিক্ষাদোষে অনেকের স্বল লৌকিক যুক্তিমাত্রকে অবলম্বন পূর্ব্বক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হয় ও আতিবাহিক দেহতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া সন্মার্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাঁহাদেরই বিবেকবুদ্ধি-বিচারের সহায়তার জন্য সংক্ষেপে এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল।

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস এবং পরলোকগত পিতৃগণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে আবাহন ও তাঁহাদিগের তৃপ্তি কামনায় দধি, দুগ্ধ মধু ইত্যাদির বিহিত বিধান রূপ অর্পণের নাম শ্রাদ্ধ।

সংস্কৃতং ব্যঞ্জনাঢ্যান্নং পয়োদধি ঘৃতং মধু।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ তেন শ্রাদ্ধং নিগদ্যতে॥

রঘুনন্দন ধৃতবচনম্।

জীব মৃত্যু হইলে নিজ নিজ কর্ম্ম ফলানুরূপ অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। শুভ কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব, জঘন্য বৃত্তি-পরতন্ত্রতা নিবন্ধন পিশাচত্ব, ভোগকামনা প্রযুক্ত মর্ত্ত্য দেহ, এইরূপ নানা ক্রিয়ানুসারে নানাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। সংকল্পময়ী বাসনাই জীবকে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরের সেবায় নিযুক্ত করে। মরণ কালে মনোময় শরীরে যে

প্রবৃত্তি ও যে আবেশ তীব্র ভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে, লিঙ্গ-শরীরী (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং বুদ্ধি ও মনস্তত্ত্বাত্মক) জীব তদনুসারে নিজ প্রকৃতিগত লীলার উপযোগী আধারভূমি (দেব, দানব, মানব, পশু, কীটাদির দেহ) আশ্রয় করে। শুদ্ধা ও মলিনা এই উভয় প্রকার বাসনাই যত দিন জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, তত দিন শ্রাদ্ধাদি প্রয়োজনীয়।

শুদ্ধাত্মা লিঙ্গ-শরীরিগণ অগ্নি বায়ু, আকাশ ও সূর্য্যলোকে অবস্থান করেন। এই পিতৃগণ মহাযোগী, যোগশরীরী ও যোগধারা। ইঁহারা ইচ্ছাময় হইয়া জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যথা—

অগ্নির্ব্বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ স্থানঞ্চ ভবতামিতি।

* * * * *

যোগিনো যোগদেহাশ্চ যোগধারাশ্চ সুব্রতাঃ।
কামতো বিচরিষ্যধ্বং ফলদাঃ সর্ব্বজন্তুষু॥

হেমাদ্রি ধৃত বরাহপুরাণে

মনোময় শরীর যে মনের স্বভাবানুরূপ বিচরণ করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? মন গৃহ, দুর্গ, জলধিগর্ভ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল কোথাও যাইতে বাধা পায়না, স্থূল শরীরই কেবল সামর্থ্যাভাবে মনের অনুগামী হইতে পারে না। মনোময় বা লিঙ্গ-শরীরী পুরুষ আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক মৃত্যু হইলে বা যোগবলে স্থূল শরীর হইতে পৃথক্ হইতে পারিলেই যথেচ্ছ গতি করিতে পারেন, এবং মর্ত্ত্য জীব অপেক্ষা বহুপরিমাণে অধিক সামর্থ্য লাভ করিয়া জীবগণের বাঞ্ছিত ফল দান করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহাদের নিকট স্থানের দূরত্ব ও সময়ের পরিমাণ অতিলঘু হইতেও লঘুতর রূপে প্রতীত হয়। কলিকাতা হইতে দিল্লী তাঁহাদের মুহূর্ত্তের পথ। আমাদের দীর্ঘকাল তাঁহাদের মুহূর্ত্ত মাত্র বলিলেও হয়। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মধুরোপচার-

সহ উপঢৌকনী দ্বারা বিজ্ঞানময় বৈদিক মন্ত্রে তাঁহারা আহূত ও তৃপ্ত হইলে আমরাও কল্যাণ পদ লাভ করিতে পারি। পার্থিব দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সদাত্মগণের পার্থিব স্নেহাদি বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু স্নেহাদির স্বচ্ছ পবিত্র স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় না। তাই তাঁহারা অমাবস্যাষ্টকাদি পর্ব্বকালে ও মৃতাহে পূর্ব্ব পাথিব দেহের সম্বন্ধে পুত্র পৌত্রাদির নিকট সৎকৃত ও তৃপ্ত হইবার এবং তাঁহাদিগকে যোগৈশ্বর্য্যাদি অনুগ্রহ বিতরণ করিবার জন্য বায়ব দেহধারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া থাকেন। যথা—

পিতরঃ পর্ব্বকালেষু তিথিকালেষু দেবতাঃ।

* * * * *

অমাবস্যা দিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ।
বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণা নৃণাম্॥

বায়ুপুরাণে।

এই অভ্যাগত পিতৃগণের শ্রাদ্ধ বা সৎকারে তাঁহাদের তৃপ্তি ও আমাদের আত্মাতে দিব্য তেজের সঞ্চার হইয়া থাকে। পিতৃগণ দেবতা, গ্রহনক্ষত্রাদির গতি বিধি তাঁহাদের অগোচর নহে। তাঁহারা যথার্থ পর্ব্ব-কালে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে) শ্রাদ্ধ প্রত্যা-শায় উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তোমার অদৃষ্টবৈগুণ্যে যদি পঞ্জিকার গণনার দোষে প্রতিপদ্ বা দ্বিতীয়াতে বা অন্য কোন অযথা তিথিতে অমাবস্যা বা কোন পর্ব্বদিন জানিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন কর, তবে সে দিন গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি প্রভাবে পিতৃগণ তোমার সমীপবর্ত্তী হইতে পারিবেন না, ও শ্রাদ্ধ জন্য পিতৃগণ প্রকৃতপক্ষে তৃপ্তি লাভ করিবেন না; অথচ তুমি জানিলে, শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিলাম। বস্তুতঃ তোমার কর্ম্ম পণ্ড হইল। অপর্ব্বদিনে বা অলগ্ন প্রভাবে প্রেত্য

শক্তি বিশেষ বিশেষ পার্থিব শক্তি জাল দ্বারা অভিহত হইয়া যায়, এইজন্য যথাযথ তিথিতে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

সাধু মানব! তুমি বিশুদ্ধ সঙ্কল্প শক্তি সূত্র (Pure will cord) যোগে যদি তাঁহাদিগকে আকর্ষণ কর, তবে তোমার বিশুদ্ধ মনোময়ী শক্তি সূত্রকে আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহারা তৈজস মার্গ (Spiritual fluid) দিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হয়েন। "স যদি পিতৃলোক-কামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ)।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভক্তি অথবা জ্ঞানাদির প্রভাবে সচেতন হইয়া দেহ ত্যাগ করিতে না পারে, মৃত্যুর ঘোর আক্রমণে তাহার (সূক্ষ্ম দেহীর) কিছুক্ষণ বা কিছুকাল ব্যাপী প্রেতত্ব বা অচেতন অবস্থা রূপ (Unconscious life) মূর্চ্ছা প্রাপ্তি হয়। চৈতন্যকারক মন্ত্রযুক্ত শ্রাদ্ধের কতকগুলি ক্রিয়া তড়িন্ময়—উষ্মাময়—সূক্ষ্মদেহের এই মহামূর্চ্ছা ভঙ্গের প্রধান কারণ। কুশ ও অপরাপর শ্রাদ্ধীয় কতকগুলি দ্রব্যও ইহার সম্পূর্ণ অনুকূল। Howitts নামক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবেত্তাও বলেন যে কতক গুলি প্রস্তর ও উদ্ভিজ্জে আকর্ষণ শক্তি এত অধিক পরিমাণে আছে, যে তাহারা উষ্মাময় দেহিগণকে শীঘ্র আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্য পিতৃগণকে আবাহন কালে দর্ভ তিলোদকাদির সংস্থান করা হয়। যথা—

অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥

বায়ুপুরাণে।

শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত দ্রব্য সমূহ সুকৃতবান্ ব্রাহ্মণগণকে দান করিবার বিধি আছে, এবং তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেও হয়। পিতৃগণ ব্রাহ্মণগণকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব নির্ব্বাচিত আধার জানিয়া বায়ুবৎ তদনুগামী হয়েন; এবং সূক্ষ্মদেহে—ত্রসরেণুময় অলক্ষিত দেহে—দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রবেশের

ন্যায় ব্রাহ্মণগণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধার্পিত দ্রব্য লাভে তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন; ইহাও আচার্য্যদিগের মত। যথা—

নিমন্ত্রিতান্ হি পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজান্।
বায়ুবচ্চানুগচ্ছন্তি তথাসীনানুপাসতে॥

মনু।

এইজন্য মনুসংহিতায় শ্রাদ্ধাদিকালে অযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং মন্ত্রজ্ঞ পবিত্র ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইতে বিধি দিয়াছেন। যথা—

শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলং॥

দাতৃগণ হব্য [দেবতার্থ অন্ন] কব্য [পিত্রর্থ অন্ন] বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দিবেন। বেদজ্ঞ সুশীল [মহাবংশোদ্ভব] ব্রাহ্মণকে যত্ন পূর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহাতে মহাফল লাভ হয়।

একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি॥

দৈবে ও পিতৃকার্য্যে বেদবিৎ একব্যক্তিকেও যদি ভোজন করান যায়, তাহাতে যে মহাফল লাভ হয়, বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও সেরূপ ফল লাভ হয় না।

সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ॥

শ্রাদ্ধে বেদানভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল হইয়া থাকে, বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সেই সমুদয় ফল লাভ হইয়া থাকে।

জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
নহি হস্তাবসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ॥

দাতা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই হব্যকব্য দান করিবেন, মূর্খকে দিবেন না। মূর্খকে দিলে ফল লাভ হয় না। শোণিতলিপ্ত হস্ত শোণিত দ্বারা শুদ্ধ হয় না।

যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষ্বমন্ত্রবিৎ।
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্ত শূলর্ষ্ট্যয়োগুড়ান্॥

বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি দৈব পৈত্র কার্য্যে যত গ্রাস ভোজন করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা মৃত্যুর পর ততগুলি প্রজ্জ্বলিত শূল ঋষ্টি নামক অস্ত্র ও লৌহ-পিণ্ড গ্রাস করিয়া থাকেন।

যথারীণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলং।
তথানৃচে হবির্দ্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলং॥

উষর প্রদেশে বীজবপন করিয়া কৃষীবল যেরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ অবেদজ্ঞ ব্যক্তিকে ভোজন করাইলে দাতা ফলভাগী হয়েন না।

ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি ধর্ম্মবিৎ।
পিত্র্যে কর্ম্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ॥

ধার্ম্মিক ব্যক্তি দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবেন না। যাঁহারা সৎ-পাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগকেই ভোজন করাইবেন। কিন্তু পিতৃ-কার্য্য উপস্থিত হইলে বিদ্যা আভিজাত্যাদি যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবেন।

মহর্ষি হারীতও বলিয়াছেন—

স্মৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রুতিহীনে তথৈবচ।
দানং ভোজনমন্যচ্চ দত্তং কুলবিনাশনম্॥

ধর্ম্মশাস্ত্র ও শ্রুতিজ্ঞান বিহীন ব্রাহ্মণকে দান বা ভোজন করাইলে কুল বিনষ্ট হয়।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা শুদ্ধাচার, সংযম, নিষ্ঠা, নিবৃত্তি আদির দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ শক্তিশালী করেন এবং শ্রাদ্ধকালে পুরোহিত যাজ্ঞিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ মানসিক সত্ত্বময়ী শক্তি ও সিদ্ধ বেদমন্ত্রানুগত প্রভাবের বলে মহামূর্চ্ছা প্রাপ্ত সূক্ষ্ম শরীরগত প্রেতাত্মাকে জাগরিত করিয়া তোলেন, শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার ইহা একটী বিশেষ ফল। মহামূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ বিভিন্ন লোকান্তর্গত অবস্থা বা দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মরিবামাত্রই যে জীব অন্য মর্ত্ত্য দেহ ধারণ করে, তাহারি নিশ্চয় নাই। কর্ম্মানুসারে বহুদিন হয়ত স্বর্গবাস করিয়া তৎপরে ('ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে বিশন্তি') মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করে। মৃতাত্মা স্বর্গেই থাকুন বা মর্ত্ত্য দেহ ধারণ করুন, শ্রাদ্ধকর্ত্তার তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যে পিণ্ডোদকাদি দান করিবেন, তাহা সেই আত্মার তৃপ্তি কামনায় বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিবেন। ব্রিটিস রাজ্যের মধ্যে তোমার যে কোন দেশ বা প্রদেশস্থিত যে কোন আত্মীয়কে "মণি অর্ডার" করিয়া তুমি যে কোন ডাকঘর হইতেই টাকা পাঠাইয়া দাও না কেন, রাজকীয় ডাক বিভাগ তোমার সেই আত্মীয়কে সেই মূল্যের তত্তদ্দেশ প্রচলিত মুদ্রা যেমন পৌছাইয়া দেন, সেইরূপ পরলোকবাসী আত্মার উদ্দেশে যে দ্রব্য নিবেদিত হইবে, তাহা মৃতাত্মা যে ভাবে যেখানেই থাকুন না কেন, বিষ্ণুমহিমায় তদবস্থার অনুকূল ভাবে—গুণে বা শক্তিতত্ত্বে পরিণত হইয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিবে। মনে কর তোমার পিতামহ স্বর্গবাসী দেবতা হইয়াছেন, দেবতাগণ সুধাপায়ী; তুমি এখানে তাঁহার তৃপ্ত্যর্থে জল নিবেদন করিলে, তোমার এই শ্রদ্ধাদত্ত জলের দিব্য শক্তি দৈবশক্তির আশ্চর্য্য মহিমায় অমৃতত্বে পরিণত হইয়া তোমার দেবরূপ পিতামহের তৃপ্তি সাধন করিবে। আবার মনে কর,

যদি তাঁহার সদ্গতি না হইয়া থাকে, তবে বিশুদ্ধ সত্ত্ব শক্তি প্রভাবযুক্ত পিণ্ডাদি দান দ্বারা তাঁহার উদ্ধার কামনা করিতে হয়। যথা—

অস্মৎকুলে মৃতা যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥
অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেত পিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং।
অনেক যাতনা সংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥
পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীট সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং॥
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥
পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ।
গুরু শ্বশুর বন্ধূনাং যেচান্যে বান্ধবা মৃতাঃ॥
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্র-দার-বিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপ গতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তঃ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥

বায়ুপুরাণে।

উপর্য্যুক্ত পিণ্ড দানের শ্লোকগুলি পাঠে শাস্ত্রীয় অভিপ্রায় ইহাই উপলব্ধি হয় যে, মৃতাত্মা যে কোন হীনাবস্থাতেই পতিত হউক না কেন,

পিণ্ডদাতা তাঁহার কল্যাণ কামনায় ক্রিয়া করিবেন। অতএব পুনর্জ্জন্ম অর্থাৎ মৃতাত্মা কীট পতঙ্গ মনুষ্যাদি দেহ ধারণ করিলেও পিণ্ডোদকাদি দান দ্বারা তাঁহার অবস্থানুরূপ উপকারই হইয়া থাকে। কেবল মুক্ত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডাদির প্রয়োজন করে না। এই জন্য যতি, যোগী, পরমহংসগণ এ বিধানের অধীন নহেন। কিন্তু গৃহস্থগণ মুক্তিভাগী হইলেও তাঁহার সন্তানগণ শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদানাদি করিবেন। মনে কর, শাস্ত্রে লিখিত আছে "কাশ্যাং মরণান্মুক্তিঃ" কাশীতে মৃত্যু হইলেই জীবের মুক্তি হয়। এতদনুসারে কাশীমৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু তাঁহার পুত্র কিরূপে জানিবেন যে তিনি কাশীবাস কালে আদৌ পাপ করেন নাই। কেননা কাশীকৃত পাপ অমার্জ্জনীয়। তজ্জন্য মৃতাত্মাকে রুদ্র-পিশাচ মণ্ডলী কর্ত্তৃক ঘোরতর রূপে নির্যাতিত হইতে হয়। এই সকল আশঙ্কা পরিহারার্থ কাশীমৃত মুক্তিভাগী ব্যক্তিরও শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদির প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত জীবাত্মা অনন্ত পরমাত্মার স্বরূপত্বে বিলীন না হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত মৃতাত্মা যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁহার অমৃতত্ব কামনা করিয়া শ্রদ্ধাসহ পিণ্ডদানাদি কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাপূর্ণ সংকল্প শক্তির (Will power) আশ্চর্য্য মহিমা।

যদি মৃতাত্মা ঔর্দ্ধদেহিক উত্তমাগতি লাভ করায় তাঁহার পিণ্ডোদকাদির প্রয়োজন নাও থাকে, তথাচ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয় না, কেননা তাহাতে আদি পিতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাদিও তৃপ্ত হইয়া থাকেন। যথা—

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তেষাং ত্রয়ঃ জিতাশ্চ ভবিষ্যন্তি তথাগ্নয়ঃ॥
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদা স্তথৈবচ যুগত্রয়ং।
পূজিতাশ্চ ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

মানব যখন পার্থিব দেহ ত্যাগ করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার পার্থিব প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। দূষিত পার্থিব ভাব বর্জ্জিত জীব যদি শুদ্ধসদাচারপূত উপচারে আহূত, পূজিত বা সংকৃত ও শুদ্ধ সঙ্কল্পোদগীরিত শব্দরূপ মহামন্ত্রে তর্পিত হয়, তবে সেই আত্মা—সেই সূক্ষ্মভাব সূক্ষ্ম অবস্থা সূক্ষ্ম গতি ও অপরিমেয় শক্তি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরাবৃত আত্মা যে উন্নত ও পূত হইয়া স্বর্গ হইতে উচ্চ স্বর্গে, সুখ হইতে মহা সুখে, আনন্দ হইতে মহানন্দধামে গমন করিবে, তাহার আর সন্দেহ কি। ধীমান্‌গণ! শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া আপনারও পরম শ্রেয়োলাভের পথ পরিষ্কার করুন।

কৃতজ্ঞ মানব! হৃদয়বান্ ভক্ত সাধো! তুমি কোন্ প্রাণে তোমার পরম কুশলাকাঙ্ক্ষী পিতৃলোকের সৎকার না করিয়া স্বয়ং চর্ব্ব্য চোষ্য ভোজন করিবে? স্থূল জগৎ হইতে একবার অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখ দেখি, তুমি কেমন করিয়া তাঁহাদের পূজা পরিহার করিতে পার?

বিধি পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকারীর পুণ্য ও পিতৃগণের তৃপ্তি লাভ হয়। অমিততেজা পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া শুভ দৃষ্টি করিলে শ্রাদ্ধকারীর কল্যাণ হয়, পিতৃগণ আকাঙ্ক্ষিত সময়ে শ্রাদ্ধ না পাইলে শ্রাদ্ধাধিকারীর প্রতি অশুভ বা কোপদৃষ্টি করিলে তাহার নানা অনর্থপাত হইয়া থাকে। যে গৃহ শ্রাদ্ধবর্জ্জিত, স্বর্গীয় শক্তিতত্ত্বের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না রাখা বশতঃ সে গৃহে বীর পুরুষ জন্মগ্রহণ করে না, কেহ অরোগী থাকিতে পারে না, কেহই দীর্ঘায়ু হয় না ও শ্রেয়ঃসাধন হওয়াও দুর্ঘট। যথা—

ন তত্র বীরা জায়ন্তে নারোগা ন শতায়ুষঃ।
নচ শ্রেয়োঽধিগচ্ছন্তি যত্র শ্রাদ্ধবিবর্জ্জিতম্॥

হারীত স্মৃতিঃ।

অতএব নৈব শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥

—০—

প্রারব্ধ ও পৌরুষ।

(FREEDOM OF WILL AND PREDESTINATION)

প্রশ্ন।

দেবীপক্ষের পৌর্ণমাসীতে, যখন পূর্ণচন্দ্রাননা হাস্যমুখী মা-যোগেশ্বরী-অধিষ্ঠিত কাশী-যোগাশ্রমে অমল ধবল সুশীতল চন্দ্রিকা-মালা, দিনকর করসন্তপ্ত জিজ্ঞাসু বৃন্দের দৈহিক সন্তাপ হরণ করিতেছিল, তখনই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-তরঙ্গের কেন্দ্রভূমি কলিকাতা (বাগবাজার) হইতে সমাগত সম্ভ্রান্ত মহোদয় গণের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন—"স্বামীজী! এই যে আমি আপনার প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্যালয় হইতে আপনার দর্শন কামনায় যোগাশ্রমে আগমন করিলাম, ইহা আমার কোনও "স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত" না আমার "ভাগ্যে" সাধু সন্দর্শন ছিল এই জন্য? জীবের কার্য্যাবলী কি স্বাধীন ইচ্ছা-পরিচালিত, না নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট?"

উত্তর।

স্বাধীনতা।

"সদাশয়, আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় ইংরাজি "Freedom of will"ও "Predestination"কে লক্ষ্য করিয়া। জীবের কার্য্যাবলী 'স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত' এই প্রশ্নের মধ্যে জীবের স্বাধীনতা আদৌ আছে কি না এই প্রশ্ন অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং জীব স্বাধীন কি পরাধীন ইহা আদৌ বিচার্য্য। 'স্বাধানতা' কথাটা আমরা পাশ্চাত্য Freedom অর্থে ব্যবহার করি। শাস্ত্র কিন্তু অন্যভাবে উহা গ্রহণ করিয়াছেন। "স্ব" বলিতে শাস্ত্র চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত আত্মা-কেই বুঝেন। সুতরাং শাস্ত্রীয় অর্থে স্বাধীনতা শব্দে ক্ষিত্যপ্‌তেজো-মরুদ্ব্যোম হইতে মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি পর্য্যন্ত মায়াসম্পর্ক শূন্য স্বস্বরূপাবস্থা

বুঝায়। ব্রহ্ম সারূপ্যই প্রকৃত স্বাধীনতা; নতুবা কীটাণু হইতে ব্রহ্মেন্দ্রাদি মরুদ্গণ পর্য্যন্ত সকলেই অধীন। সুতরাং শাস্ত্রের হিসাবে মায়াময় এই অখিল সংসারে কেহই স্বাধীন নহেন। দেখুন যে মুহূর্ত্তে জননী-জঠরে জীবের জন্ম হয় সেই মুহূর্ত্তে—

(১) নিজ নিজ পিতা ও মাতার ও পূর্ব্বপুরুষানুগত প্রকৃতি, শক্তি এবং ভাব যেরূপ থাকে জ্রূণবীজে সেই প্রকৃতি, শক্তি ও ভাবের প্রভাব সঞ্চারিত হয়; তাহা আমৃত্যু সেই মানবে কার্য্য করিতে থাকে; স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই্ত প্রথম অধীনতা; 'এই পুরুষানুগত প্রভাব' (Heredity) মানবের কত কার্য্যের কারণ হয়, কে বলিতে পারে?

(২) আবার সেই মুহূর্ত্তে গ্রহনক্ষত্রাদির যেরূপ সঞ্চার থাকে তাহার প্রভাব; এই জগতের তাৎকালিক নৈসর্গিক অবস্থা; এই জগতে পরমাণুপুঞ্জের সহিত অন্যান্য অসংখ্য জগৎরূপ গ্রহনক্ষত্রাদির উপাদানভূত পরমাণুপুঞ্জের আকর্ষণ বিকর্ষণ জন্য যে সুসূক্ষ্ম প্রভাবতরঙ্গ সেই জীব-দেহের বীজ-স্বরূপ শুক্র শোণিত বিন্দুর পরমাণু রাশিতে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহার সহিত জননী জঠরস্থ যন্ত্রাদির উপাদানভূত পরমাণুপুঞ্জের আকর্ষণ বিকর্ষণ রূপ এক অপূর্ব্ব প্রভাব; পার্থিব তাড়িত শক্তির সহিত জৈব তাড়িতের তাৎকালিক সামঞ্জস্য, প্রভৃতি "জন্মকালগত প্রভাব রাশি" সেই মানবে চিরদিন ক্রিয়া করিতে থাকিবে; সুতরাং "জন্মকালগত" প্রভাবেরও সে অধীন।

(৩) দশমাস দশ দিন মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান কালীন মাতা যে সকল চিন্তা করেন, মাতা যে সকল দৃশ্য দর্শন করেন, মাতা যে প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করেন, যে স্থানে যে বায়ুতে, যে ভাবে অবস্থান করেন, তাঁহার সম্মুখে বিশেষ ভাবে যে যে বস্তু থাকে—ঐ সকলের প্রভাব সেই জীবের উপর আধিপত্য করে। যতদিন ঐ শিশু মাতৃক্রোড়ে এবং মাতৃস্তন্যে লালিত হয় তৎকালে মাতার যে সকল দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন

হইতে থাকে, তৎ তৎ প্রভাব-পুঞ্জ তাহার উপর চিরদিন ক্রিয়া করিবে। শিশু জ্ঞানলাভ করিলে 'মাতার দৃষ্টান্ত, সঙ্গ, ও উপদেশ এবং স্নেহ হইতে যাহা' কিছু লাভ করিবে, তাহার প্রভাবরাশিও (Maternal influence) ঐ জীবের উপর চির আধিপত্য করিবে।

(৪) অন্যদিকে, শিশু যে মুহূর্ত্তে ভূমিষ্ঠ হয়, তৎকালে গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থানাবস্থা, ও সঞ্চার ; এবং তৎ তৎ উপাদান ভূত পরমাণু ও শক্তি পুঞ্জের সহিত পার্থিব পরমাণু ও শক্তি পুঞ্জের সামঞ্জস্য ; শিশু দেহের পরমাণু ও তড়িতের সহিত নৈসর্গিক পরমাণু ও তড়িতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ; সদ্য-জাত শিশুর সুস্থ হৃদয়ে এই জগতের প্রথম প্রতিবিম্ব ; শিশু বেষ্টনকারী তাবৎ পদার্থের (environments) সহিত শিশুর আত্মনিহিত শক্তিরাশির প্রথম সামঞ্জস্যের চেষ্টা—'ভূমিষ্ঠ কালের' এই প্রভাবরাশিও শিশুতে চিরদিন আধিপত্য করিবে।

(৫) পরে শিশু পিতৃ দৃষ্টান্ত, ভাব, চিন্তা, উপদেশ, তিরস্কার এবং স্নেহ হইতে যাহা লাভ করে তাহার প্রভাবরাশিও শিশুকে পরিচালিত করে। এই পৈত্র প্রভাবেরও (Paternal influence) সে অধীন।

(৬) তৎপরে শিশু যে সকল ভ্রাতা ও ভগিনী, সমবয়স্ক ও সহপাঠীর সহিত একত্রাবস্থান, ও ক্রীড়াদি করে তাহাদের প্রভাব ; যে দেশে যে কোন বায়ুতে সে লালিত হয়, যে সকল পুস্তকাদি পাঠ করে, তৎতৎ প্রভাবাদিরও সে অধীন। ইহা বাল্য প্রভাব বা সংস্কার।

(৭) যৌবনে জীব যে ভার্য্যা, যে তনয় তনয়া প্রাপ্ত হয়, তাহাদের প্রতি মমতা বশতঃ তাহাদের প্রকৃতি সঞ্চারিত প্রভাবও তাহাকে পরিচালিত করে। ইহা যৌবন-সংস্কার।

(৮) প্রৌঢ়ে যে সকল বৈষয়িক ব্যাপারে সে লিপ্ত হয়, যে সকল বিষয়ীর সঙ্গ করে, যে সকল পুস্তক পাঠ করে, সে যে দেশ সকল পরিদর্শন করে, তাহার প্রভাবও তাহাতে থাকে।

(৯) বার্দ্ধক্যে আজীবন সঞ্চিত প্রভাবরাশি সেই দুর্ব্বলশক্তি ও দুর্ব্বল-চিত্ত জীবকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখে।

সুতরাং দেখা গেল আমাদের বেষ্টনকারী পদার্থপুঞ্জের (Environments) প্রভাব সকল আমাদিগকে নানা কার্য্যে প্রেরিত করে, সুতরাং আমি পরের কথায় চলি, পরের কথা বলি, পরের কথায় খেলি, আমার আবার স্বাধীনতা কোথায় ?

আমি যদি অন্য সম্বন্ধ শূন্য হইয়া, সম্পূর্ণ পদার্থান্তর বিহীন হইয়া জন্মিতাম, তাহা হইলে এক দিন স্বাধীন হইলেও হইতে পারিতাম; কিন্তু সৃষ্ট আমি এই বিশ্বের অংশীভূত বিন্দু মাত্র; একই অখণ্ড নিয়মে উহার সহিত সম্বদ্ধ, সুতরাং আমার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কোথায় ? আমার অস্তিত্ব সাপেক্ষ (Relative)।

যে মহান্ লক্ষ্যের দিকে এই বিশ্ব নিরন্তর প্রতিপাদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে, স্রোত বিতাড়িত তৃণের ন্যায়, তদংশীভূত আমি তৎসহ নীত হইতেছি। আমার আবার স্বাধীনতা ? তবে যদি কোনও কৌশলে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মাকে জানিয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এক দিন 'স্বাধীন' হইতাম।—যে জাতি প্রকৃতির উপর যে পরিমাণে আধিপত্য লাভ করিয়াছে সেই পরিমাণে সেই জাতি অপর জাতিকে অধীন করিয়া স্বাধীন হইয়াছে। সুতরাং সামর্থ্যের সহিতই স্বাধীনতার আরম্ভ; খেয়ালের সহিত নহে। মায়ান্ধ আমরা যে (Free will) এর খেয়াল দেখি তাহার নাম স্বাধীনতা নয়।

প্রারব্ধ।

কিন্তু এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিলাম তাহাতে এক দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি নাই। যে সংস্কাররাশি লইয়া জীবাত্মা জননীজঠরে

প্রবেশ করে,যে সংস্কার রাশি তাহার জন্মের হেতু, যাহা লইয়া তাহার ব্যক্তিত্ব—তাহার কথা বলা হয় নাই।

দেখা গিয়াছে দুইটী জীব (যথা যমজ কুমার দ্বয়) একই জন্ম কালীন প্রভাব, একই পৈত্র ও মাতৃপ্রভাব, বংশানুক্রমিক (Heredity) প্রভাব, একই ভূমিষ্ঠ কালীন প্রভাব, একই বাল্যাদি সংস্কারের অধীন থাকিয়াও বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে, বিভিন্ন কর্ম্মে রত হয়;—এখানে কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের কেমন বিশৃঙ্খলা উপলব্ধি হয়; প্রকৃতির জনয়িত্রী একই অবস্থা (environments); কিন্তু ফল রূপ প্রকৃতি, তৎফল প্রবৃত্তি, এবং তাহার ফল চেষ্টা অন্যরূপ। আবার কারণতত্ত্বের নিয়ম অখণ্ড্য; সুতরাং—এস্থানে অগত্যা স্বীকার করিতে হয়, কারণ নির্ণয় সম্পূর্ণ হয় নাই। প্রকৃতি-গঠনে কেবল আজন্মদৃষ্ট অবস্থা যথেষ্ট নহে। জীব ইহ জগতে অবস্থা-তরঙ্গে নিপতিত হইবার পুর্ব্বে কিছু না কিছু প্রকৃতি গঠনোপযোগী কারণ লইয়া আসিয়াছিল। তাহা এই "দৃষ্ট" কারণ রূপ "দৃষ্ট" অবস্থারাশি নহে; তাহার অন্বেষণ জন্য আমাদিগের ইহ জীবনের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না; তজ্জন্য আমাদিগকে সেই জীবের ইহ জীবনের পূর্ব্বাবস্থা (প্রাগ্‌ভাব) তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে; অতীতের অন্ধতমসাবৃত রাজ্যে দিব্য-জ্ঞানের দীপ লইয়া, সেই "অদৃষ্ট" রাজ্যে তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই কারণ এখন দেখা যায় না বলিয়া, তাহাকে "অদৃষ্ট" কহে। সেই কারণ রাশি অতীতে আরম্ভ হইয়াছে, (যাহার ফল ইহ জীবনে লাভ করা যাইতেছে) এই জন্য তাহাকে "প্রারব্ধ" ও বলে। সেই প্রারব্ধই ইহ জীবনের সুখ দুঃখাদিতে পরিণত হয়; তাহা অনুকূল প্রকৃতি ও অবস্থা (environments) সংঘটন করে। এই প্রারব্ধের নিয়ামক কে? ঈশ্বর যদি সত্যস্বরূপ হয়েন, "ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ" হয়েন, এবং ঈশ্বর যদি "সর্ব্বশক্তিমান্" হয়েন তবে

স্বীকার করিতে হয় যে, যে ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ, অর্থাৎ যাঁহার নিকট কেবল বর্ত্তমান কালই বিদ্যমান, তিনি নিশ্চয়ই এই বিশ্বসম্পৃক্ত তাবৎ ঘটনাই অবগত আছেন এবং তিনি যাহা অবগত আছেন তাহা সত্য; কারণ সত্যস্বরূপে ভ্রম অসম্ভব; যাহা সত্য তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, কিছুতেই তাহার বাধা হইবে না; কারণ ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত।

অতএব জগতে তাবৎ ব্যাপারই নির্দ্দিষ্ট আছে, স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক জীব সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিবে, যে পথ দিয়া সে অবশেষে "প্রকৃতি বিলয়ে" ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিবে, তৎ সমুদায়ই নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক জীবনে যে যে অবস্থার অধীনে জীব থাকিবে, যে কুলে, যে গোত্রে, যে দেশে, যে স্থানে জন্মিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং এক জীবনের অনুষ্ঠিত কর্ম্মাবলী অন্য জীবনের সুখ দুঃখাদির কারণ হয়। এইরূপ একবারের কর্ম্ম অন্য বারের প্রারব্ধ হয়; এবং তাহাই অপর বারের ফলরূপে পরিণত হয়। সুতরাং প্রারব্ধের নিয়ামক ঈশ্বর। তথাপি জীবের স্বাধীনতা বুদ্ধি আসে কেন? স্বাধীনতা কিছু কি নাই? আছে। বিশাল জলধি গর্ভে মীনের যেমন। মীন যথেচ্ছ সন্তরণ, আহার বিহার করে; কিন্তু তাহা জলধির মধ্যে।

পৌরুষ।

ইচ্ছামত বিচরণ করে বলিয়া মৎস্যের হয়ত ধারণা সে স্বাধীন; কিন্তু যাঁহারা মৎস্য-তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন মৎস্যের সন্তরণ আহার সংগ্রহাদি কয়েক ব্যাপার মাত্র করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার মধ্যে সাময়িক বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া সে যাহা হউক একটা না একটা করিতে পারে, কিন্তু জলের সীমা ও নির্দ্দিষ্ট সামর্থ্যের সীমা কখনও সে

অতিক্রম করিতে পারে না। সদসদাত্মিকা প্রকৃতি লাভ করিয়া মানবও নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সদসৎ কয়েকটী মাত্র ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারে, প্রকৃতির গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিতে সহজে সে পারে না, কারণ তাহার সামর্থ্যের একটা সীমানির্দ্দেশ আছে; তাহার মধ্যে থাকিয়া যে যাহা করে, সে মনে করে তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এইরূপ গণ্ডীগত স্বাধীনতাকে যদি স্বাধীনতা বলিতে হয়, তবে এই হিসাবে মানবের স্বাধীনতা আছে। শাস্ত্র কিন্তু স্বাধীনতা শব্দ আদৌ প্রয়োগ করেন নাই। শাস্ত্রে পৌরুষ শব্দ ব্যবহৃত আছে। পুরুষ শব্দে শাস্ত্রে আত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং পৌরুষ শব্দে আত্মাভিমুখী চেষ্টা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে চেষ্টায় আত্মার মায়া সম্বন্ধ বিচ্যুতি হয়, যাহাতে তাহার মায়িক বন্ধন হইতে মুক্তি হয়, তাহাই পৌরুষ। লোকে ইহাকে কিন্তু পৌরুষ বলিয়া বুঝে না। সদসদাত্মিকা যে সকাম চেষ্টা দ্বারা মানব সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, অর্থাৎ প্রারব্ধের ফল ভোগ করে, তাহাকে লোকে পৌরুষ কহে। কিন্তু এই পৌরুষ পুরুষাভিমুখী নহে, মায়াভিমুখী। সুতরাং প্রকৃত পৌরুষ নহে। অতএব পৌরুষ দ্বিবিধ হইল—এক আত্মানুগ পৌরুষ, অপর প্রারব্ধানুকূল। মনে করুন কেহ মুক্তি কামনায় বেদান্তাদি পাঠ করিয়া ব্রহ্ম বিচারণায় নিযুক্ত হইল অথবা নিষ্কাম ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানের উপাসনা করিল; আবার হয়ত কেহ এখান হইতে নিকট-বর্ত্তী একটী বাটী গমন করিতে করিতে সর্পদষ্ট হইয়া দেহ ত্যাগ করিল। ব্রহ্ম বিচারণা বা ভগবানে নিষ্কাম প্রীতি মায়িক কোনও বস্তুর দিক লক্ষ্য করে না, সুতরাং সেই পৌরুষের ফল প্রারব্ধাধীন সুখ দুঃখাদি হইতে পারে না, তাহা মায়াতীত পদার্থে নীত করিবে; সুতরাং এই জাতীয় পৌরুষই প্রকৃত আত্মানুগ পৌরুষ। আর যাহার প্রারব্ধলব্ধ সর্প্পদংশন নির্দ্ধারিত ছিল, সেই সর্প দংশনরূপ অবশ্যম্ভাবী

ফললাভ জন্য এখান হইতে অন্যত্র গমনরূপ পুরুষকার—প্রারব্ধানুগ পুরুষকার, প্রকৃত পুরুষকার নহে। এইরূপে স্বর্গাদি ভোগ জনক সৎ বা পুণ্য কার্য্য, অথবা নরকাদি প্রাপক অসৎ বা পাপানুষ্ঠান মায়া রাজ্যান্তর্গত সুতরাং প্রারব্ধানুগত। ঈশ্বর লাভ বা মুক্তি আদি প্রাপক পৌরুষ-স্রাবক বাসনা বীজ ভগবান্ জীবহৃদয়ে অনুগ্রহ পূর্ব্বক দিয়াছেন বলিয়াই জীব কোন না কোন সময়ে কর্ম্ম বন্ধন বিচ্যুত হয় নতুবা প্রারব্ধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুর্ঘট হইত। প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে যখন জীবের প্রকৃতিশুদ্ধি হইয়া—প্রকৃত পৌরুষ প্রয়োগের অবকাশ আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই জীব পৌরুষ কৃপায় মুক্তি লাভ করিয়া "পুরুষ" সঙ্গলাভ করে। প্রকৃত পৌরুষ প্রাপিকা শুদ্ধা বাসনাই মুক্তির হেতু, তাই উক্ত হইয়াছে—

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মনো হেতুঃ শুদ্ধা জন্ম-বিনাশিনী ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

এই মলিনা বাসনাক্ষয়ই জীবের পরম মঙ্গল জনক—

বাসনা-তানবং রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।
বাসনা দ্রাঢ্যতা রাম বন্ধ ইত্যভিধীয়তে ॥

প্রারব্ধ ও পৌরুষের বিচার বহুদিন—চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে, ইহার প্রকৃত তথ্য নিরূপণ বাসনা শূন্য হৃদয় ব্যতীত অন্য হৃদয়ে হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে সকল সদ্বিচারই শুভপ্রদ, তাই আলোচ্য। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধ বিপ্লবে পরিপ্লাবিত হইয়াছিল, যখন সনাতন ধর্ম্ম সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেই দুর্দ্দিনে আত্মজ্ঞানের প্রকট মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য

অদ্বৈত বাদের বিজয়কেতন লইয়া বিখ্যাত কর্ম্মী পরম পণ্ডিত শ্রীমণ্ডন মিশ্রের ভবনোদ্দেশে বিচারার্থী হইয়া গমন করিতেছিলেন। তখন সেই ভবন নির্দ্দেশ করিয়া মিশ্রের দাসীও বলিয়াছিল—

ফলপ্রদং কর্ম্ম ফলপ্রদোঽজঃ কীড়াঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি।
দ্বারস্থনীড়ান্তর-সন্নিরুদ্ধাঃ জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ॥

যেখানে শুক ও সারী কর্ম্মই ফলপ্রদ, অথবা ঈশ্বরই ফলদাতা এই কথা লইয়া তর্ক করিতেছে সেই গৃহই মণ্ডন মিশ্রের বাটী বলিয়া জানিও। যেকালে পণ্ডিতগণের ঘোর বিতর্কে শুক সারীতেও এই বিচার শিখিয়াছিল, তৎকালে ইহা কতদূর প্রচারিত ছিল সহজে উপলব্ধি হয়। আত্মানুগ পৌরুষই প্রকৃত পৌরুষ; নতুবা অন্য সমুদয়ই প্রারব্ধ ভোগ ও অদৃষ্ট সঞ্চয় মাত্র; নিষ্কাম উপাসনাই জীবের অতি কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই জীবের পরম কল্যাণ লাভ হইবে।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

—০—

সত্যম্।

সত্যের আদর চিরদিন সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিদ্যমান্। যাঁহার জীবন আছে, সে সত্যকে সম্মান ও প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহে শত মতভেদ ও বিষম বিরোধ বিচ্ছেদ থাকিলেও সত্যের প্রতি সমাদর দেখাইতে কাহারও মতভেদ নাই। সত্য কথা বলিবে, সত্য পথে চলিবে, সত্য ধর্ম্ম মানিবে, এ সকল মধুর ধ্বনি কণ্ঠে কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত, স্ত্রী ও পুরুষ, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, রাজা ও প্রজা, ক্রেতা ও বিক্রেতা, সকলেই সত্যের বহুমান করেন। দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, বৃত্তি ভেদে, কর্ম্ম ভেদে, ধর্ম্ম ভেদে, বর্ণ ভেদে, আশ্রম ভেদে, যুগ ভেদে, উপাসনা ভেদে, শাস্ত্রানুশাসন ভেদে সত্যের মর্য্যাদাচ্ছেদ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘরে কি বাহিরে, মঠে কি মন্দিরে, সমাজে বা সভার মাঝে, ভূতলে কি রসাতলে, কি স্বর্গ মণ্ডলে, রঙ্গপ্রাঙ্গণে বা তপোবনে, সজনে বা বিজনে, মনে মনে বা কথোপকথনে, সত্যের প্রতি সকলেই অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সত্যই বচন রচনারূপ মণি মাণিক্যের প্রভা, সত্যই সুচিন্তারূপ পয়োধিজলের শীতলতা ও গভীরতা, সত্যই ধর্ম্মরূপ সিংহের বীরবিক্রম, সত্যই শূর বীরবর্গের অমিত তেজ, সত্যই রাজার রাজশক্তির মহাবেগ, সত্যই গৃহস্থের সৌভাগ্য শ্রীর ভিত্তিমূল, সত্যই সন্ন্যাসীর সাধনার সম্পত্তি।

সবল, সাহসী, তেজস্বী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে সত্যকে আশ্রয় করিতে পারে না। যাহার বৃথাভিমান আছে, যাহার মলিন প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি ও মানৈষণা প্রবল, যে ভীত ও দুর্ব্বলহৃদয়, সে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। সত্য শিক্ষিত সভ্যজগতের শিরোমুকুটমণি, সত্য শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞানাদি মহারত্নরাজির সুগভীর খনি-

বলিয়া বিজ্ঞ-সমাজে সমাদৃত। সত্য সেবার দ্বারাই সুখ সম্পদ লাভ হয়, সত্যের তীব্র তেজে বিপুল বিঘ্ন বিপত্তি প্রশমিত হয়; যিনিই সত্যের সেবা করিয়াছেন, তিনিই ত্রিজগতে ধ্রুবতারা সদৃশ স্থির প্রতিষ্ঠা লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। যিনি সত্যসেবার জন্য শারীরিক, পারিবারিক বা লৌকিক সুখকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাঁহারই প্রতিষ্ঠা, তাঁহারই ধর্ম্ম, তাঁহারই তপস্যা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা ও বিদ্যুদ্দামকেও চমকিত করিয়া ত্রিলোক ও ত্রিকাল ব্যাপিয়া আলোকমালা বিস্তার করিয়াছে।

আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থে বাপি মানবাঃ।
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে বুধাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

আপনার জন্য বা পরের জন্য অথবা নিজ প্রিয় পুত্রের জন্যও যাঁহারা অসত্য কথা বলেন না, সেই মনস্বী মণ্ডলীই স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

সত্য গোলকবিহারীর কৌস্তুভমণি সদৃশ উজ্জ্বল হইলেও, সত্য সকলের বাঞ্ছিত ও পরমার্থ স্থান অধিকার করিলেও, সত্যকে জানিয়া লইবার, সত্যের স্বরূপ বুঝিয়া লইবার, সত্যকে নানাতত্ত্ব হইতে বাছিয়া বাহির করিবার সামর্থ্য সকলের নাই। আপনার মনগড়া সত্যের উপল খণ্ড গাঁথিয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ কণ্ঠমালা প্রস্তুত করিয়া লয়। নিজ নিজ সংস্কার ও নিজ নিজ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই নিজ নিজ মনের ময়লা মাখা কষ্টিতে সত্যরূপ সুবর্ণ কষিয়া লয়। সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ স্বর্ণকার ব্যতীত যেমন তুমি আমি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্ণ কষিয়া তাহার উত্তমাধমতা বুঝিতে পারি না, সেইরূপ সত্য স্বরূপে সমাহিত সৎপুরুষ বর্গ ব্যতীত সাধারণ লোকে সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ। সহরের অনেক শঠ ব্যক্তি সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীর কাছে গিল্টীর গহনা স্বর্ণালঙ্কার বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। বিচার বোধ বর্জ্জিত গ্রামবাসী স্বর্ণভ্রমে সেই ভূষণই সমাদর পূর্ব্বক সাবধানে গৃহে লইয়া যায়। এইরূপ

বাজারে বাজারে ধর্ম্মের দরবারে রাজার দ্বারে কার্য্য ক্ষেত্রের স্থানাধিকারে সত্য কত শত আকারে বিক্রীত হইতেছে, তাহা বলা যায় না।

একজন বিখ্যাত বক্তা ইংরাজিতে 'রাজযোগ' ব্যাখ্যান কালে বলিয়াছেন, 'যথাদৃষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করার নাম সত্য'। কেন? যথাশ্রুত, যথাঘ্রাত, যথাস্বাদিত, যথাস্পৃষ্ট, যথানুমিত বিষয়ের যথাযথ বিবৃত করার নাম কি সত্য নহে? সুতরাং ঐ অসম্পূর্ণ সত্যের ব্যাখ্যায় একজন শাস্ত্রজ্ঞের হৃদয় তৃপ্ত হইতে চাহে না। আবার যাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিলে, বা স্বকর্ণে শুনিলে, কিংবা নিজ নাসায় আঘ্রাণ লইলে, অথবা স্বরসনায় স্বাদগ্রহ করিলে কিংবা স্বহস্তে স্পর্শ করিয়া বুঝিলে তাহাই কি তুমি যথোচিত রূপে ভাষায় বিবৃত করিতে পার? অনেক সময় অতি সুকবি মহাকবিও সকল ভাব খুলিয়া বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পান না, তবে তোমার আমার ন্যায় সাধারণ ব্যক্তি কেমন করিয়া তত্তাবৎ যথার্থরূপে বিবৃত করিতে পারিবে? আবার ইহাও বিচার্য্য যে "যথাদৃষ্ট" বলিলেই "সত্য" হইবে, তাহারও প্রমাণ নাই। তুমি আকাশে সূর্য্যকে একখানি থালের ন্যায় দেখিলে, তাহাই বর্ণনা করিলে যে সূর্য্যের স্বরূপ বর্ণনা হইবে, তাহা নহে। যাহা দেখিলে তাহাই যদি সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা কর, তবে কি সূর্য্য দর্শনের সমীচীন সঙ্কেতপূর্ণ জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ তোমার কথা বিশ্বাস করিবেন? তুমি আকাশকে শূন্যময় দেখিয়া বলিলে আকাশে কিছুই নাই, ইহা শুনিয়া একজন অণুবীক্ষণ ব্যবহারজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ কি বিশ্বাস করিবেন অগণ্য কীটাণুকীটে পরিপূর্ণ আকাশ মণ্ডলে কিছুই নাই? তুমি স্বচক্ষে কোন পাত্রস্থ জলকে নির্ম্মল ও স্বচ্ছ দেখিয়া লোকের নিকট তাহাই সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে গেলে, যন্ত্রদৃষ্টি সাহায্যে কি তোমার সেই সত্য অপলাপগ্রস্ত হইবে না? বস্তুতঃ তোমার আমার চক্ষু পদার্থ বা বিষয় সমূহের প্রকৃত তথ্য নিরূপণে নিতান্ত অযোগ্য; এই জন্য "যথাদৃষ্ট" ঘটনাবলী বিবৃতিই সম্পূর্ণ সত্য

বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ক্ষীর সুমধুর, ইহা তুমি আস্বাদ করিয়াছ সত্য, কিন্তু যে ক্ষীর খায় নাই, তাহাকে কি কোন ভাষার ভঙ্গীতে ক্ষীরের মধুরতা বুঝাইয়া দিতে পার? তুমি দুই পক্ষে ঝগড়া করিতে দেখিলে, রাজদ্বারে গিয়া তুমি যে "সত্য বলিব" বলিয়া সাক্ষ্য দান কর, তাহা কি প্রকৃত সত্য! উভয়ের বাক্য প্রয়োগ কালে, যে স্বর, যে ভঙ্গী আদি সেই বাক্য রাশির কটুতা, অপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিয়াছিল, তুমি হয় ত তত্তাবৎ বিষদরূপে প্রকাশ করিতে পারিলে না, কেবল মাত্র তাহাদের কথা গুলির কঙ্কাল মালা সাজাইয়া গুছাইয়া যথাক্রমে বলিলে; ইহাতে তোমার সত্য কি অঙ্গভঙ্গযুক্ত ও অসম্পূর্ণ হইল না? যেমন তরুবরের শাখা, পল্লব, ফুল, ফল আদি ফেলিয়া দিয়া স্থাণু মাত্রকে তরু বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা বৃথা, সেইরূপ ভাষা, ভঙ্গী ও স্বরাদি বিহীন হইয়া উচ্চারিত বা বিবৃত হইলে উহা স্বরূপোক্তি বা সত্য ভাষণ বলিয়া গৃহীত হয় না। আমি যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহার প্রতি-ধ্বনিই যে সত্যবাণী হইবে, তাহা নহে, কেন না আমার দর্শনেন্দ্রিয়াদির যথাযোগ্য শক্তি সামর্থ্যের অভাব থাকিলে আমি রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদির অবিকল ভাবগ্রহ করিতে পারি না, আবার যাহা কিছু পারি, তাহাও ভাষা শক্তির অসমর্থতা জন্য যথার্থরূপ প্রকাশ করিতে পারি না, সুতরাং স্বরূপ কথন বা সত্য ভাষণ আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

আবার কেহ কেহ বলেন, 'শব্দ' স্বয়ংই ত্রিকালে বিদ্যমান নহে, উহা আকাশের গুণ মাত্র, উদিত হইয়াই বিলীন হইয়া যায়। আকাশ মিথ্যা, মিথ্যার গুণও মিথ্যা, অতএব কথাও মিথ্যা। মিথ্যার আবার সত্যতা কি! বস্তুতঃ 'কথা' সত্যের জ্ঞাপিকা হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং সত্য হইতে পারে না। ত্রিকালে বিদ্যমানতা যাহার নাই, 'সত্য' সেই 'কথার' বিশেষণ হইতে পারে কি না, ইহা মনীষিগণ বিচার করিবেন।

স্বায়ম্ভুব বলিয়াছেন "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যম-প্রিয়ম্"। সত্য বলিবে, প্রিয় (জীবের হিতজনক বাক্য) বলিবে। সত্য যদি অপ্রিয় হয়, তবে তাহা বলিবে না। অর্থাৎ তুমি যাহা দেখিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ বা যাহা বুঝিয়াছ তাহাই যে বলিবে এমন নহে, যদি তাহাতে জীবের হিত না হয়, তবে বলিয়া কাজ নাই, পরহিত সাধন বিরহিত সত্যকে মনু মর্য্যাদা দেন নাই।

অন্যত্র লিখিত আছে—

যথার্থকথনং যচ্চ সর্ব্বলোক সুখপ্রদম্।
তৎ সত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ম্॥

যে যথার্থ কথন জীব সমূহের সুখপ্রদ, তাহাকেই সত্য ভাষণ বলিয়া জানিবে, যে কথা লোকের কল্যাণপ্রদ না হয়, সে সত্য কথনকে "অসত্য" বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

তৈত্তিরিয়োপনিষদে লিখিত আছে—

বেদমনুচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।
সত্যম্বদ, ধর্ম্মঞ্চর + + সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্,
ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যমিত্যাদি।

বেদাধ্যাপনান্তে আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। সত্য বলিবে। ধর্ম্মাচরণ করিবে + + সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না।"

বেদাচারী ব্রহ্মচারী বন্য ফল মূলাহারী শিষ্য আজ কোন্ নিষ্কলুষ সত্যকে হৃদয়ের রত্ন সিংহাসনে বসাইয়া গৃহে পুনরাগত হইতেছিল? ইহা কোন্ সত্য যে, যাহা হইতে বিচলিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা বিফল হইয়া যাইবে? ইহা কোন সত্য, যাহা দ্বারা ভা—

অলঙ্কৃত না হইলে ব্রহ্মবচনামৃত বিধৌত ব্রহ্মচারীর রসনা অপবিত্র হইয়া যাইবে, ও তাঁহার মহত্ত্বকে মলিন করিয়া দিবে ?

পাতঞ্জল দর্শনের সাধন পাদের ব্যাখ্যা কালে ভাষ্যকার ও টীকাকার অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়াছেন—

পরহিতার্থং বাঙ্মনসোর্যথার্থত্বং সত্যম্।

অনুবাদক এইরূপ আভাস দিয়াছেন, সত্যানুষ্ঠানের লক্ষণ সকলেই জানেন বটে, পরন্তু যোগীর পক্ষে কিছু বিশেষ আছে। যেমন দেখা, যেমন শুনা ও যেমন বুঝা তদনুরূপ কথার নাম "সত্য" ইহা ত স্থূল সিদ্ধান্ত। তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কার্য্যের অনুরোধে, বা অন্য কোন স্বার্থ সাধনানুরোধে সত্য কথা বলিলে বটে ; কিন্তু তোমার মনোমধ্যে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধি থাকিয়া গেল, ইহা প্রকৃত সত্যের অনুষ্ঠান নহে। রাজদ্বারে বা সভা মধ্যে তুমি এরূপ পদ বিন্যাস করিয়া বলিলে, যে তাহার "ফল" মিথ্যা বলার "ফলের" সহিত সমান ; অর্থাৎ আপনার বা বন্ধুর ইষ্টসিদ্ধি হইল, অথচ লোকে মিথ্যাবাদীও বলিতে পারিল না, এরূপ কুটিল সত্যের দ্বারা প্রকৃত "সত্য" অনুষ্ঠিত হইবে না। পরের অহিত, পরের সর্ব্বনাশ করিয়া যদি তুমি সত্য কথা বল, তবে সে সত্যে তোমার প্রকৃত সত্য কথনের ফল হইবে না। অকপট চিত্তে পরহিতের জন্যই যেন তোমার সত্য কথনের প্রবৃত্তি প্রবাহিত হয়। ছল, বল, কপটতাপূর্ণ দুরভিসন্ধি বর্জ্জিত ও সংযতচিত্ত হইয়া সরল ভাবে বিপদে ও সম্পদে সকল সময়েই বাক্য, মন ও চেষ্টাকে যথাদৃষ্ট বা যথাশ্রুত ও যথানুভূত কথনে প্রবৃত্ত করিবে। কেবল মাত্র "যথাযথ" কথনের নাম "সত্য" নহে।

এক্ষণে সনাতন সৎপুরুষের চিরসেবক মহর্ষি বেদব্যাস পাতঞ্জল দর্শনের উপর্য্যুক্ত স্থলেরই নিজ ভাষ্যে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও একবার ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখা, নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ যথা—

সত্যং যথার্থে বাঙ্‌মনসে, যথাদৃষ্টং যথানুমিতং যথাশ্রুতং তথা বাঙ্‌মনশ্চেতি, পরত্র স্ববোধ-সংক্রান্তয়ে বাগুক্তা সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেদিতি, এষা সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়, যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাত-পরৈব স্যাৎ ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ, তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ কষ্টতমং প্রাপ্নুয়াৎ, তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ।

বাক্য ও মনের সহিত যথার্থ কথনের নাম সত্য। অর্থাৎ যাহা দেখিয়াছ, যাহা বুঝিয়াছ, এবং যাহা শুনিয়াছ, অন্যের নিকট বলিবার সময় সেইরূপ বাক্য (স্বর, সুর, ভাব, ভঙ্গি সহ) প্রয়োগ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনকেও তদনুরূপ অবস্থাপন্ন করিবে। প্রত্যক্ষাদি দ্বারা নিজের যেরূপ জ্ঞান হইয়াছে, শ্রোতারও অন্তঃকরণে যাহাতে অবিকল সেইরূপ জ্ঞান প্রতিফলিত হয়, তাদৃশ কথনের নাম সত্য কথন। যদি ভাষার সত্যতা রক্ষা করিয়া ভাবের অভিব্যঞ্জনে অসমর্থ হও, অথবা প্রতারণার উদ্দেশে কিম্বা ভ্রম জন্মাইবার জন্য কৌশলপূর্ণ ভাষা কথিত হয়, তবে তাহাতে সত্য রক্ষিত হয় না, কিম্বা ভাষা সত্য হইলেও এমন ভাব, ভঙ্গি ও স্বরে হয় ত তুমি বলিলে যে শ্রোতা ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদ্বোধ করিতে পারিল না, তবে উহাও "সত্য কথন" বলিয়া গৃহীত হইবে না। বাক্যের প্রয়োগ এরূপ ভাবে করিবে, যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, উহা যেন কাহারও কোন অনিষ্টের কারণ না হয়। এবম্বিধিতে বাক্য প্রয়োগ করিলেও যদি অন্যের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাতে সত্য পরিরক্ষিত হইতে পারে না, বরং উহাতে পাপেরই সঞ্চার হইয়া থাকে। পরাপকার-

কারক সত্য ভাষণ পুণ্যজনক নহে, উহাতে আপাততঃ পুণ্য বোধ ও লোক-লোচনের সম্মুখে প্রশংসা লাভ হইবে বটে, কিন্তু পরিণামে উহার জন্য অতিক্লেশদায়ী নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, অতএব সম্ভাষণ কালে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিবে, যেন কোন বাক্যে জীবের হিত ভিন্ন অনিষ্ট না হয়।

মহর্ষির সুগভীর বিচার পূর্ণ ব্যাখ্যানে প্রতীত হইতেছে, যে কথার সত্যতার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কথার প্রতিপাদ্য বিষয়টী বা পরিণাম ফল যেন জীবোপকার কারক অর্থাৎ সৎ পদার্থের সদ্‌ভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল হয়। এইখানে একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করিতে হইল—

একটা শৃগালীকে একটা নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করিয়াছিল। শৃগালী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল; নেকড়েও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। শৃগালী অতিবেগে ধাবিত হইয়া দেখিল একটা ধনুর্ধারী ব্যাধ দাঁড়াইয়া আছে, নিকটে তাহার পর্ণকুটীর। শৃগালী কাতর কণ্ঠে ব্যাধের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল, বলিল—আমি তোমার কুটীরে লুকাইয়া থাকি, নেকড়ে আসিয়া আমার সমাচার জিজ্ঞাসা করিলে আমি যে কুটীরে রহিলাম, এ কথা তাহাকে বলিও না, সে জানিলে আমার প্রাণ বধ করিবে। ব্যাধ শৃগালীর স্তুতি বিনয়ে করুণার্দ্র হইয়া, সেই রূপই স্বীকার পাইল। শৃগালী কুটীরে লুকাইল ও একটী ছিদ্র দিয়া নেকড়ের গতিবিধি সতর্ক ভাবে দেখিতে লাগিল। ক্ষণ বিলম্বে নেকড়ে সেইদিকে আসিয়া ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার শিকার —একটা শৃগালী এদিকে আসিয়া কোথায় গেল, তাহা কি তুমি জান? ব্যাধ ভাবিল, এখন মিথ্যাই বা কিরূপে বলি, অথচ তাহাকে বলিয়াছি, নেকড়েকে সংবাদ বলিব না। চতুর ব্যাধ শৃগালীর নিকট অঙ্গীকার হেতু নেকড়েকে মুখে বলিল, "শৃগালী কোন্‌ দিকে গিয়াছে আমি তাহা জানি না।" আবার নেকড়েকেও জিজ্ঞাসার উত্তরে সত্য না

বলিলে ভাল হয় না, সেইজন্য দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা কুটীর নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, যে শৃগালী ঐ কুটীরে লুকাইয়া আছে। নেকড়ে ব্যাধের মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল, অঙ্গুলীর সঙ্কেত বুঝিতে পারিল না। নেকড়ে চলিয়া গেলে শৃগালী বাহির হইল। তখন ব্যাধ শৃগালীকে বলিল, আমি যে তোমার প্রাণ রক্ষা করিলাম, আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তখন চটুলা শৃগালী কহিল, যদি তোমার মুখখানির মত, তোমার হাত খানি হইত, তবে তোমাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতাম। ব্যাধের মুখে মিথ্যা কথা, হাতে সত্য সঙ্কেত। এখন ব্যাধ হাতের গুণে স্বর্গগামী হইবে, কি মুখের দোষে নিরয়গামী হইবে, ইহা বুদ্ধিমান্‌গণ বিচার করিয়া দেখিবেন। "মুখ" দয়ার অনুগমন ও "হস্ত" সত্যের (?) অনুসরণ করিল। ধর্ম্মাধিকারে কোন্ পক্ষের জয় হয়, দেখা চাই।

শাস্ত্রবিচারে হস্তের সঙ্কেতরূপ সত্য অপেক্ষা ব্যাধের মুখখানি হইতে যে পরহিতকারিণী বাণী বিনির্গত হইয়াছিল, তাহাতেই পুণ্য সঞ্চিত ও প্রশংসা বর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্দেবী ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে বর্ণিত সত্যব্রতের ইতিহাস পাঠ করিলে সিদ্ধান্তটী আরও পরিস্ফুট হইবে। এইজন্য নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

* * * সেই দ্বিজপুত্র উতথ্য এবম্বিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া জাহ্নবীর সুপবিত্র তীরস্থিত সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে সেই আশ্রম স্থলে বাস করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অতিকষ্টে সেই বিজন বনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিমল জল সেবিত অরণ্য মধ্যে বাস করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। * * জনগণ তাঁহার একমাত্র ব্রত অবগত ছিল যে, এই মুনি সততই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, এইজন্য ইঁহার সত্যব্রত নাম হইয়াছে

এবং তাঁহার এই এক যশ সকল লোক মধ্যে প্রথিত হইল যে, ইনি "সত্যব্রত"। ইনি কখনই মিথ্যা কথা কহেন না।

একদিন দ্বিতীয় যমের ন্যায় ক্রূরাকৃতি এবং মৃগয়ায় অতি নিপুণ নিশঠ নামে নিষাদ ধনুঃশর ধারণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় উৎসুক হইয়া মৃগয়া-ক্রীড়া করিতে করিতে সেই সুবিস্তীর্ণ অরণ্য মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই ধনুর্ধারী কিরাত আকর্ণাকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা এক বরাহকে বিদ্ধ করিলে, সে ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়ন পূর্ব্বক অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়া সেই সত্যব্রত মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। শূকর আশ্রমে আসিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহ রুধিরধারায় আর্দ্র হইয়া গেল। মুনি সেই দীন-ভাবাপন্ন শূকরকে দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন। শরবিদ্ধ শূকর রুধিরধারায় আর্দ্র হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে, ইহা দর্শন করিয়াই সত্যব্রতের মানসে দয়ার আবেশ হইল, তাহাতে তিনি কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং শোকে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর শরপীড়িত, অত্যন্ত খিন্নচিত্ত শূকর কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রম মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল এবং আর পথ না পাইয়া নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে লুকাইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই সেই ব্যাধ শূকরের অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যব্রতের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং সত্যব্রতকে বলিল, "দ্বিজবর! বাণবিদ্ধ বরাহ কোন্ দিকে গমন করিল? ব্রাহ্মণ! আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ সত্য ব্রতের বিষয় অবগত আছি; এইজন্য আপনাকে সত্য সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার পরিবারবর্গ সকলেই ক্ষুধায় কাতর, তাহাদিগের পোষণ কামনায় মৃগয়ায় আসিয়াছি। পশুবধই আমার বিধি বিনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি, আমার ইহা ভিন্ন অন্য জীবনোপায় নাই, [illegible] আপনাকে সত্যই বলিতেছি। অনিন্দিত হউক বা নিন্দিতই হউক, যে কোন উপায় দ্বারা কুটুম্ববর্গের ভরণ পোষণ করা কর্ত্তব্য, অন্নিমিত্তই

আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে ব্রাহ্মণ! আপনি সত্যব্রত নামে বিখ্যাত, আমার পোষ্যবর্গ উপবাসী, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি সেই বাণবিদ্ধ বরাহ কোথায় গেল, আপনি শীঘ্র সত্য করিয়া বলুন। এতচ্ছ্রবণে সত্যব্রত সংশয়ান্বিত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি যদি "দেখি নাই" এই বাক্য উচ্চারণ করি, তবে আমার কি সত্যব্রত ভঙ্গ হইবে না? শরবিদ্ধ শূকর এইস্থান দিয়া গিয়াছে সত্য, তবে কিরূপে মিথ্যা বলিব? আবার এই ব্যক্তি ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ শূকরকে দেখিতে পাইলেই বিনাশ করিবে; তবে সত্যই বা কিরূপে বলিব?

সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা
দয়ান্বিতং চানৃতমেব সত্যম্।
হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন
তদেব সত্যং ন তথান্যথৈব॥

যে সত্য-ভাষণে জীবের হানি হয়, সে সত্য সত্যই নহে, কিন্তু দয়া দ্বারা অন্যের কল্যাণ কামনায় প্রযুক্ত মিথ্যাও সত্য হইয়া থাকে। ফলতঃ যদ্দ্বারা ইহ লোকে প্রাণিগণের হিতসাধন হয়, তাহাই সত্য, আর সমস্ত মিথ্যা।

সত্যব্রত এইক্ষণে এতাবদ্বিচার পূর্ব্বক বরাহের পক্ষ বা ব্যাধের পক্ষ সমর্থন করিবেন, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভগবতী মঙ্গলদায়িনী দেবী তাঁহার মন্ত্রসাধক সত্যব্রতের হৃদয়ে বিমল বিদ্যার বিস্ফুরণ করিয়া দিলেন। তখন তিনি পুরাতন মুনি বাল্মীকির ন্যায় তৎক্ষণেই সৎকবি হইয়া উঠিলেন। অনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যব্রত সত্য কামনা করিয়া নিষাদকে এই শ্লোক বলিলেন,—

যা পশ্যতি ন সা ব্রূতে যা ব্রূতে সা ন পশ্যতি।
অহো ব্যাধ! স্বকার্য্যার্থিন্! কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ॥

যে শক্তি দর্শন করে, সে শক্তি বলিতে পারে না, যে শক্তি বলিতে পারে, সে শক্তি দেখিতে পায় না; অতএব হে স্বার্থপর নিষাদ! তুমি আমাকে পুনঃপুনঃ কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সত্যব্রত নিষাদকে কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না, কারণ তিনি "সত্য কথন" অসম্ভব মনে করিলেন। কেন না তিনি বুঝিলেন যে, যে 'শক্তি' (দর্শন শক্তি) দ্বারা 'দেখিতে' পাওয়া যায়, সে শক্তির যদি "বলিবার" সামর্থ্য থাকিত, তবেই যথার্থ বলা সম্ভব হইত। অথবা যে 'শক্তি' (বাক্ শক্তি) বলিতে পারে, সে শক্তি যদি 'দেখিতে' পাইত, তাহা হইলেও "যথাদৃষ্ট" তথা "ব্যক্ত" হইত। এখন বুঝা যাইতেছে যে, 'যে দেখে সে বলে না, আর যে বলে সে দেখে না। মধ্যবর্ত্তী মন ও বুদ্ধি 'দর্শনের" অনুবাদ করিয়া থাকে। দর্শন শক্তি দ্বারা যাহা প্রতিবিম্বিত বা পরিগৃহীত হয়, "বাক্ শক্তি" দ্বারা তাহা যথাযথ চিত্রিত বা বর্ণিত হয় না। অতএব দৃষ্ট বিষয়ের আকৃতি, প্রকৃতি, ভাব, ভঙ্গী, লক্ষ্য আদি ভাষায় যখন স্বরূপতঃ অঙ্কিত হয় না, তখন যথাযথ—যথার্থ—সত্য কথন কঠিন হইয়া উঠিল। তবে পুর্ব্বোক্ত 'সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসেতি' শ্লোকের মর্ম্মানুসারেই সংসারে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা শাস্ত্রসম্মত।

এখানে একটা এই সংশয় হইতে পারে, যে ব্যাধের শরে শূকরের মৃত্যু জানিয়া সত্যব্রতের দয়া হইল, কিন্তু আহারাভাবে যে ব্যাধের পরিবার বর্গ মারা পড়িবে, তজ্জন্য দয়া হইল না কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, দয়া উভয় জীবের প্রতিই কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যাধের পরিবারবর্গ শূকর মাংসাভাবে যে এখনই মরিয়া যাইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, অন্য অন্ন ভোজনে বাঁচিতেও পারে, কিন্তু শূকর যে এখনই নিহত হইবে, তাহা নিশ্চয়, অতএব এখানে শূকরই প্রথম দয়ার পাত্র। এ সময়ে শূকরের পক্ষপাতিনী বাণীই প্রয়োগযোগ্য।

"সত্যমুৎপাদ্যতে ধর্ম্ম দয়া ধর্ম্মং প্রবর্ত্ততে"।

সত্য ধর্ম্মকে উৎপাদন করে বটে, কিন্তু দয়া ব্যতীত ধর্ম্ম প্রসারিত বা সম্বর্দ্ধিত হয় না। সুতরাং যে সত্য দয়া সঞ্চারের পথকে দুর্গম করিয়া দেয়, তাহার মর্য্যাদা অতি অল্প।

যোগিজন-সমাজ-শিরোমণি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—

"সত্যং ভূতহিতপ্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্"।

যে ভাষা জীবের হিতসাধনানুকূল, তাহাই 'সত্যভাষণ," যথাদৃষ্ট বা যথাশ্রুতাদি কথনের নামই 'সত্যকথা' নহে। যোগিরাজ কথার সত্যতা বা মিথ্যাত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলেন নাই। যে ভাষায় জীবের হিত হয়, সে ভাষাকে লোকে সত্যই বলুক বা মিথ্যাই বলুক, তাহাই বক্তব্য। শ্রীমদ্দেবী ভাগবতের ৪র্থ স্কন্দে ২১শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

মিথ্যা যদি প্রকর্ত্তব্যং বচনং শুভমিচ্ছতা।
ন তত্র দূষণং কিঞ্চিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

নীলকণ্ঠ টীকা করিয়াছেন, "যদি শব্দোঽপ্যর্থকো নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ। তথাচ শুভং জীবরক্ষণাদিরূপ মিচ্ছতা পুরুষেণ মিথ্যাপি কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। জীব রক্ষণার্থ মিথ্যাবদনেঽপি দোষাভাব ইতি ভাবঃ।"

পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, "কোন ব্যক্তি যদি জীব রক্ষণাদিরূপ মঙ্গল কামনায় কদাচিৎ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।" অর্থাৎ এ মিথ্যা কখন অস্বর্গপ্রদ নহে। কিন্তু এই বাক্যের সহিত ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত 'প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ' অর্থাৎ প্রিয় বা হিতকারী হইলেও মিথ্যা বলিবে না, এই বাক্যের মতবাদ দেখিয়া কেহ ভীত হইবেন না। কেন না, পরহিত মাত্র উপলক্ষ করিয়া মিথ্যা ভাষণে যেন 'প্রবৃত্তি' না জন্মে, ইহাই এতদ্বিধির উদ্দেশ্য। পর-

হিতার্থে একান্ত প্রীতিযুক্ত ও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি সত্য ভাষায় কার্য্য সাধনে অকুলান পড়ে, তবে অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিথ্যা কথা আসিয়া যায়। তবে পরহিত জন্য (মূলে সৎ প্রবৃত্তি আছে বলিয়া) স্বর্গগতি হইবে, কিন্তু পরহিতার্থ মিথ্যা কথা জন্য (মূলে মিথ্যা কথনে প্রবৃত্তি নাই বলিয়া) নীরয় গতি হইবে না। কেন না ক্রিয়া অপেক্ষা প্রবৃত্তিই অধ্যাত্মরাজ্যে বলবতী ও ফলবতী। চিকিৎসকগণ পীড়িত ব্যক্তিকে অতি ক্লিষ্ট দেখিলে "কল্যই আরোগ্য হইবে, পরশ্ব পথ্য পাইবে" ইত্যাদি নানা মিথ্যা বচনী রচনায় প্রবোধ দিয়া থাকেন, এ মিথ্যা কথন রোগীর ক্লেশোপশমের হেতু বলিয়া চিকিৎসককে সুরলোকের পথই সহজ করিয়া দেয়। হিতোপদেশে কাক, কূর্ম্ম, বরাহাদির কথোপকথনচ্ছলে অনেক হিতকথা বর্ণিত আছে। কথাগুলি সমস্তই কল্পিত ও মিথ্যা হইলেও, লোকহিত সাধন রূপ সদভিসন্ধি আছে বলিয়াই বিষ্ণুশর্ম্মাকে অস্বর্গ মার্গে যাইতে হয় নাই। কবিকুলের কাব্য রচনায় অধিকাংশই কল্পনা ও মিথ্যা প্রসূত কথা থাকে, কিন্তু জীবহিতার্থ বিরচিত বলিয়া এই মিথ্যা বচন তাঁহাদের 'স্বর্গস্য মার্গার্গলম্' বলিয়া কেহ নিন্দা করে না। বস্তুতঃ অসতে যেন কাহারও প্রবৃত্তি না হয়, ও সকলেই যেন সদনুসরণ করে, ইহাই আর্ষ বাক্যাবলীর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়। যদি সদভিসন্ধি সাধনে যথার্থ বা সত্য কথনের সাহায্য পাওয়া যায়, তবে ত সে কাঁচা সোনায় গোরোচনা মাখানো হইল, আর সদভিসন্ধি সাধনে যদি সত্য বা যথাযথ কথনের অপ্রতুল পড়ে তবে অযথার্থ ভাষার সাহায্য লইলেও ক্ষতি নাই, কেন না সদভিসন্ধি 'সিদ্ধিরই' ফলাধিক্য আছে। সিদ্ধির 'প্রকরণ" বা 'উপকরণের' মর্য্যাদা তত নাই। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বান্তর্গত নবাধিক শততম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যে রাজা যুধিষ্ঠির 'সত্য কি,' 'মিথ্যা কি' এতাবৎ প্রশ্ন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সত্য বাক্য প্রয়োগ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের

তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সে স্থানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যা কথা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপে সত্য মিথ্যা বিচারে সমর্থ হন, তিনিই জন সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মকাম হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারেন না। কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ উলুক ধর্ম্মকাম না হইয়াও অসংখ্য সর্পনাশ নিবন্ধন বিপুল পুণ্যলাভ করিয়াছিল। যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশ নিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। * * * * * দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐ রূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে। তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি ওরূপ স্থলে শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। ইত্যাদি।"

অনেক লোকের এরূপ সংস্কার আছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে অশ্বত্থামা হত এইরূপে আভাসে মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নরক দর্শন হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। "সত্য কথা" বলিয়া একটা কোন নির্দ্ধারিত পদার্থ নাই। যে কথায় 'সত্য" সিদ্ধ হয় তাহাই 'সত্যকথা'। সত্য স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যে কথা বলিতে আদেশ করিলেন, যুধিষ্ঠির সে ভগবদ্বাক্যকে 'অসত্য' বোধ করিলেন, যুধিষ্ঠির সেই ভগবদ্বাক্যকে "অসত্য" বোধ করায় এবং তাঁহার আজ্ঞা পালনে সঙ্কুচিত হওয়ায় অপরাধগ্রস্ত হইলেন এবং সেই অপরাধই তাঁহার নরক দর্শনের হেতু।

বস্তুতঃ 'সত্য' একটা বাহিরের ঠাট নহে, আপনার মনো-মানিত

ভাবের আবেশে কথা সাজাইয়া বলিলেই 'সত্য' প্রতিপাদিত হয় না। কায়েন মনসা বাচা ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। ভাষা, ভাব, ইচ্ছা, লক্ষ্য, চেষ্টা, প্রবৃত্তি, কার্য্যাদি লোকহিতজনক হইলে তবে উহা 'সত্য' বলিয়া অভিহিত হইবে। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত, ইহাই ধর্ম্মানুগত, ইহাই বক্তব্য, ও ইহাই সত্য।

মীমাংসা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে—

আব্রহ্ম তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই মায়াকল্পিত, একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য, জীব তাঁহাকে জানিলেই সুখী হইয়া থাকে। যাহা মায়িক, যাহা ক্ষণিক, যাহা ভঙ্গুর তাহাই মিথ্যা। যাহা অবিনশ্বর তাহাই সত্য, সুতরাং চেতনার চক্ষে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছুই 'সত্য' বলিয়া অনুমিত হয় না। সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্মবিচারে ব্রহ্মই 'সত্য', আর স্থূল জগতের সত্য, "সরলতা"। সত্যের আর একটী অবস্থার নাম 'নিষ্ঠা'। আত্মবোধই সমাধি রাজ্যের চৈতন্য প্রসূত নিষ্ঠা, আর 'সরলতা' চিত্ত রাজ্যের চিন্তা প্রসূত নিষ্ঠা। চৈতন্যনিষ্ঠার অধিকারী কিছু বিরল। কিন্তু দুই নিষ্ঠাতেই মধুরতা আছে। যিনিই নিষ্ঠাবান্, তিনিই সত্যশীল।

ব্রহ্ম বা আত্মাই নিত্যকাল একরস বিদ্যমান্ ও ষড়্‌বিকার বর্জ্জিত, এই জন্য ব্রহ্মই প্রকৃত সত্য; আর যে কথা ব্রহ্মলাভের বা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির অনুকূল, বা অবিরোধী অর্থাৎ যে বাণী কল্যাণ পথানুসারিণী, তাহাই সত্য। "সরলতা" সত্যের একটী প্রকৃত ছায়া। যেখানে "সরলতা", সেখানে কাহারও প্রতি বিরুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হয় না, সুতরাং সরল ব্যক্তি কায়েন মনসা বাচা সত্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আত্মানুগামিনী নিষ্ঠার তীব্রাতিতীব্রতা ও ঘনতা হইলেই আত্মাতে সমাধি

হয়। আত্মস্বরূপোপলব্ধি হইলেই সৎ স্বরূপ বা সত্যের বিকাশ হইয়া থাকে। আর মনোমধ্যে সদা সদ্ভাবযুক্ত সাধু চিন্তা রাশি ক্রীড়া করিতে থাকিলেও পরাপকারিণী চিন্তা চিত্ত রাজ্য হইতে বিদুরিত হইলে 'সরলতার' বা বৈষম্য দোষ বর্জ্জিত সত্যের আলোক হৃদয়কে উজ্জ্বল করে!

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

বৈরাগ্য। *

অনেকের বহির্ব্বিষয়ে বৈরাগ্য দেখিয়া লোকে সাধারণতঃ উহাকে যেরূপ কঠোর ভাবিয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু উহা ততদূর ক্লেশকর কিনা, ইহা একবার বিচার করা আবশ্যক, এবং যাঁহারা ঈদৃশ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে যথার্থই বিরাগী মনে করেন, তাহাই বা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, ইহাও পূর্ব্বে না বুঝিলে আমরা বৈরাগ্যের স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিতে কখনই সক্ষম হইব না। সুতরাং বৈরাগ্যের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পার্থক্য ও তজ্জনিত বৃত্তি প্রবাহের বিভিন্নতার বিষয় একটু আলোচনা করিতে হইবে।

প্রবৃত্তি প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইলেও তোয়তরঙ্গের ন্যায় উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হইয়া থাকে। জীবের প্রকৃতি প্রবৃত্তির হিল্লোলে স্ফুরিত হইবার অতি অল্পই অবকাশ পায়। সুতরাং আমরা অধিকাংশ সময়েই প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকি। অথচ প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য না করিলে কোন উপকারেরই আশা নাই! এই জন্য আমরা প্রকৃতির তথ্য না লইয়া নিজ নিজ প্রবৃত্তির আদেশ অনুসারে যাহা তাহা করিয়া থাকি। যাহা ভাল লাগে তাহাই আবশ্যক ও উপযোগী বোধ হয়, এবং তাহাতে আপাততঃ লোকের নিকট বাহবা পাইলেও কিন্তু সাধকের বস্তুতঃ তাহাতে কোন ফলই সিদ্ধ হয় না। ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে অর্জ্জুনের ক্ষণিক বৈরাগ্য উদয় হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা যে অস্থায়ী ইহা অর্জ্জুন স্বয়ং না বুঝিলেও অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাহা বিশেষ বুঝিয়া-

---

* কাশীতল বাহিনী গঙ্গার তটে উপবিষ্ট ভক্ত মণ্ডলী মধ্যবর্ত্তী জনৈক জিজ্ঞাসু কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসাকালে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের কথিত উপদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ছিলেন, তাই অর্জ্জুনকে তাঁহার ক্ষাত্র প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুনও যে প্রথমে আপনার প্রকৃতিগত সামর্থ্য বুঝিতে পারেন নাই, ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ তাঁহার পুনরায় যুদ্ধোদ্যমেই তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। আমরা অনেক সময় সদুপদেশের অনুসরণ না করিয়া প্রবৃত্তি পরিচালিত হই বলিয়া পরিণাম বিরস ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যাহার যাহা ভাল লাগে না, অন্যের পক্ষে কঠিন হইলেও তাহার পক্ষে তাহা ত্যাগ করা কিছুই শক্ত নয়। সুতরাং যাহার গৃহপরিজনে আস্থা নাই, তাহার সংসার ত্যাগে ক্লেশ কোথায়? যাহারা সংসারী, তাহারাই ইহা বড় কঠিন মনে করিয়া থাকে। লোকের সংস্কার সন্ন্যাসী বড় ক্লেশ ভোগ করেন, কিন্তু যাহার সংসারে আসক্তি নাই, তাহার পক্ষে সংসার ত্যাগ অতীব সহজ, ভূতলে শয়ন ও ভস্ম লেপন বা কৌপীনধারণ তাঁহার অতি প্রীতিপদ। আবার যাহার সন্ন্যাসীর সাজ সন্ন্যাসীর কাজ ভাল লাগিল বলিয়া সংসারে বিরক্তি, তাঁহার ত আসক্তি সম্পূর্ণই রহিয়াছে, বৈরাগ্য তাঁহার কোথা! সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসের প্রতি ভালবাসা হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ, কিন্তু একদিকে আসক্তি আছেই। আমার অম্ল ভাল লাগে না, সুতরাং খাই না, ইহা আর কঠিন কি? আর তিক্ত খাইতে আমার ভাল লাগে তাই খাই, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক আসক্তি বুদ্ধিতে সংসারী বা সন্ন্যাসী হওয়া উভয়ই প্রবৃত্তির কার্য্য, প্রবৃত্তি সদা পরিবর্ত্তনশীলা, এই জন্য স্থায়ী ফলের আশাও অতি অল্প। ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই অনাসক্ত বুদ্ধি না হইলে বাস্তবিক বৈরাগ্য হয় না, অর্থাৎ যিনি সম্মানিত হইলেও সুখ-বোধ করেন না, আবার অসম্মানিত হইয়াও যাহার ক্লেশবুদ্ধি হয় না, তিনিই প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ পুরুষ। যিনি ভোগ-ত্যাগী ও ত্যাগ-ত্যাগী তিনিই প্রকৃত বিরাগী। যিনি—কভী এওল খানা, কভী মুঠী ভর চনা, কভী ওভী

মনা—এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই সদা সমসন্তোষযুক্ত থাকেন, তাঁহারই বৈরাগ্য প্রকৃত পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে বলিতে হইবে। শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ মাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ আদর্শ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। অতুল জ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠদেবের ন্যায় জ্ঞানবান্ মহাত্মাও পুত্র শোকে ক্ষুব্ধ ও আপনাকে পাশবদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত! মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসও শুক বিরহে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তবে কি এ বৈরাগ্য অসম্ভব? আমরা বলি বিচার বুদ্ধি দ্বারা চেষ্টা করিয়া বৈরাগ্য সাধন করিলে তাহাই বটে; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হইবার আরও একটি অতি সহজ উপায় আছে। তাহাতে সাধক প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, অথচ অবশেষে দেখিবেন, অনায়াসেই তাঁহার অতি কৃচ্ছসাধ্য কার্য্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে সহজ উপায় কি? জীব মাত্রেরই অনুরাগ বুদ্ধি আছে, আমরা কিছু না কিছু ভাল না বাসিয়া থাকিতেই পারি না; সুতরাং যদি ভাল বাসিতেই হইল, তবে এমন কাহাকেও ভালবাসি, যাহাতে ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই অনাসক্তি জন্মাইয়া যায়, ইহাই সহজ সাধন। যাহার অপেক্ষা আর কিছু সুন্দর পদার্থ জগতে নাই, মন একবার তাঁহার ভাবে মজিলে জগতের আর কোন পদার্থই তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। যে একবার সন্দেশের স্বাদ পাইয়াছে, তাহার কি আর গুড় ভাল লাগে? অনুরাগ আসক্তির ভিতর দিয়া ভগবানে ভালবাসা জন্মিলে বিনা চেষ্টাতেই বিষয় ও বৈরাগ্যে বিরক্তি আসিয়া যায়, কিছুই যত্ন করিতে হয় না, তাই ভগবানের শরণাগত হইয়া সাধন বড় সহজ। দুর্ব্বল জীব আমরা আমাদের কোনই শক্তি সামর্থ্য নাই, এই টুকু মনে হইলেই ভগবানের শরণাগত হওয়া আমাদের পক্ষে অতি সহজ। আর যত গোল আমাদের নিজের বল বুদ্ধির দ্বারা বিষয় হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা। যিনি বাঁধিয়াছেন, তাঁহার শরণাগত না হইয়া নিজের চেষ্টায় বন্ধন মুক্ত হইতে

গেলেই গোল বাধিয়া যায়, বন্ধন না খুলিয়া বরং আরও কসিয়া আঁটিয়া যায়, পদে পদে ভ্রান্তি বশতঃ পতিত হইতে হয়। এই জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অনুরাগের ভিতর ভগবদ্ভাব মিশিলেই বিষয়াসক্তি মন হইতে আপনিই বাহির হইয়া যায়। একবার গুপ্তপাড়ার শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবায়েত কোন দণ্ডী স্বামী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া জ্বরের উত্তাপে তাঁহার ভয়ানক গাত্রদাহ ও পিপাসা হইলেও কবিরাজগণ তাঁহাকে তৃষ্ণার জল দিতে নিষেধ করিলেন, এ দিকে শান্তিপুর হইতে ডাক্তার আসিয়া রোগীর ইচ্ছানুরূপ, এমন কি, ডাবের জলের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু বমনকারক ঔষধও মিলাইয়া দিলেন। ডাবের জল পাইয়া রোগীর আহ্লাদের সীমা রহিল না, খাইবা মাত্রই পিপাসা মিটিয়া গেল, আবার পরক্ষণেই ঔষধের গুণে ডাবের জল ও পিত্তাদি সমস্তই উঠিয়া গিয়া রোগীর শান্তি বিধান করিল। এইরূপে ভালবাসার সহিত ভগবদ্ভাব মিশিয়া গেলে মন হইতে বিষয়াশক্তি সহজেই দূর হইয়া যায়; কিন্তু লোকে বৃথা গণ্ডগোল করিয়া ভগবানের অনুগ্রহ লাভ এতই কৃচ্ছ্র ও কষ্ট সাধ্য বুঝাইয়া দিয়া থাকে, এত ভিন্ন ভিন্ন পূজা, পাঠ, এত ভিন্ন ভিন্ন জপ, যজ্ঞের অবশ্যাবশ্যকতা আসিয়া পড়িয়াছে, যে জীব শুনিবামাত্রই নিরাশ হইয়া যায়, বাহ্য ব্যাপারের বিরাট ব্যবস্থায় তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুঃসাধ্য বোধে ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যায়, সে একবার ভাবিয়াও উঠিতে পারে না, যে তাহার ন্যায় একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর পাপ ভগবানের কৃপাকটাক্ষের নিকট গণনার মধ্যেই নয়। আমার ন্যায় নগণ্য জীবের কল্যাণ সাধন করা ভগবানের এত কঠিন নয়, যে

তজ্জন্য আমাকে আবার পুরাণায়মান পুঁথি পড়িতে হইবে, যোগ সমাধি করিতে হইবে, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার পরিমাণের নিরূপণ করিতে হইবে। আর তাহার সম্ভবই বা কোথা? আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাঁহার পূর্ণাবয়ব কিরূপে পরিদৃষ্ট হইবে, ক্ষুদ্র একটি ঘটিতে গঙ্গার সমস্ত জল কিরূপে আসিবে? সুতরাং পিপাসা মিটাইতে হইলে জলে একবার নামিলে স্নান পান উভয়ই সিদ্ধ হইবে, বাহ্যাভ্যন্তর সুশীতল হইবে। আমি নিজে চাহিয়া লইলে আর কয়টি অভাব পূর্ণ হইবে? কেন না আমি যে নিজের কি কি চাই তাহাই জানি না। ভগবান্ ভাল বুঝিয়া যাহা আমাদের মঙ্গলের সমস্তই দিবেন। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদিগকে তাঁহার চরণ সেবার উপযোগী করিবার জন্য দরকার, সে সমস্তেই তিনি আমাদিগকে শোভিত করিবেন। আমরা কেবল নিজে নিজে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইব। কাম ক্রোধাদি * কোন দোষের দিকেই তাকাইয়া আমাদিগকে ভীত বা পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না। আমরা একটী একটী করিয়া কয়টী দোষেরই বা সংশোধন করিতে পারিব। কিন্তু একবার তাঁহার অলোকসামান্য রূপ দেখিলে ইতর সমস্তই কুৎসিত দেখাইবে, তাহাতে আর মন মজিবে

* লোকে কামাদিকে রিপু বলিয়া বর্ণনা করে, অথচ কার্য্যকালে তাহাদিগের সহিত পরমমিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রহ্মাদি জয় সংরূঢ় কামের প্রতি শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিলে, একবার অশ্রদ্ধা করিলে আর কি কাম আসিয়া থাকে? কিন্তু কামের আগমন কালে লোক সকল বিচিত্র বেশ-ভূষায় শোভিত হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকে, সুতরাং কাম আসিবে না কেন? আর মনুষ্যের কি সামর্থ্য যে কন্দর্পের ন্যায় প্রতাপী পুরুষকে পরাভূত করে? সুতরাং দীন হীন কাঙ্গালের ন্যায় রিপুদলের দর্শনে ভীতি চকিত হইয়া ভগবানেরই চরণপ্রান্তে ছুটিয়া যাও, তাঁহার আশ্রয়ে কেহই আক্রমণ করিতে পারিবে না। সে শক্তিতে সকলেই পরাভূত হইবে। জলে অবগাহন করিলেই সর্ব্ব উত্তাপ একেবারে শীতল হইয়া যাইবে।

না। ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইবামাত্রই আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমস্ত পাপেরই অবসান হইয়া যাইবে। গঙ্গাজলে নামিলেই ময়লা মাটি সমস্তই ধুইয়া যায়, সুতরাং গঙ্গায় নাইবার আগে আর গা ধুইবার বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। ভগবৎ-চরণে শরণ লইলে সমস্ত দোষই দূর হইয়া চিরদিনের অভাব বিনষ্ট হয়, এবং জন্ম জীবনের সমস্ত সার্থকতাই সিদ্ধ হইয়া যায়। যাঁহার আদি অন্ত ভাবিয়াও পাওয়া যায় না, তাঁহাকে নিজ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণের বৃথা চেষ্টা না করিয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যাও, আশা মিটিবে তবুও অন্ত পাইবে না, বিষয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না, বৈরাগ্যের উগ্রমূর্ত্তি আর দেখিতে হইবে না, উহা ভগবৎকৃপায় স্বতএব তোমার চরণ চুম্বন করিবে। যত পরিমাণে ভগবানে অনুরাগ জন্মিবে বিষয়ে তত পরিমাণে বৈরাগ্য হইবে।

—o—

তুমি কে ?

মানব! তুমি বিচিত্র বিশ্বশোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। জগন্মোহিনীর মায়া-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছ। কোথায় ও কোথা হইতে আসিয়াছ—কি জন্য দেহ পরিগ্রহ করিলে, তোমার ও এই পরিদৃশ্যমান জগতের পরিণাম কিরূপ, তাহা একবারও ভাবিলে না, ভাবিলেও সিদ্ধান্ত স্থলে পৌঁছিবে কি না তাহা কে জানে? নিয়ত আত্ম ও পর-ভেদে বিব্রত রহিয়াছ, কিন্তু আত্ম-ভাবনায় ভাবিলে না তুমি কে। তুমি কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও শিষ্য, কাহারও বন্ধু বলিয়া নিশ্চিন্ত আছ; কাহারও পিতা, কাহারও পতি, কাহারও গুরু বলিয়া অভিমান করিতেছ; কখনও ধনী, কখনও জ্ঞানী, কখনও মানী মনে করিয়া উন্মত্ত; কখনও শোকে, কখনও তাপে, কখনও রোগে ক্ষুণ্ণ; কখনও নিন্দায় ক্ষুব্ধ, তাড়নায় স্তব্ধ ও স্তবে উল্লাসযুক্ত হইয়া বিবিধ বিকারগ্রস্ত হইতেছ; কিন্তু একবারও ভাবিলে না, তুমি কে! তুমি কখনও আপনাকে দেহী, কখনও বালক, কখনও যুবা, কখনও বৃদ্ধ মনে করিতেছ, কখনও আপনাকে স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবের অন্যতম স্থির করিতেছ, কখনও শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, বা ব্রাহ্মণ-বর্ণে আপনাকে বরণ করিতেছ, কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী, কখনও যোগী মনে করিয়া আপনাকে অবস্থা বিশেষের অধীন করিয়া রাখিতেছ, কিন্তু একবারও ভাবিলে না স্বরূপতঃ তুমি কে। তুমি কখনও আপনাকে দরিদ্র বোধে অশ্রুবিসর্জ্জন, কখনও বিপন্ন বোধে উদ্ধার প্রার্থনা, কখনও পরাধীন জ্ঞানে দুঃখ প্রকাশ, কখনও বদ্ধ জানিয়া মুক্তির ইচ্ছা করিতেছ; কখনও আপনাকে বীরাগ্রগণ্য, কখনও ধীমান্, ধীর ও ধন্য, কখনও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছ, কিন্তু একবারও ভাল করিয়া ভাবিলে না, বস্তুতঃ তুমি কে।

তুমি কন্দর্পবাণে অভিভূত হইয়া রমণী সম্ভোগে উদ্যত, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পরপীড়নে সমুত্তেজিত, লোভগ্রস্ত হইয়া পরদ্রব্যাপহরণে অগ্রসর হইতেছ, মোহতিমিরে অন্ধ হইয়া কাহাকেও আপনার, কাহাকেও পর, বিষয় মদে মত্ত হইয়া ত্রিজগৎ তৃণবৎ তুচ্ছ, এবং পরস্ত্রীদর্শনে কাতর হইয়া উদ্বেলিত চিত্তে ক্লেশ পাইতেছ। কিন্তু দিব্যজ্ঞানে পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলে না এতাবৎ কি, ও আপনিও ভাবিলে না তুমি কে? তুমি সামান্য বুদ্ধিতে কেন অহঙ্কার করিতেছ? যাঁহার সমক্ষে পৃথিবী একটী ধূলিকণা, সূর্য্যমণ্ডল একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তুল, অগাধ সলিলরাশি গোষ্পদ জল, সেখানে কি তোমার ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্র প্রাণ গণনীয় হইতে পারে? সেখানে কি তোমার সত্তা দৃষ্টিগোচর হয়? তুমি তাঁহার ধূলিকণার একটী সূক্ষ্ম পরমাণুর কিয়দংশ বই ত নও, সেখানে আবার তোমার অহঙ্কার কিসের? তাঁহার দিগ্দিগন্তব্যাপী অনন্ত জ্বলন্ত চক্ষের সমক্ষে তুমি কে? অহং মমেতি বৃথাভিমান পরিত্যাগ কর, জড় ও চৈতন্যের সত্তা পৃথক ভাবে অনুভব করিতে শিক্ষা কর, সদ্গুরূপদেশরাশি, বিনীত মস্তকে ধারণা কর, অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষাদি নিষেধ করিয়া নির্ম্মল ভাবে দর্শন কর, তুমি কে। তুমি সংসাররূপ দীর্ঘদুঃস্বপ্নদর্শনে ভীত হইয়াছ, মায়ার মোহন রূপে বিমোহিত হইয়াছ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ তিন স্থূল আবরণে নেত্র আচ্ছাদন করিয়াছ, সূক্ষ্মরূপ পরিহার পূর্ব্বক স্থূল দেহ পরিগ্রহ করিয়াছ, এক্ষণে আর আপনাকে আপনি চিনিতে পারিতেছ না। এখনও সময় অতীত হয় নাই, এই বেলা আত্ম-তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া চিনিয়া লও, তুমি কে। সাধুগণকে জিজ্ঞাসা কর, শাস্ত্রানুমোদিত সত্য অন্বেষণ কর, বাহ্য ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া গভীর যোগসাগরে অবগাহন কর, রাগ দ্বেষাদিকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে পলায়ন কর, তথাকার নিত্যানন্দ-নিকেতনের পুরোভাগে সুশোভিত অখণ্ড নির্ম্মল দর্পণে (বিশুদ্ধ সত্ত্বা) অবলোকন কর,

বুঝিতে পারিবে তুমি কে। আপনাকে না জানিয়া তুমি কাহার সুখের জন্য ধর্ম্মসাধন করিবে? কাহার বন্ধন মোচনের জন্য জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে? প্রথমে বিচার করিয়া তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া দেখ, তোমার দুঃখ বা বন্ধন আছে কি না; মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া এই মায়া-রচিত দুঃস্বপ্ন দর্শনে "আমি জাত" "আমি মৃত" "আমি যুবা" "আমি বৃদ্ধ" "আমি দুঃখী" "আমি বদ্ধ" ইত্যাদি বোধে বৃথা রোদন করিও না, একবার জাগরিত হইয়া দেখ তুমি কোন্ অবস্থায় আছ, এবং স্বরূপতঃ তুমি কে। নিজ নাভি-সৌরভমুগ্ধ মৃগের ন্যায় স্বাত্মানন্দের উদ্দেশে দেশে দেশে পর্য্যটন করিও না, সর্ব্বত্রই আত্মসত্তা বর্ত্তমান, অভিনিবিষ্ট চিত্তে গুরুমন্ত্রে আত্মযোগ সাধনা কর, বন্ধন, মুক্তি তোমার উপহাসের কথা বোধ হইবে, আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, সুখের পরিসীমা থাকিবে না। হে মানব! তাই বারংবার বলি, জানিয়া লও তুমি কে। সুযোগ সহযোগে যখন আত্মময় জগৎ দেখিবে, তখন সকলকে আহ্বান করিয়া পরিচয় দিও তুমি কে। তখন আর কাহারও সংশয় থাকিবে না, ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হইবে, জগৎ আনন্দালোকাকীর্ণ হইয়া যাইবে। যে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে এই মাত্র বলিয়া দিবে যে দেখিয়া লও "তুমি কে।"

—o—

জীবের নিদ্রাভঙ্গ।

জন্মাবধি আমি সংসার-সুখে আসক্ত। কেননা সংসার ভিন্ন আর কোন সুখদ সামগ্রী আমি কখন দর্শন করি নাই। এই সুখের সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই নিদারুণ বার্ত্তা স্মরণ করিলেও মন চিন্তাকুল ও ভয়বিহ্বল হইয়া উঠে। সংসারের বিচিত্র মোহিনী মূর্ত্তি, ভোগবিলাসের রমণীয়তা শৈশব হইতেই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। আমি সংসারের দাস হইয়া সংসারের অনুগত থাকিয়া আপনার জীবনকে সুখী মনে করি। আমার প্রাণ হইতেও সংসারকে আমি অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। যখন মনে হয় যে এই বিস্তৃত গৃহ অট্টালিকা উদ্যানাদি ভূসম্পত্তির আমিই এক মাত্র অধিপতি, তখন আমার হৃদয়ে আত্মগৌরব আর ধরে না; যখন ভাবি যে এই পরম রূপবতী যুবতী আমার সহধর্ম্মচারিণী হইয়া জীবন যৌবন আমারই সুখ সংবর্দ্ধনে ও পরিচর্য্যায় উৎসর্গ করিয়াছেন, যখন দেখি অপত্যগণ বেশভূষা ও ভোজনাদির জন্য একমাত্র আমারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যখন অবলোকন করি যে ভৃত্য ও পরিচারিকাগণ বিনীত ও সতর্ক ভাবে আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছে, যখন দেখি রথ, গজ, বাজি-রাজি আমারই জন্য দ্বারদেশে সুসজ্জিত, তখন আমার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে। যখন আমার বিদ্যা ও যশঃকুসুমের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইয়াছে জানিতে পারিলাম, যখন আমার সাধারণ জন-সমাজে অনুষ্ঠিত কার্য্য-কলাপ রাজ-দ্বারে সম্মানিত হইতে লাগিল; যখন শত শত লোকের মুখে আমার প্রশংসা-ধ্বনি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, সে দিন আমি সুখের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলাম। সংসার আমাকে এই রূপে নানা সম্পদ্-সুবাসিত কুসুম-শয্যায় শোয়াইয়া সমাদর পূর্ব্বক সুখনিদ্রায় অভিভূত করিয়া দিল। আমি

মনের অনুরাগে, কল্পনার বেগে কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, হৃদয়ে যেন সুধাবৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু হা! অকস্মাৎ আমাকে কে ডাকিল! আমার সুখের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। এখন বিষয়-সম্পদের কোমল শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইতেছে; সুখময় সংসার যেন বিষম বিষধরবৎ আমাকে দংশন করিতেছে; ভোগ বিলাস বিকট বেশে আমাকে ভয় প্রদর্শন ও তাড়না করিতেছে। চিরদিনের আনন্দ-ক্ষেত্রকে যেন আজ উষর ভূমি বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। আজ সম্মানকে পূতিগন্ধের সমান, আত্ম-গৌরবকে ঘোর রৌরব মহানরক তুল্য ও প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা সদৃশ বলিয়া ঘৃণা বোধ হইতেছে। আজ বাস-ভবন কারাগার ও স্ত্রী পুত্রাদি তাবৎ সামগ্রী একত্র সববেত হইয়া যেন আমার বন্ধন-শৃঙ্খল রচনা করিয়াছে এই রূপ অনুমান হইতেছে। হাঃ! আমার সুখ-স্বপ্নসমাকুল নিদ্রা কে অকস্মাৎ ভঙ্গ করিল, কাহার পাষাণভেদিনী সুমধুর বাণী আমার কঠোর হৃদয়ের মর্ম্ম-দেশে প্রবেশ করিয়া আমাকে জাগরিত করিল!

অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী দর্শনে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। হায়! চৈতন্য দান করিয়াই আবার তিনি কোথায় লুকাইলেন আর দেখিতে পাইলাম না! মন তাঁহারই জন্য পাগল হইল। তাঁহাকে না দেখিলে আর থাকিতে পারিতেছি না। সে রূপের আদর্শ নাই; সে মধুর বাণীর উপমা নাই। তিনি বিদ্যুদ্বৎ প্রকাশিত হইয়াই আমাকে সচেতন করিয়া কোন্ লীলা পটের অন্তরালে লুকাইলেন, আর তাঁহার তত্ত্ব পাইতেছি না। সংসার আমাকে বারংবার বলিতেছে যে উহা তোমার অমূলক চিন্তা—তোমার কল্পনা মাত্র—উহা স্বপ্নোচ্ছাসের একটী চঞ্চল তরঙ্গ। কিন্তু এই প্রবোধ বাক্যে আমার মন মানিতেছে না, আর মানিবেও না। আমার মন সেই মোহন মূর্ত্তির আশ্চর্য্য মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়া গিয়াছে; আমার প্রাণ তাঁহার দর্শনার্থ আপনাকে

উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে। আত্মা তাঁহাকে ছাড়িয়া 'আর এ দেহে থাকিতে চাহে না। হায়! এক্ষণে কোথায় গেলে তাঁহার দর্শন পাইব। কে আমাকে তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া দিয়া চিরদিনের মত কৃতার্থ করিবে !!

সংসার! তুমি আর আমাকে তোমার অপবিত্র হস্তে স্পর্শ করিও না। যিনি আমাকে ডাকিয়া জাগরিত করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট যাইব। তাঁহার অমৃত নিঃস্যন্দিনী বাণী স্মরণে আমার এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, আর তোমার মায়া-বিস্তারিত বিষয়-শয্যা সুখকর বোধ হইতেছে না। আমি চলিলাম। সংসার! তোমার নিকট চিরদিনের মত বিদায় লইলাম।" আজি সেই মনো-বিমোহন মহাপুরুষের স্বর লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলাম।

যাঁহারা কেবল তাঁহারই কথা কহিবেন, আজ হইতে তাঁহাদেরই কথা শুনিব। যে পুস্তকে কেবল তাঁহারই গুণানুবাদ ও নিগূঢ় তত্ত্ব লিখিত থাকিবে, তাহাই পাঠ করিব, যেখানে জাগরিত পুরুষবর্গ তাঁহার সহিত সদালাপ করিতেছেন, সেই স্থানেই গমন করিব। যেখানে তাঁহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনার্থ কোন পবিত্র অনুষ্ঠান হইতেছে, সেই স্থানে বিশ্রাম করিব। যাঁহারা লোকলজ্জা তুচ্ছ করিয়া অসীম সাহসে উচ্চ নিনাদে তাঁহার সমাচার প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের শরণাগত হইয়া সেই প্রিয়-তমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিব। আমি কখনও বনে বসিয়া তাঁহাকে মনন করিব, কখন বা পর্ব্বত কন্দরবাসি ঋষিগণের নিকট গিরি গাম্ভীর্য্য সহ তাঁর আশ্চর্য্য মহিমা অনুধ্যান পূর্ব্বক তাঁহার অগাধ গম্ভীর সত্তায় ডুবিয়া যাইব, কখন কখন বন কুসুম রাজিতে তাঁহার প্রসন্ন বদন বিলোকন করিব, কখন গিরিনিঃসৃত নির্ম্মল নীর নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকিরণ মিশ্রিত লহরী-মালার মধ্যে তাঁহার মধুর হাস্য দর্শন করিব,

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও মহিমা দেখিব, কখন পিক কোকিল কুজনাদির মধ্য হইতে তাঁহার স্তুতি পাঠ শুনিয়া শ্রবণ শীতল করিব, কখন সমুদ্রের নীল-নীর নিনাদে তাঁহার ত্রিভুবন শাসন বাক্য আকর্ণন করিব, কখন বা তাঁহার ভাবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিব।

সংসার! আর তোমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইব না। যে দেশে সন্ধ্যা নাই, শর্ব্বরী নাই, যেখানে নিদ্রা নাই, স্বপ্ন নাই, যেখানে তাপ নাই, বিক্ষেপ নাই, আমি সেই দেশের লোক পাইয়াছি। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। যাঁহার মধুর স্বর ও যাঁহার অপ্রার্থিত কৃপা আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল, হা! সেই প্রিয় সখা এক্ষণে কোথায়! আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম।

প্রাণ সখে! যদি দয়া করিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করিলে, তবে হস্ত ধারণ করিয়া তোমার অমৃতধামে লইয়া চল। তুমি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না। শুনিয়াছি তুমি নাকি ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া তাহার সহচর হইয়া থাকে। তুমি সাধুদিগের সর্ব্বস্ব ধন। তোমার মহিমা অপার! দীনবন্ধো! দুঃখী দেখিলে তুমি দয়া করিয়া থাক, দেশে দেশে সাধুদিগের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া আজ তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অভয় পদে স্থান দান কর। হে হরে! তোমার পাষাণ ভেদী স্বরে সংসার স্বপ্ন সংকুল মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। এক্ষণে অন্তর্যাগে জাগরিত থাকিয়া তোমার পরম পদ পীযূষ পান করিব। হে অভীষ্ট ফলদাতা! আমার আশা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরিঃ ওঁ।

---o---

আমার।

কি দৈব লগ্নে যে "আমার" এই কুহকময় শব্দটী সংসারি মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছে, তাহা দেব দানব মানব কাহারই বুদ্ধি স্থির করিতে পারে না। যেমন পৌরাণিক "অনন্তদেব" শতশীর্ষে পৃথিবীর ভার রক্ষা করিতেছেন, তদ্রূপ "আমার" এই শব্দটীর উপর পৃথিবীর তাবদ্ব্যাপার, তাবৎ কার্য্যের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। "আমার" এই শব্দে যে কি মোহন গুণ আছে, কি আশ্চর্য্য কুহকময়ী মাধুরী যে ইহা হইতে বিনির্গত হইতেছে, তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। "তোমার" শিশু অতি রূপবান্ হইলেও "আমার" চিত্ত সহসা আনন্দিত হয় না, কিন্তু "আমার" পুত্র যদি কদাকারও হয় তবে বারংবার দেখিয়াও নয়নের পরিতৃপ্তি জন্মে না। যে কার্য্যটী "তোমার" জন্য সাধিত হইবে, তাহা সামান্য হইলেও অতিশ্রম সাধ্য ও ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ ক্লেশ সাধ্য কার্য্য "আমার" এরূপ বোধ হইলে প্রাণপণে সংসাধন করিলেও বিশেষ ক্লেশ বোধ হয় না। কোন দ্রব্য "তোমার" অধিকারে থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয়, তবে কিছু মাত্র দুঃখ নাই, কিন্তু যখন সেই দ্রব্য "আমার" বলিবার অধিকার পাই, তখন যত্ন আদরের সীমা থাকে না। আজ যাহা "তোমার" বলিয়া তাহার নিন্দা ঘোষণা করিয়া থাকি, পরদিন তাহাই আবার "আমার" হইলে মুখে আর প্রশংসা ধরিবে না। "তোমার" গুণ, "তোমার" বিদ্যা, "তোমার" যশ অল্পক্ষণ শুনিতেও মনে বড় ক্লেশ হয়, কিন্তু তাহা "আমার" হইলে চিরদিন অবিচ্ছেদে শুনিলেও অক্লান্ত চিত্ত কাতর হয় না। তোমার হস্তে একটী স্বর্ণাঙ্গুরীও আমার দুগ্রাহ বোধ হয়, কিন্তু "আমার" হইলে নাসা-কণ্ঠ আদি ছেদ করিয়াও গুরুভার স্বর্ণরাশি আনন্দসহ বহন করিতে পারি। মনুষ্য যদি কোন পাঁচ হস্ত পরিমিত ভূমিকে "আমার"

বলিতে না পায়, তবে তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ জন্য দায়ী হইতে বিরক্ত হয়, কিন্তু আবার সমস্ত পৃথিবীকে যদি "আমার" বলিবার অধিকার পায়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রাণপণে সুবিস্তীর্ণ ভূভাগেরও উন্নতি জন্য চেষ্টা ও যত্ন করে।

"আমার" এই অদ্ভুত শব্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াই মাতাপিতাকে গ্রাস করে; দেখিতে দেখিতে ভাই ভগিনীগুলিকে গ্রাস করে; অবসর পাইলেই স্ত্রীপুত্র কলত্রবর্গকে গ্রাস করে, আবার গৃহ, উদ্যান, ঘাট, পথ, বাজারও গ্রাস করিতে ক্রটী করে না, ক্রমে অন্যের ধন সম্পত্তি রাজ্য আদি সমস্ত গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হয়, ত্রিভুবন গ্রাস করিলেও "আমার" উদর পূর্ত্তি হয় না। এই মায়া রাক্ষসরূপধারী "আমার" শব্দটী কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্তকে কুহক জালে বিমোহিত করিয়াছে। ইহার বিকটমূর্ত্তি কাহারই নয়নগোচর হয় না। যদি কাহারও ভাগ্য বলে নয়ন মল পরিষ্কৃত হয়, তবে তিনিই কেবল এই "আমার" শব্দের ভয়ঙ্কর মায়ারূপ দর্শনে শঙ্কিত হয়েন। তিনি অমনি অভিভূত চিত্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘোর গহন বিপিন মধ্যবাসী বা দুর্গম গিরিকন্দরস্থিত ধ্যানস্তিমিত নেত্র দনুজদর্পহারীর শরণাগত মহাত্মগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। "আমার" এইশব্দ তাঁহাদের বিষয় বিমুক্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে আমার হৃদয়ে "আমার" এইশব্দ এত প্রীতিকর কেন? আমার হৃদয় "আমার" শব্দের কুহকে বিমুগ্ধ হইয়াছে! কিন্তু হায়! যাহাকে আমি "আমার" বলি সেত "আমার" হয় না! আমি যে বস্তুকে আমার বোধে যত্ন করি তাহাই কালের গুপ্ত গৃহের জন্য সঞ্চিত হইতে থাকে মাত্র। "আমার" বুদ্ধিই আমার সর্ব্বনাশ করিল! বাস্তবিক কি তবে "আমার" কেহই নাই? বুঝিলাম "আমার" বলিতে যিনি আছেন, আমি "তাঁহার" হইতে চাহিনা বলিয়া তিনি "আমার" নহেন। "আমার" কুহকে পড়িয়া আমি আমার বস্তুকে চিনিতে পারিলাম না। শাস্ত্রে বহুল সকলই

"তাঁহার", আমি ভাবি এ সকল "আমার"। যদি এই সামান্ত সুখ দুঃখ ধন পুত্র কায়াদি "আমার" বলিতে এত আনন্দোদয় হয়, তবে যদি একবার সরল চিত্তে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার তাঁহাকে "আমার" বলিতে পারি, না জানি তাহা হইলে কি অপূর্ব্ব আনন্দেরই অভ্যুদয় হয়!

—o—

দুর্লভ কি।

যাহা অনায়াসে লাভ করা যায় না, তাহাই পাইবার জন্য লোকের অত্যন্ত আগ্রহ ও চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে যাহা পায় না, তাহাই পাইতে চায়, যাহা দেখে নাই তাহাই দেখিবার জন্য ব্যস্ত, যাহা কখনও শ্রবণ করে নাই; তাহাই শুনিতে একান্ত অভিলাষী। মন যাহা পাইয়াছে তাহাতে পরিতৃপ্ত নহে, মনের গতি অব্যাহত। মন তৃষ্ণায় অধীর হইয়া কখন পাতালপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তথাকার রত্নমালা সংগ্রহ করিতে চায়, কখন নীল নভোমার্গে উড্ডীন হইয়া নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভ্রমণ করিতে চায়, কখন বা চুমুক দিয়া চন্দ্রের সুধারাশি পান করিতে চায়, কখন সূর্য্যমণ্ডলকে দীপ করিয়া অলক্ষিত জগতের তত্ত্ব নিরীক্ষণ করিতে যায়, কখন ধূমকেতু ধরিয়া পৃথিবী পরিমার্জ্জিত করিতে চায়, কখন বা রাহুকেই গ্রাস করিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে নিরুপদ্রব করিতে যায়, কখনও বা সূর্য্যকে কিরীটে বসাইয়া চন্দ্রের তিলক করিয়া ও নক্ষত্রের মালা পরিয়া পৃথিবীতে আসিতে চায়, কখন বা বনে, কখন বা পর্ব্বতে, কখন নদীতটে, এইরূপ নানা দিগ্দিগন্তে ধাবিত হইয়া কোথায় কি দুর্লভ আছে, তাহাই লাভ করিতে চায়। যাহা দুর্লভ তাহা পাইলে জীবের আনন্দের সীমা থাকে না। দুর্লভ হইলেই যে দ্রব্যের অধিক মর্য্যাদা হইবে, তাহা নহে, অনাবশ্যক পদার্থ অলভ্য হইলেও তাহার মূল্য নাই। অবস্থা বিশেষে, সময় বিশেষে অনেক দ্রব্যই দুর্লভ হয়, কিন্তু সর্ব্বথা দুর্লভ কি, আজ তাহাই বিচার্য্য। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা,

আত্মানাত্ম-বিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শত-জন্ম-কোটি-সুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে ॥

জীবগণ বহু চেষ্টা, যত্ন ও ক্লেশ করিয়া যতই দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করুক না, মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে হইলে তৎসর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রযত্ন করিতে হয়। সংসারের অনেক কার্য্য সাধন করিবার সময় কেবল কায়িক পরিশ্রম, মানসিক আগ্রহ ও আবশ্যকমত উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয় মাত্র কিন্তু মনুষ্য দেহ লাভ করা অতিশয় যত্ন, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অটল সংকল্প সাপেক্ষ। একটী দৈহিক প্রকৃতি পরিত্যাগ করা ও তৎপরে প্রকৃতির মনুষ্যোচিত বৃত্তির দিকে একান্ত আগ্রহপূর্ব্বক প্রধাবিত হওয়া স্বল্পায়াস সাধ্য নহে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মনের ঐকান্তিকী ইচ্ছা যাদৃশ বিষয় ও ব্যাপার আশ্রয় করিয়া থাকে, মরণান্তে জীব তাদৃশ প্রকৃতিতে উপগত হয়। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী পশ্বাদি দেহ হইতে প্রকৃতি স্ফুরণপূর্ব্বক নরাকৃতি লাভ অত্যন্ত দুর্লভ ও সুকঠিন।

নৃশরীরধারী জীবগণ ক্লীব, স্ত্রী ও পুরুষ এই তিন ভাগে বিভক্ত। নরাকার লাভপূর্ব্বক পুরুষ দেহ ধারণ করা কঠোর ব্রত সংযম তপস্যাদির ফল। যাঁহারা স্ত্রী পুরুষ এতদুভয় জাতিকে স্বাভাবিক সকল বিষয়ে সমান অধিকারী মনে করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিজৃম্ভিত নহে। স্ত্রী জাতি স্বাভাবিক বৃত্তি ভেদে পুরুষ অপেক্ষা অনেক নীচ। নারীর কোমল প্রকৃতি জগতের কল্যাণ সাধন করিতে করিতে পুরুষ প্রকৃতির দিকে ধাবিত হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ব্ব প্রকৃতি জনিত স্ত্রী দেহ বিনষ্ট হইয়া পুরুষ ভাবের আবির্ভাব ও পুং দেহের সঞ্চার হইতে থাকে। ক্লীব-জাতি মানবীয় বৃত্তি নিচয়ের অস্ফুটাবস্থার জীব। সেই প্রকৃতি উন্নতাকারে পরিণত হইলে স্ত্রীত্ব ও স্ত্রীত্বের চরমোন্নতি হইলে পুরুষত্ব লাভ হইয়া থাকে; [illegible] প্রকৃতি লাভ নিতান্তই দুর্লভ বলিতে হইবে।

পুরুষ মাত্রেই যে সফল জন্মা মনুষ্য তাহা বলা যায় না, কেননা তন্মধ্যে অনেক পুরুষ পূর্ব্ব সংস্কারজনিত বৃথা কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইয়া পুরুষোচিত কার্য্যে পরাঙ্‌মুখ থাকেন, এবং সামান্য নীচ কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আহার নিদ্রা ও বিবিধ ব্যসনে আসক্ত হইয়া মানবসমাজকে কলঙ্কিত করেন। মনুষ্য-দেহধারীদিগের মধ্যে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ হওয়া আরও সুকঠিন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য শিল্প চাতুর্য্যাদি শিক্ষা ও সভা-বিজয়ী হইয়া মর্য্যাদা পাইবার আশয়ে শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিতে প্রায়ই লোকের আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আত্মশুদ্ধির জন্য পরমার্থ বিদ্যাভ্যাসে কয়জন মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ? হইলেও অনেকে বেদ শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন বটে কিন্তু আচার্য্যের নিকট হইতে তাহার অর্থোপলব্ধি করিয়া লয়েন না, সাধারণ ভাবে ভাষাগত অর্থ বুঝিলেও তাহার গম্ভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে সকলে সমর্থ হয়েন না। বেদ বাক্য উচ্চারণ মাত্রেই শরীর মন আত্মা পবিত্র হইয়া থাকে, এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে বেদের অর্থবোধের আবশ্যকতাও অনুভব করেন না। বেদের প্রকৃত অর্থবোধ আজ কাল দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, কেননা, বর্ত্তমান সময়ে অনেকে বেদার্থ জানিবার জন্য প্রণত শিরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শরণাগত হইতেছেন। তাঁহারা ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্রের সাহায্য মাত্র লইয়া বেদের এক এক প্রকার স্বকপোল কল্পিত বিচিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বেদের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া দিতেছেন। বেদের ঈদৃশ কদর্য্য ব্যাখ্যা শিক্ষা না করিয়া বরং যাঁহারা বেদকে পরম পাবক বোধে তাহা আবৃত্তি মাত্র করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধন্য। তাই বলিতেছি, আজ কাল বেদার্থ প্রকৃত রূপে বোধ হওয়া নিতান্ত দুর্লভ। বেদার্থ বিদিত হইলেও তদনুসারিণী কার্য্য প্রবৃত্তি আরও দুর্লভ। বিকারাচ্ছন্ন চিত্ত সহজেই ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে চাহে না, তাহাতে আবার যে বৈদিক কার্য্যকলাপে কঠোর ব্রত নিয়ম, সংযম

আদির নিতান্ত প্রয়োজন তাহাতে মন কোন ক্রমেই বাধিত হইতে চাহে না। দেশ কাল পাত্রাদির অবস্থা বিচার করিলে সাধু কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া নিতান্তই সুকঠিন বলিতে হইবে। যদি বা মানবীয় কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ বৈদিক ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্ত থাকেন, তজ্জনিত জ্ঞানের উদয় হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কর্ম্মানুষ্ঠান কালে শাস্ত্রবিধির যদি কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয়, তবে বিশেষ প্রত্যবায় ঘটিবার সম্ভাবনা। ত্রুটি মনুষ্যের পদে পদেই হইয়া থাকে, এজন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল লাভ বা জ্ঞানোদয় হওয়া অতীব দুর্ল্লভ। পুণ্যানুষ্ঠানের দ্বারা মন নির্ম্মল হইলেও আত্মানাত্ম বিচারণা সহজে উদয় হয় না, এই জন্য মহাত্মগণ ইহাকে অতিশয় দুর্ল্লভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যদিইবা শাস্ত্রাদি পাঠ, মহাত্মগণের চরিত্র চিন্তন ও সৎকার্য্যকলাপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে সময়ে সময়ে আত্মানাত্ম-বুদ্ধির বিকাশও হয়, কিন্তু আত্মাকে অনুভব করা আরও কঠিন ও সুদুর্ল্লভ। সমস্ত বিষয় ব্যাপার হইতে চিত্ত একান্ত প্রত্যাহৃত না হইলে ও আত্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একাগ্রতা পূর্ব্বক সমাধি না করিলে আত্মানুভব কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এইরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধন দ্বারা চিদ্রূপ পরমাত্মাতে নিত্য সংস্থিতি রূপ পরামুক্তি লাভ সকল অপেক্ষা দুর্ল্লভ, কেননা উহা শত কোটী জন্ম সদাচার, সৎক্রিয়া ও তপস্যা ভিন্ন কিছুতেই লাভ হইতে পারে না।

দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ-সংশ্রয়ঃ॥

সুখের পরকাষ্ঠা লাভ করিবার জন্য জীবের চিত্ত অনিবার্য্য বেগে ধাবিত। আমরা সাধারণতঃ বিষয়ের আস্বাদ করিয়া যাদৃশ সুখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা প্রকৃত সুখ নহে। কেননা বিষয় সুখে সুখী হইয়াও

মনে দুঃখানুভব করিয়া থাকি। দুঃখের অত্যন্তাভাবই পরম সুখ। যদি অন্যের দুঃখে দুঃখানুভব অথবা অবস্থা বৈগুণ্যে নিজেই শোক, রোগ, তাপ, জরা, জন্ম মরণাদি জন্য দুঃখ ভোগ করিলাম, তবে আমার সুখ কোথায়! এই জন্য মহাত্মগণ বৈষয়িক সুখকে সুখ বলিয়া গণনা করেন নাই। সর্ব্বথা দুঃখের অত্যন্তাভাব হইলেই পরম সুখের উদয় হইয়া থাকে। এই সুখেরই নাম শান্তি, ইহারই নাম মুক্তি। ইহাকেই লোকে পরমার্থ বোধে সেবা করিয়া থাকে। এই পরমার্থ নিতান্ত প্রার্থনীয় হইলেও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ না করিতে পারিলে তাহা সহজে কেহ প্রাপ্ত হয় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পশ্বাদি দেহ হইতে মনুষ্য দেহ লাভ করিতে হইলে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন জন্য অতীব তীব্র চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু পশু হইতে মনুষ্য হওয়া যত কঠিন, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা তদপেক্ষা আরও সুকঠিন। মনুষ্য হইতে দেবতা হওয়া যত কঠিন, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা তদপেক্ষা আরও কঠিন। মনুষ্য দেহ ও তৎপ্রকৃতির একান্ত চিন্তন দ্বারা পশু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া মনুষ্য দেহ লাভের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের প্রকৃতি লাভ করা অতীব দুঃসাধ্য। শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব পাইতে পারে, কিন্তু অনায়াসে প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে না। কেননা সমস্ত ভোগাশা বর্জ্জন করিতে না পারিলে মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। সকাম শুভকার্য্য সাধন দ্বারা মুক্তির পথ আরও দুর্গম হইয়া উঠে। দেব লোকে ঐশ্বর্য্য ভোগে মত্ত হইয়া ভোগাবসানে মর্ত্ত্যলোকে আসিবার উপযুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ধীমান্ পুরুষ কখনও দেবধাম কামনা করেন না। মনুষ্য দেহে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিলেই জীব অনায়াসে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলের বেগ সম্বরণ, রিপুবর্গের বশীকরণ, অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সাধন, সর্ব্বভূতে সম দর্শন, অভিমানের পরিহার

আদি মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপাদান। এতাবৎ ঈশ্বরানুগ্রহের অধীন অর্থাৎ নিজ অহং বুদ্ধিযুক্ত মানবের আয়ত্তাতীত বলিয়া নিতান্ত দুর্লভ। এই মনুষ্যত্ব উপার্জ্জন কালে নানা বিঘ্ন বিড়ম্বনা আসিয়া উপস্থিত হয়, দৈবানুগ্রহ ভিন্ন তত্তাবৎ বিনষ্ট হয় না।

মনুষ্যত্ব লাভ করিলেও মুক্তির অভিলাষ সহজে অভ্যুদিত হয় না। বিষয় ভোগে ক্লেশানুভব ও বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তিই পরম সুখের সামগ্রী, ইহা যত দিন না উপলব্ধি হয়, তাবৎ জীব মহাজিতেন্দ্রিয় যোগীন্দ্র হইলেও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যোগে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া অহং মমেত্যাদি অভিমান বাড়িলেও বাড়িতে পারে, এজন্য অনেক যোগীও মুক্তিভাজন হইতে পারেন না। বিষয় বিরাগ বা বাসনা ত্যাগই মুক্তির প্রধান উপায়। তিনিই মুমুক্ষু, যিনি পার্থিব বাসনা একেবারে জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ। সাধনবলে ঈশ্বরের শুভদৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে না পারিলে সহজে মুক্তির জন্য চিত্ত ধাবিত হয় না। মুক্তীচ্ছা ভগবৎ সাধনা সাপেক্ষ, এইজন্য ইহা পরম দুর্লভ।

মনুষ্য মুমুক্ষু হইলেই যে মুক্তিপদ লাভ করিতে পারিবে তাহা নহে। মহাপুরুষদিগের সহিত সদা সঙ্গ না হইলে মুক্তিপথ প্রদর্শন করিবে কে? ইহা স্বকপোল কল্পনায় লব্ধ হইতে পারে না। সৎপুরুষ সহবাস জীবের সৌভাগ্য সাপেক্ষ। ইচ্ছা করিলেই সাধু দর্শন হয় না। সাধুগণ প্রায়ই নিভৃত স্থানে থাকেন; কখন দৃষ্টিগোচর হইলেও প্রচ্ছন্ন ভাব উদ্ভেদ করিয়া সহজে তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায় না। চিনিতে পারিলেও সহজে নিকটে রাখিতে চাহেন না, নিকটে বসিবার অধিকার পাইলেও তাঁহাদের নির্ম্মল হৃদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

মহাপুরুষ সম্পর্কাৎ সংসারার্ণব লঙ্ঘনে।
যষ্টিং সংপ্রাপ্যতে রাম যথা নৌরিব নাবিকাৎ॥

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন যে, হে রামচন্দ্র! যেমন নদী পারের জন্য নাবিকের নিকট নৌকা লইতে হয়, তদ্রূপ সংসারার্ণব উত্তীর্ণ হইবার জন্য মহাপুরুষের সংসর্গ করিয়া উপায় লাভ করিতে হয়। অতএব সজ্জন সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কেননা, ইহাতে মুমুক্ষুর সাধু কামনা পূর্ণ হয়। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যে ফলোদয় হয়, সজ্জনের সঙ্গ করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইয়া থাকে। কেননা সৎ পুরুষের নিকট থাকিলে তাঁহার বিশুদ্ধ ও বলবতী প্রকৃতি স্ফুরিত হইয়া আমার মলিন ও দুর্ব্বল প্রকৃতিকে অভিভূত করে ও হৃদয়ে নিজ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেয়। অতএব সাধু সঙ্গই সর্ব্বতোভাবে জীবের প্রার্থনীয়। যত কিছু দুর্লভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে সৎসঙ্গ দ্বারা সমস্তই সুলভ হইয়া পড়ে।

—o—

উনি কে !

আমার চারিদিকে অন্তরে ও বাহিরে যিনি ঘন ঘোর নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাঁহার কটাক্ষ সঙ্কেত মাত্রে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হইতেছে, যাঁহার সত্তাপ্রভাবে আমি জীবিত রহিয়াছি, উনি কে ! যিনি চরণশূন্য অথচ সর্ব্বত্র গমন করেন, কর্ণহীন কিন্তু মনের কথা পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন, নেত্রহীন কিন্তু সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন, যিনি আমাকে দেখিতেছেন অথচ আমি যাঁহাকে দেখিতে গিয়া দেখিতে পাই না, উনি কে ! ঐ যে গুপ্তভাবে সকলের সকল সমাচার লইতেছেন, ঐ যে সকলের অগোচরে কেহ কিছু না চাহিতে কত কি দান করিতেছেন, ঐ যে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, পীড়িতকে ঔষধ, ভীতকে অভয় দিবার জন্য শান্তিময় কর প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন, উনি কে ! ঐ যে রত্নমণ্ডিত উষ্ণীষধারী অহঙ্কার, দম্ভ, অভিমানাদি স্বগণসহ যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়া দর্শন না পাওয়ায় অবমানিত হইয়া অবনত মুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, ঐ যে কাম ক্রোধ লোভাদি প্রতারকগণ যাঁহার সমাগম ভয়ে ভীত হইয়া দেশত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে, ঐ যে দুরাশা, বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তি, বেদনা, দুর্ব্বুদ্ধি, আসক্তি প্রভৃতি বারবিলাসিনীগণ যাঁহার আদেশে রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত হইতেছে, সৌম্যমূর্ত্তি উনি কে ! বুদ্ধি যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া, জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া অপারগ হইল, ভাব যাঁহাকে ধারণ করিতে গিয়া, কল্পনা যাঁহার পরিমাণ করিতে গিয়া পারিল না, মন যাঁহাকে দেখিতে গিয়া, আত্মা যাঁহার নিকটে গিয়া আর ফিরিল না, উনি কে ! লোকে যাঁহাকে দেশে দেশে অন্বেষণ

করিয়া প্রাপ্ত হইল না, মায়া যাঁহাকে আবরণ করিতে, গুণ যাঁহাকে আবদ্ধ করিতে, সংজ্ঞা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পরাস্ত হইল এবং বাক্য যাঁহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অবাক্ হইয়া রহিল, উনি কে! যাঁহার আরতি জন্ম তারকারত্ন-মণ্ডিত গগন থালে চন্দ্র সূর্য্য দীপ জ্বলিতেছে, পবন চামর ব্যজন করিতেছে, পুষ্প তরুগণ সুগন্ধি কুসুমরাশি দান করিতেছে, বিহঙ্গ সকল মঙ্গল গাথা কীর্ত্তন করিতেছে, বজ্র ঘোর শঙ্খ নিনাদ করিতেছে, সুর-নর দনুজদল বন্দনা করিতেছে, প্রসন্নবদন উনি কে! ঐ যে রত্নবেদিতে বসিয়া জীবের কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিতেছেন, ভক্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি, করুণা, মুক্তি আদি যাঁহার পদসেবা করিতেছে—বৈরাগ্য, নির্ম্মমত্ব, নিরহঙ্কার, জ্ঞান, বিচার, যোগ, ধর্ম্মাচার প্রভৃতি সুরবীরবর্গ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপসহ যাঁহার বহির্দ্বারে প্রহরিত্ব করিতেছে, ঐ আনন্দ স্বরূপ, উনি কে! ঐ যে মেঘমালা দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে যাঁহার প্রেমানন দেখিবামাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, ঐ যে চপলা যাঁহাকে দেখিবে বলিয়া চঞ্চলা হইয়া ধাবিত হইতেছে, ঐ যে পাষাণহৃদয় পর্ব্বত যাঁহার প্রেম মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমাশ্রু জলে (নদী প্রবাহে) দেশ বিদেশ ভাসাইয়া দিল, ঐ যে অগ্নিকুণ্ড যাঁহার ভাবে বিমোহিত হইয়া বাষ্পাকুল নেত্র হইল, উনি কে! ঐ যে কুসুমাবলি যাঁহার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া উঠিল, ঐ যে তরুগণ নিশার নিহার পাতচ্ছলে যাঁহার মুখ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, ঐ যে বিশ্বশোভা যাঁহাকে দেখাইবার জন্ম সকলকে আহ্বান করিতেছে, উনি কে! যিনি ঐ ভোগবিলাসী ঘোর সংসারী পুরুষকে আপনার জগন্মোহন ভাবে বিমোহিত করিয়া সর্ব্বত্যাগী করিয়াছেন, যিনি ঐ শুষ্কপর্ণভোজী শীর্ণ শরীর তরুতলবাসী তাপসহৃদয়ে উদয় হইয়া উহার নেত্রদ্বয়কে নিমীলিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি ঐ বাহ্যজ্ঞানশূন্য জটাধারী পুরুষের হৃদয়

গুহায় প্রকাশিত হইয়া উহাকে কখন হাসাইতেছেন, কখন অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন, কখন মৌনী করিয়া স্থিরাসনে বসাইতেছেন, কখন বা উচ্চ রবে গান ও নৃত্য করাইতেছেন, প্রেমনিকেতন, উনি কে! ঐ যে ভবসিন্ধুকূলে দণ্ডায়মান হইয়া অভয় চরণ তরণীতে বিনা মূল্যে পতিত তাপিত জীবনগণকে পার করিবার জন্য কর্ণধার হইয়া প্রেম স্বরে ডাকিতেছেন, ঐ যে দীন দুঃখিগণের কাতর হৃদয়ের ক্রন্দন শুনিয়া স্বহস্তে তাহাদের অশ্রুমোচন করিয়া দিতেছেন, ঐ যে ব্যাকুল চিত্তগণকে অবিরল ধারায় শান্তি সুধা বিতরণ করিতেছেন, কেহ কি চিনিতে পার, উনি কে! ঐ যে সময়ে সময়ে ঘোর অজ্ঞান জাল ভেদ করিয়া যাঁহার তেজ মোহ-মলিন মনেও প্রকাশিত হইতেছে, যাঁহাকে জীব বিস্মৃত হইয়া গেলেও যিনি তাহাকে ত্যাগ করেন না, যিনি মায়ানিদ্রাভঙ্গ করিয়া জাগ্রৎ করিবার জন্য বারংবার আহ্বান করিতেছেন, দেখ, দেখ, জাগরিত হইয়া দেখ, উনি কে! যিনি নিজে নির্গুণ হইয়া গুণত্রয়ে ত্রিজগৎ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—অরূপ হইয়া আশ্চর্য্য রূপে ত্রিভুবন মোহিত করিয়াছেন—চৈতন্য স্বরূপ হইয়া সংসার স্বপ্নদর্শী জীবকে মোহিনী মায়ায় অচেতন রাখিয়াছেন; ভোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া যোগ বলে সচেতন হইয়া দেখ, উনি কে! আদি পুরুষ ব্রহ্মা ধ্যানযোগে অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া বলিলেন উনি কে! বৃত্রাসুর বধের পর ইন্দ্র, পবন, বরুণ, অগ্নি, যম, পরম তেজোরাশি দেখিয়া বলিলেন উনি কে! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষিগণ সমাধিযোগে দেখিলেন, উনি কে! বেদ বেদাঙ্গ, দর্শন শাস্ত্রাদি বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়া বলিল উনি কে! কবিগণ ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া অবশেষে বলিলেন উনি কে! দেব দানব মানব সকলেই জিজ্ঞাসা করে, উনি কে! আমিও ভাবি উনি কে! যদি কেহ জানিয়া থাকেন তবে আমাকে বলিয়া দিন উনি কে! নীর ধারে দিন গত হইতেছে, জরা ধবল চামর (পক্ক কেশ, শ্মশ্রু আদি)

আধিব্যাধি পতাকা উড্ডীন করিয়া, মৃত্যু রাজের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার আগমন মাত্রেই সমস্ত নষ্ট হইবে। তখন কোন কার্য্যই হইবে না। তাই বলি যদি কেহ সচেতন থাক, তবে এই বেলা চিনিয়া লও, উনি কে! প্রেম তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া সকলকে বুঝাইয়া দাও উনি কে! সমস্ত জগৎকে জাগ্রৎ করিয়া দেখাইয়া দাও উনি কে!!!

---o---

ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না।

আমি যখন দিগ্দেশ পর্য্যটন করিয়া পথিমধ্যে একটি গণ্ডগ্রামে একদিনের জন্য বিশ্রাম করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার নিকট সেখানকার জনৈক ভদ্র লোক তাঁহার উদ্যানের নানাবিধ ফুলের যথোচিত প্রশংসা করিতেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন যে এদেশে এরূপ ফুল আর কাহারও বাগানে ফোটে না। এ কথা কেবল তিনিই বলিলেন তাহা নহে, আমার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য অনেক ভদ্র লোকে তাঁহার এই কথার পোষকতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ফুলবাগানের প্রশংসা গ্রামময় শুনিলাম। গোলাব ফুলের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে আমার বাগানে সহস্রদল কমলের ন্যায় সুবিশাল সহস্রদল গোলাব ফুটিয়া থাকে, তাহার সৌরভে দিক্ আমোদিত হয়, দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়, মন নাচিয়া উঠে, প্রাণ সুশীতল হয়। আমি একটু বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি সেই গোলাবের কলমের একটি চারা আমাকে টবে করিয়া উপহার দিলেন এবং বলিলেন যেন তরুটির মূলে একটু আল্‌গা মাটি থাকে, যেন একটু শীতল হয় ও যথা নিয়মে মূলে জল সেচন করা হয়; দেখিবেন গোলাব ফুটিলে শোভা হইবে কত, গন্ধ ছুটিলে উহা মনোলোভা হইবে কত, ও দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ হইবে কেমন। আমি আহ্লাদ সহ গোলাব শিশুকে গ্রহণ করিলাম ও যত্ন পূর্ব্বক ৺ কাশীধামে লইয়া আসিলাম। তরু মূলে নিত্য জল সিঞ্চিত হইতে লাগিল। ২।৪ দিন বোধ হয় যেন তরুটি দিব্য স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া গজাইয়া উঠিতেছে, নূতন নূতন পত্র পল্লব বাহির হইয়া আসিতেছে। আবার ২।৪ দিন দেখি কোন শাখা শুকাইয়া যাইতেছে, পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে। তরু শিশুর কখন হাসি কখন কান্না দেখিয়া তাহার জীবনের প্রতি সংশয় জন্মিল, এবং তরুর এই বিচিত্র কর্ম্ম বিসর্জ্জনের

হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, এবং পরিশেষে বুঝিলাম যে, যে ভৃত্য তরুমূলে জল সেচন করে, সে মধ্যে মধ্যে কূপজল ও কোন কোন দিন গঙ্গাজল দিয়া থাকে। যে দুই চারি দিন পাদপ শিশু গঙ্গাজল পান করিতে পায়, সে কয়েক দিন তাহার শাখা প্রশাখা পল্লব পত্র সতেজে বাহির হইতে থাকে, তরুটি কেমন নধর দেখায়, আবার যে কয়েক দিন কূপজল (কিঞ্চিৎ লবণাক্ত) পান করে, সেই কয়েক দিনই গাছটি মলিন হইয়া পড়ে, শুকাইতে থাকে, মৃতকল্প হইয়া যায়। তাহার পর টবে আর কূপজল কেহ না দেয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। ক্রমে গাছটি যেন বহুদিন-ব্যাপি ব্যাধি-বিমুক্তের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট ও দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট হইয়া উঠিল। দেখিয়া ভাবিলাম এখন আর এ গাছটিকে ক্ষুদ্র টবে (গামলায়) রাখা ভাল দেখায় না। ভূমিতে রোপণ করিয়া দিই। নরম মাটিতে পুঁতিলাম ও নিয়মিত জল সেচনের ব্যবস্থাও করিয়া দিলাম। মনে করিতে লাগিলাম যে, এই গাছে প্রথম যে দুইটি সহস্রদল গোলাব ফুটিবে, তাহার একটি বিশ্বনাথ ও একটি মা অন্নপূর্ণার চরণ কমলে অর্পণ করিব। গাছটি যেমন বাড়িতে লাগিল, বায়ুর প্রবাহে দুলিয়া দুলিয়া যেমন নাচিতে শিখিল, যৌবনের প্রাক্‌কালে কিশোর সজ্জায় যখন নব-লাবণ্য যুক্ত হইল, তখন ভাবিলাম, আমার মনের বাসনা পূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। লোকের কাছে অজাত কুসুমের অনেক প্রশংসা গান করিতে লাগিলাম। এই সময় কয়েক দিনের অনবধানতা দোষে নাকি আবার কূপজল তরুমূলে সিঞ্চিত হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তরু আবার শুকাইতে লাগিল। আমি ভৃত্যবর্গকে সাবধান করিয়া দিলাম, গঙ্গাজল সিঞ্চিত হইতে লাগিল, তরু পুনঃ প্রতিভা ধারণ করিল, নব যৌবনের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। এইবার ফুল ফুটিবে এইরূপ মনে করিয়া আমি প্রত্যহ সখের তরুর নধর দেহের দিকে তাকাইয়া দেখিতাম।

দুই চারিদিন পরেই সকল গুলিই শুকাইয়া পড়িয়া গেল। মনে বড় দুঃখ হইল, কিন্তু তরুর সেবা কমিল না। আবার ফুল ধরিল, এবার একটি পল্লবে একটি ফুল ধরিল। এই ফুলটি ফুটিলে বিশ্বনাথকে দিব কি অন্নপূর্ণাকে দিব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম, সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই ফুলটি একটু ফুটিয়াই শুকাইয়া পড়িয়া গেল; সুতরাং ফুল কাহারই পূজায় লাগিল না। কয়েক দিন পরে আবার একটি নূতন ফুল ধরিল, অপ্রস্ফুটিত ফুলের পরিধি কেবল ফুলিয়া বিশাল হইতে লাগিল, ভাবিলাম এইবার আমার সহস্রদল গোলাব ফুটিবে, ফুটন্ত ফুল চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া মায়ের চরণ কমলে দিব। গোলাব ধীরে ধীরে একটি একটি দল বিস্তার করিতে লাগিল। কিন্তু যেমন উর্দ্ধতন দলগুলি ফুটিতে লাগিল অমনি নিম্নের দলগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। আবার উপরের সমস্ত দলগুলিও যথাবিধি ফুটিতে পারিল না। কোরক না ফুটিয়াই শুকাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম এ ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না ও আর যে সম্পূর্ণরূপ ফুটিবে সে আশাও বড় নাই। কি করি, সেই আধমৃত আধ জীবন্ত, আধ মুদিত আধ ফুটন্ত ফুলটি তুলিয়া লইলাম, মা অন্নপূর্ণার চরণে অর্পণ করিলাম। ফুলটি ক্ষণ বিলম্বে মায়ের চরণ হইতে পড়িয়া গেল। মনের সাধ পূর্ণ হইল না, প্রাণের পিপাসা সম্পূর্ণ মিটিল না, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা ঘটিল না। মায়ের সাধের পূজার সাধের উপাদান জুটিল না, ফুলের সৌরভ ছুটিল না, আমার সাধের ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না। সে গাছে আর ফুল ধরিল না, গাছটি শুকাইয়া গেল, ফুলের আশা —মনের আশা এবার জন্মের মত ফুরাইল।

সাধের গোলাপ গাছটি অকালে শুকাইয়া গেল, কিন্তু শিখাইয়া গেল কি? জীব! তুমি পথের পথিক, চতুরশীতি লক্ষযোনি ভ্রমণ করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য জন্ম মরণরূপ দীর্ঘ দুর্গম বর্ত্মে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া শ্রান্তির শান্তি করিবার জন্য—

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ-সংসার-বর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥

—বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্র পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত রূপ গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছ। এখানে সৌভাগ্যক্রমে মাতৃ ক্রোড়রূপ টবে রোপিত মানবদেহরূপ সহস্রদল গোলাবের শিশু কলেবর উপহার প্রাপ্ত হইলে। দুর্লভ মানব দেহের উপাদেয়তা ও উপকারিতা শাস্ত্র মুখে—সাধু মুখে কতবার শুনিলে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দেহের সহস্রদলে সহস্রশীর্ষ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই বেলা এ দেহকে যত্ন পূর্ব্বক ভোগ বিলাসের হাত এড়াইয়া পার্থিব প্রলোভন রাশির মোহন মন্ত্রে বিমোহিত না হইয়া অবিদ্যার ইন্দ্রজাল জড়িত সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারের পরপারবর্ত্তী কাশীক্ষেত্ররূপ অবিমুক্ত পুরী বা যোগীর যোগাধিকার স্থানে লইয়া যাও। যেখানে মরণে মঙ্গল, যেখানে মরিলে আর জন্মিতে হয় না, যেখানে গমন করিলে গতায়াতের পথ বন্ধ হইয়া যায়, যেখানে সাধু সন্ন্যাসী ত্যাগী বিরাগী ও প্রেমানুরাগী যোগিগণ যোগ ধ্যানে আত্মহারা হইয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য সজ্জাকে শ্মশান শয্যার ন্যায় তুচ্ছ করিয়া পরমানন্দরসে নিমগ্ন, দেহিন্! সেই সৎসঙ্গরূপ কাশীবাসে অনুরক্ত হও। কিন্তু সাবধান, যেন তরুমূলে কূপের জল সিঞ্চন করিও না, তাহা হইলে গাছ শুকাইয়া যাইবে। কদাহার (মৎস্য মাংস, মদিরাদি), কদাচার (শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচার ব্যবহার), যথেচ্ছাচার আদির বশবর্ত্তী হইও না, ইহাতে অল্পায়ুঃ হইতে হয়। ব্রহ্মার কমণ্ডলুরূপ বেদগর্ভ নিহিত কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানরূপিণী ত্রিপথগামিনী নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধারূপিণী গঙ্গার নির্ম্মল জল সিঞ্চনে গাছটির অন্তর্জীবন, বল ও তেজের সঞ্চার কর। বরাবর গাছটিকে ক্ষুদ্র টবে—মাতৃক্রোড়ে—অবিদ্যার আলিঙ্গনে রাখিলেও চলিবে না, ভূমা রূপ ভূমিতে তরুটিকে রোপণ করিতে হইবে। দেহের নিত্যানন্দ আত্মা-

সত্তা এই অবিদ্যা বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মার সত্তাতেই দেহ ও জগতের সত্তা, ইহাই অনুভব করিতে হইবে, তখনই অবিদ্যাপাশ ভেদ করিয়া জীব মুক্ত হয়, বা শিবত্ব লাভ করে, তখনই কবির প্রহেলিকা স্মরণ করিয়া দেখিতে পাইবে—

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগীন্দ্র পুরুষ তায় থাকে নিরাহার॥
যখন পুরুষ বর হয় বলবান্।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান্ খান্॥

আত্ম-মহামন্ত্র যোগে, মানব! যখন তুমি দেখিবে, যে ব্রাহ্মণোঽহং, গৌরোঽহং, বৃদ্ধোঽহং, পণ্ডিতোঽহং, অমুকস্য পুত্রোঽহং, এই ক্ষুদ্র ভাব বিসর্জ্জন দিয়া তোমার সত্তা বিরাট্ সত্তায় মিশিয়া দীর্ঘায়তন হইতেছে, তখনও সাবধান, যেন কুসঙ্গে পড়িয়া দেহাভিমান রূপ কূপজল আবার তরুমূলে সিঞ্চন করিও না, তাহা হইলে আবার মলিন হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় পড়িয়া কত যোগী যে যোগভ্রষ্ট ও কত সাধুর সাধন পথ যে নষ্ট হয় তাহার সীমা নাই। সাধন কালে বড় সাবধান! সংশয়, তর্ক, বিতর্ক, কার্য্যে ফলাভিসন্ধি আদি ছাড়িয়া দিয়া গুরু যে কার্য্য যেরূপে অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিবে। সাধন করিতে করিতে তোমার তর্ক বিতর্ক সংশয় সমস্ত আপনা আপনিই মিটিয়া যাইবে। নিত্য নূতন তত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য হইবে। পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রম করিয়াও যে সকল নিভৃত তত্ত্বের গূঢ়াভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হয়েন না, তুমি তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবে, অলৌকিকী শক্তি সকল তোমাকে আশ্রয় করিতে থাকিবে। শত শত লোক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তোমার পদে প্রণত হইবে, দিব্য যশোরাশি তোমার নামকে ভূষিত করিবে। সাধক! এগুলি তরুতে ফুল ফুটিবার পূর্ব্বের অবস্থা। এগুলি তরুতে কোরক নির্গমের প্রাক্কালে—

সাধন সিদ্ধির পূর্ব্ব ক্ষণের নব লাবণ্য মাত্র, ইহাতে মুগ্ধ হইও না। লোকের প্রশংসায় আত্মহারা হইও না। যদি লোক নিন্দারূপ দাত্রা-ঘাতে শাখা প্রশাখার অঙ্গহানিও হয়, তবু দ্বিগুণ তেজে গজাইয়া উঠিবে। সম্পদে বা বিপদে, স্তুতি বা নিন্দায়, লাভে বা ক্ষয়ে হর্ষামর্ষ বিশিষ্ট হইও না। তরুর শুশ্রূষা দোষে দেখিও যেন গোলাবের প্রথম কোরক স্তবক (বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, ধৃতি, ক্ষমা, শান্তি, আৰ্জ্জব, তিতিক্ষাদি) শুকাইয়া ঝরিয়া না পড়ে। এগুলি শুকাইয়া পড়িলে লাল ফুল ফুটিবার আশা বড় অল্প। এ গাছে যত ফুল ফুটিবে তদ্দ্বারা অবিমুক্ত ধামে শিব-শক্ত্যাত্মক পরব্রহ্মের পূজা করিতে হইবে। ভাগ্যদোষে সকলের তাহা ঘটে না। আমার তো ঘটিলই না। কিজানি কর্ম্ম দোষে কোরকগুলি শুকাইয়া গেল। সৎ চর্চ্চা, সৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সৎ প্রসঙ্গ জন্ম এবং গুরু কৃপাবলে যদিই বা একটি ফুল (জ্ঞান) ফুটির ফুটিব হইয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য দোষে সেই দেবদুর্লভ ফুলটি ফুটিল না, অকালে শুকাইয়া পড়িল। কেবল বাক্যে জ্ঞানী হইলাম মাত্র, কার্য্যে কিছু করিতে পারিলাম না, ফুলটি মুকুলেই শুকাইয়া গেল। এ জ্ঞানে কিছু কায হইল না। সাধের ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না, মনে বড় খেদ রহিয়া গেল। স্বীকার করি—এ ফুল সকলের ভাগ্যে ফোটে না, জানি—ইহা পরম দুরারাধ্য ধন, বুঝি—ইহা সুতীব্র সাধন সাধ্য সামগ্রী; তথাচ মন তো বোঝে না, তাই দুঃখে হৃদয় ব্যাকুল হয়। আবার অন্য ফুলের আকাঙ্ক্ষা করিলাম। মানব তরুতে সকল ফুলই ফোটে, কিন্তু কপালগুণে কেবল আমারই ঘটে না। এ শেষ ফুলটিতে (ভক্তি) সকলেরই অধিকার আছে। ইহাতে জাতিবিচার নাই, আশ্রম বিচার নাই, পশু মানবাদি যোনি বিচার নাই, স্ত্রী পুরুষ, বাল বৃদ্ধ বিচার নাই। ইহাতে চাই না আর কিছুই, চাই কেবল ভগবানের কৃপা। যাঁহার চরণে ফুলটি অর্পিত হইবে, চাই কেবল তাঁহারই দয়া দৃষ্টি,

আর চাই সেই চরণের সেবক ভক্তের পদরেণু প্রসাদ। সাধু গুরুর দয়া হইস, দীন দয়ালের দয়ার কোন্ দিনই বা ত্রুটী আছে, তবে কেন আমার ভাগ্যে ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না? ফুলটি ফুটিতে না ফুটিতে অভিমানে শুকাইল কেন! দুঃখীর ঘরে দেবীর সেবা হইল না বলিয়া। বুঝি অন্ধের সম্মুখে টাকা ফেলিয়া দিলেও সে দেখিতে পায় না, আবার দুর্ভাগা পথিকের সম্মুখে ভগবান্ টাকার তোড়া ফেলিয়া দিলেও সে পথ টুকু চক্ষু বুজিয়া চলিয়া যায়, দেখিয়াও দেখে না, পাইয়াও পায় না।

"যে জন প্রেমের ঘাট চেনে না, প্রেমে ডুব্‌তে
গিয়ে দুটী নয়ন্ থাক্‌তে নয়ন মুদে হয়রে কানা॥
কাঠুরেতে মাণিক পেলে, দোকানেতে দেয় গো
ফেলে, কালো পাথর বলে; অভিমানে মাণিক
প'ড়ে রে, বলে—মহাজনে টের পেলে না॥"

আমি দুর্ভাগা, মাণিক চিনিলাম না, ভক্তির সেবা করিতে পারিলাম না, ভগবৎকৃপায় ভক্তি লাভ করা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু স্থায়ী হওয়া কঠিন। তাই কবি গাইয়াছেন—

প্রেম করা কঠিন নয়—রাখা প্রেম সুকঠিন।

আমার ভাগ্যে ভগবদ্ ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি থাকিবে কেন? ফুলটি ফুটিতে গিয়া শুকাইতে লাগিল; তাই আধ মৃত আধ জীবন্ত আধ মুদিত আধ ফুটন্ত ফুলটি লইয়া মায়ের চরণে দিতে গেলাম, সে ফুল সে চরণে অধিক ক্ষণ থাকিবে কেন, তাই পড়িয়া গেল। যোগী ষট্‌কমল ভ্রমণ পূর্ব্বক সুপরিস্ফুটিত সহস্রদল কমলে যে চরণের পূজা করিয়া থাকেন, সে চরণে আমার আধ ফুটন্ত ফুল স্থান পাইবে কেন! ভক্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক নিজ ফুটন্ত হৃদ্‌কমলে যে চারু চরণ কমলের পূজা করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বদেব বন্দিত পদে আমার মলিন ফুল ম্লান

পাইবে কেন ! তরুও শুকাইয়া আসিল, আর যে ফুল ফুটিবে, তাহারও আশা নাই। কি জানি কে বাদ সাধিল, বুঝি সাধ পুরিল না। আসা বুঝি বৃথা হইল, আশাতো মিটিল না ; সংসার বন্ধন আঁটিয়া বসিল, কে তাহা ত কাটিল না ; যাহা করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা ত ঘটিল না ; ফুল দুটিতে (জ্ঞান+ভক্তি) পূজিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা ত জুটিল না ; আমার যে সাধের ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না।

মা ! আমি দীনাতিদীন মা, তোমার দ্বারে আসিয়াছি, দয়া করিয়া ফুল দুটি ফুটাইয়া দাও, ফুটন্ত ফুলে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিয়া জন্ম জীবন সার্থক করি। আর সময় নাই, পরমায়ু ফুরাইয়া আসিল মা, এই অফুটন্ত অবস্থাতেই ফুলগুলি তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। অফুটন্ত ফুল তোমার চরণ স্পর্শেই ফুটিয়া উঠিবে। মা ! দয়া করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি" গ্রহণ কর।

ওঁ যোগেশ্বরি ! ত্বাং শিরসা নমামি।

—o—

পরিশিষ্ট।

মনের প্রতি উপদেশ।

মায়ানন্দে থেকে মন মজিলে এবার।
মায়াতে ভুলিলে সব বিবেক বিচার॥
মায়াতে মগন মন মিথ্যা মদরসে।
মায়াতে হারালে কাল বৃথা কালবশে॥
মায়াতে ভুলেছ মৃত্যু শঙ্কট তোমার।
মায়াতে জগৎ জীবে ভাব আপনার॥
মায়াতে সংসারসুখে পিপাসা সদাই।
মায়াতে হয়েছ মত্ত তত্ত্ব জ্ঞান নাই॥
মায়াতে না মানো মন গুরু উপদেশ।
মায়াতে আপন তত্ত্ব ভুলেছ বিশেষ॥
মায়াতে হইয়া অন্ধ দেখিতে না পাও।
মায়াতে অমৃত ভ্রমে হলাহল খাও॥
মায়াতে নিদ্রিত হ'য়ে দেখিছ স্বপন।
মায়াতে মোহিত হ'য়ে ভুলিলে স্বপন॥
মায়াতে মনের সাধ নাহি পুরাইলে।
মায়াতে বিরোধ বশে দিন ফুরাইলে॥
মায়াতে মায়ার গুণ বুঝিতে না পার।
মায়াতে মায়ার ফাঁশ গলে কর আর॥
মায়াতে মায়ের কোলে এ মায়া দেখিলে।
মায়াতে এ মায়াময় তাও না বুঝিলে॥

মায়াতে মায়ের মায়া ক্রমে বাড়াইলে।
মায়াতে লইয়া জায়া কাল কাটাইলে॥
মায়াতে পরম অর্থ তত্ত্ব নাহি কর।
মায়াতে এ মিথ্যা মায়া নাহি পরিহর॥
মায়াতে কেনরে মন! মায়া আঁটিতেছ
মায়াতে মায়ার হাটে কেন খাটিতেছ॥
যে অর্থে এসেছ জীব কর ওরে তাই।
মিথ্যা এ মায়ার বন্ধে থেকনা সদাই॥
এমন সাধের জন্ম হইবে না আর।
তাই বলি এই বেলা ত্যজরে বিকার॥
শত্রুর শাসনে সদা হও সাবধান।
মনের মানসে কর আত্মানুসন্ধান॥
বিষয় গহন বনে মানস মাতঙ্গ।
যাইও না মত্ত হয়ে, ক'র না কু-রঙ্গ॥
কৃতান্ত মৃগেন্দ্র তথা আছে তা জাননা।
মত্ত হয়ে হিত কথা শুনেও শুননা॥
পরিহরি হরি-পরিরক্ষিত এ বন।
চল বিহরিব হরি-হরিষ কানন॥
বলি "হরি, বলি হারি" বলি-নিসূদন।
কেবলি তদ্‌গুণাবলি বলি অনুক্ষণ॥
ভজিলে ত্রিলোক-কান্তে কৃতান্তে কি ভয়।
শমন-শাসন হরি দেব দয়াময়।
শুনরে বারণ মত্ত চিত্ত নিবারণ।
মরণ-বারণে ভজ তারণ কারণ॥

কি ভয় অভয় পদ পাও যদি মন।
ভয়েতে পলাবে ভয়, সভয় শমন॥
ত্যজ মন ধন জন যদি সুখে রবে।
মতি মন্দ গেলে দ্বন্দ্ব সদানন্দ হবে॥
মিছা কায়া মিছা মায়া সুত জায়া সব।
কেবা কার আপনার অসার বিভব॥
ভাব সত্যরূপ নিত্য স্থির-চিত্ত হ'য়ে।
আধার বিচার সার কর তত্ত্ব ল'য়ে॥
মায়ার মোহিনী ভাবে ভুল না ভুল না।
অহংমম বৃথা চিন্তা তুল না তুল না॥
এ যন্ত্রণা জালে যদি চাহ অব্যাহতি।
জগদ্গুরু কল্পতরু মূলে রাখ মতি॥
শুদ্ধজ্ঞানে সুখে সদা থাক সচেতন।
সযতনে দ্বৈতজ্ঞান ত্যজ মূঢ় মন॥
প্রেমাকরে প্রেম করি সদানন্দে রবে।
সদানন্দ প্রেমে মজি সদানন্দ হবে॥
জন্মাদি যাতনা জালে নাহি জড়াইবে।
কেবল বিমলানন্দ অন্তরে জাগিবে॥

সমাপ্ত